ক্ষমতা/প্রতিরোধ

ক্ষমতা/প্রতিরোধ

মিশেল ফুকো

নির্বাচিত লেখা, বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার
সম্পাদনা ও বঙ্গানুবাদ: বিপ্লব নায়ক

অন্যতর পাঠ ও চর্চা

প্রথম সংস্করণ: সেপ্টেম্বর, ২০২১
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

প্রকাশক
অন্যতর পাঠ ও চর্চা
১২৫, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড,
কলকাতা- ৭০০০৪৭

মুদ্রণ
ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগণা,
কলকাতা- ৭০০১৩২

প্রচ্ছদ
লুসিও ফনটানা-র চিত্রকর্মের অংশ
ব্যবহার করে রচিত

বিনিময়
২০০ টাকা

সূচি

সম্পাদকীয় উপস্থাপনা

মিশেল ফুকোর বিশ্লেষণের গতিপথ ধরে যাজকীয় ক্ষমতা থেকে পারহেসিয়া অবধি একটি যাত্রা ১১

পরিভাষাপঞ্জী ৫৫

কথোপকথন

ফুকো-ত্রোমবাদোরি আলাপ ৬৫

লিখন, ভাষণ

১. ক্ষমতার কলকৌশল বিশ্লেষণের পদ্ধতি ১৫১

২. কুলজিশাস্ত্র ও ক্ষমতা ১৫৭

৩. শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা ১৭৫

৪. জৈবক্ষমতা ১৯৪

৫. ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জীবনশিল্প ২২৩

৬. রাজকতা ২২৮

৭. বিষয়ী ও ক্ষমতা ২৫৬

নির্ঘন্ট ২৮৪

সম্পাদকীয় উপস্থাপনা

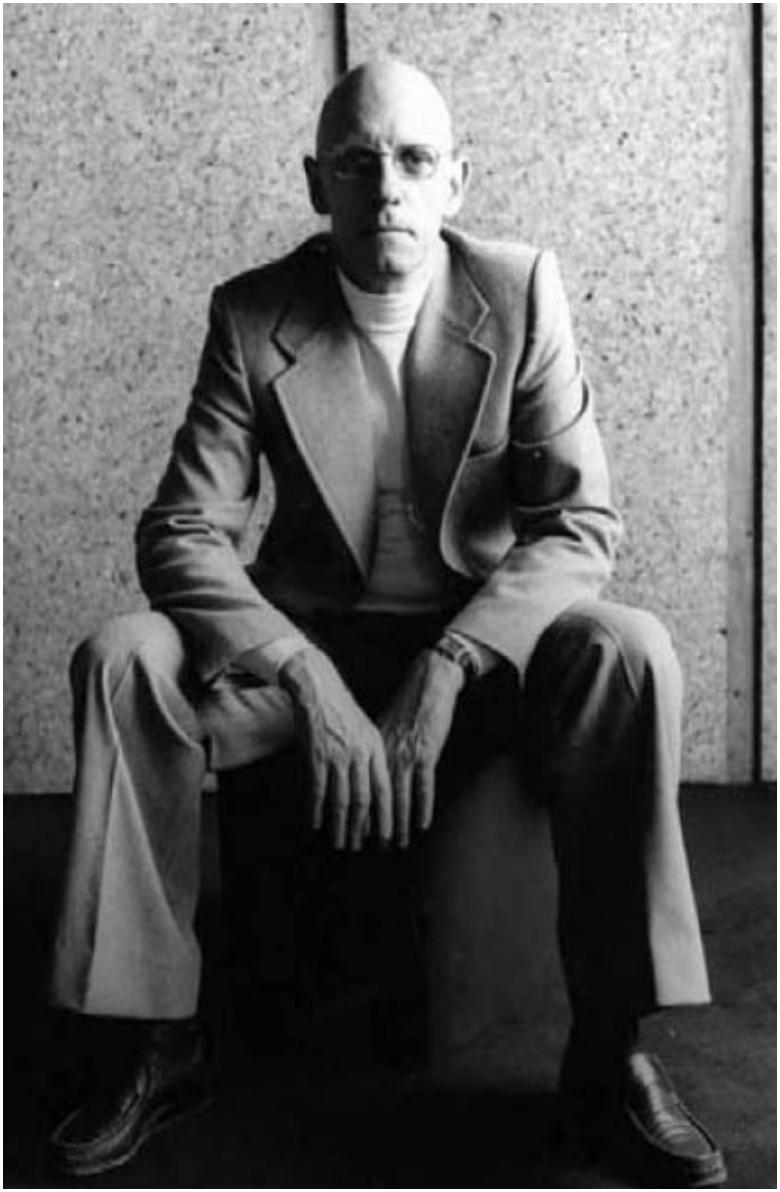

মিশেল ফুকো

মিশেল ফুকোর বিশ্লেষণের গতিপথ ধরে যাজকীয় ক্ষমতা থেকে পারহেসিয়া অবধি একটি যাত্রা

১। ক্ষমতা প্রসঙ্গে

মিশেল ফুকোর করা ক্ষমতার বিশ্লেষণ ইউরোপের ইতিহাস, বিশেষ করে ফ্রান্স সমেত পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাস পাঠের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। তা ফুকো সচেতনভাবেই করেছেন। তিনি কোনও ইতিহাস-বিযুক্ত, বিশেষ সমাজরূপ-বিযুক্ত বিমূর্ততার স্তরে তাঁর বিশ্লেষণকে উপস্থাপিত করতে চাননি। তাই ফুকোর ক্ষমতা-বিশ্লেষণকে পাঠ করার প্রস্তুতি হিসেবে প্রথমে তাঁর এই বিশেষ ভিত্তির দিকটিতে নজর ফেলা যাক।

আদি বাইবেল-য়ে জনসমষ্টির রাজনৈতিক সংগঠনের দুটি ধাঁচার উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি হল বাবিলনের প্রথম রাজা নিমরড-য়ের শাসনব্যবস্থা ও অপরটি হল ইজরায়েলের প্রথম গোষ্ঠীনেতা আব্রাহামের নেতৃত্বদানের যাজকীয় ব্যবস্থা। নিমরড মানুষ শিকার করে নিজ শাসনভুক্ত করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন, নিজেকে ঈশ্বর বলে মনে করেন। অন্যদিকে, যেভাবে কোনও মেষপালক তার ভেড়ার পালের যত্ন নেয়, সেভাবে আব্রাহাম তাঁর গোষ্ঠীর হিতসাধনায় কাজ করে যান ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী হিসেবে নয়, বরং ঈশ্বরের আজ্ঞাবাহক হিসেবে। মানুষদের আটক করে, হিংসা ও হত্যার মধ্য দিয়ে ত্রাস সঞ্চার করে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে কীভাবে নিজ পরিকল্পনামতো অপরদের কাজ করিয়ে নেওয়া যায় সেটাই নিমরডের পদ্ধতি। আটক করা মানুষদের বাধ্য করা হয় এমন এক নগরকাঠামো গড়ে তুলতে যা সেই মানুষদের কারাগারে পরিণত হয়। শাসকের অভিপ্রায়

পূরণের জন্য সম্পদের এমন এক কেন্দ্রীভবন ও পুঞ্জীভবন তা ঘটায় যার শিখর স্বর্গকে ছুঁতে চায়। অন্যদিকে গোষ্ঠীনেতা ও গোষ্ঠীপালক আব্রাহাম তাঁর গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যকে ভালোবাসেন, প্রতিটি সদস্য সম্পর্কে খুঁটিনাটি খোঁজখবর রাখেন, প্রত্যেককে তিনি নাম ধরে সম্বোধন করেন, সকলের সামনে দাঁড়িয়ে উৎকৃষ্ট চারণভূমির সন্ধানে যাত্রায় নেতৃত্ব দেন, কোনও সদস্য আহত হলে তার ক্ষত নিজ হাতে শুশ্রূষা করেন, ক্লান্তদের নিজ কাঁধে বহন করেন, পথভ্রষ্ট হয়ে হারিয়ে যাওয়াদের খুঁজে বের করে আবার গোষ্ঠীতে ফিরিয়ে আনেন, দিনরাত এক করে প্রহরা দেন, নিজের প্রাণ বাজি রেখে নেকড়ের আক্রমণ থেকে গোষ্ঠীকে রক্ষা করেন।

শাসনপ্রণালীর এই বাইবেলীয় দুটি ধাঁচা শাসনের কু ও সু সম্পর্কে ধারণা নির্মাণ করে এসেছে দীর্ঘকাল। নিমরডের শাসন কুশাসন ও আব্রাহামের শাসন সুশাসন। একের বিপরীতে অপরটি স্থাপিত। ১৬৪০–১৬৫০ সালের ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের সময় 'লেভেলারস'-দের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী সাম্যবাদী আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। সেই আন্দোলনের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রচারক জন লিলবার্ন ১৬৪৯ সালে লেখা তাঁর প্রচারপুস্তকে সর্বাত্মক ক্ষমতার দাবিদার শাসক অলিভার ক্রমওয়েলের সমালোচনা করেছিলেন 'ক্ষমতাশালী নরশিকারী নিমরড'-য়ের সঙ্গে তুলনার মধ্য দিয়ে।এর অনেক পরে ইউরোপে তথাকথিত আলোকপ্রাপ্তির যুগে জাঁ জাক রুশো তাঁর 'এমিলি' গ্রন্থে আলোচনা করেন হিংসা-সন্ত্রাসের বলে স্থায়ী আইনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না। তখনও তিনি এই হিংসা-সন্ত্রাসের শাসনের প্রথম উদাহরণ হিসেবে নিমরডের শাসনের উল্লেখ করেন। জন লিলবার্ন ক্রমওয়েলের শাসনের বিপরীতে মুক্ত মানুষের সাম্যবাদী সমাজের কথা ভেবেছিলেন। রুশো ভেবেছিলেন হিংসা-সন্ত্রাস বিহীন এক সমাজে স্বাধীনভাবে সংগঠিত পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে সংগঠিত আইনের শাসন। নিমরড-ধাঁচার সন্ত্রাসী শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁরা সুশাসনের রূপ মূর্ত করতে চেয়েছিলেন।

মেষপালের সর্বহিতাকাঙ্খী পালনকর্তার আদলে তৈরি আব্রাহাম-সুলভ সুশাসনের ধারণা ও রূপ থেকেই ইউরোপে আধুনিক শাসনব্যবস্থার একটি মৌল উপাদান জন্ম নিয়েছে বলে মিশেল ফুকো চিহ্নিত করেছেন। সেই উপাদানটিকে তিনি 'যাজকীয় ক্ষমতা' (pastoral power) নাম দিয়েছেন। ফুকো-র বিশ্লেষণ থেকে যাজকীয় ক্ষমতার তিনটি বৈশিষ্ট্য উঠে আসে:

প্রথমত, তা একটি গতিশীল বা পরিবর্তনশীল বিবিধতা-সম্পন্ন গোষ্ঠীর উপর প্রযুক্ত হয় (ভেড়ার পালের সঙ্গে তুলনীয়),দ্বিতীয়ত তা মূলগতভাবে সর্বহিতসাধনের অভিপ্রায় ঘোষণা করে (ভেড়ার পালের দেখভাল করার সঙ্গে তুলনীয়), আর তৃতীয়ত তা গোষ্ঠীর মধ্যের প্রতিটি ব্যক্তিকে ব্যক্তিপরিচয়ে আলাদা নজরে রাখে (পালের প্রতিটি মেষকে জানা ও নজরে রাখার সঙ্গে তুলনীয়)।

যাজকীয় ক্ষমতার বুনট ইউরোপের সমাজের উপর প্রথম বিস্তৃত হয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিক খ্রিস্টান ধর্মের বিভিন্ন সমাজ-সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। চার্চ-য়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পদাধিকারীরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি জনগণের দেখভালকারী মেষপালক হিসেবে রাজতন্ত্রের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কবন্ধনে হাজির হয়েছিল। 'কনফেশন'-য়ের মধ্য দিয়ে এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির কাছে প্রতিটি ব্যক্তির নিজেকে 'উন্মুক্ত' রাখা ছিল রীতি। 'কনফেশন' নামক ক্রিয়া বহুস্তরবিশিষ্ট— এক স্তরে তা দোষস্বীকার বা পাপস্বীকার, আরেক স্তরে তা 'স্বাভাবিকতা' বলে চিহ্নিত আচরণ থেকে বিচ্যুতি স্বীকার, আরও এক স্তরে তা ব্যক্তিঅস্তিত্বের সমস্ত আড়াল তুলে দিয়ে মেষপালকের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করার মধ্য দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা। এই প্রকৌশলের মধ্য দিয়ে মেষপালক যেমন তার পালের প্রতিটি মেষ সম্পর্কে জানা ও নজর রাখার কাজ করতে পারে, তেমনই প্রতিটি মেষও স্বাভাবিকতার বিধিবদ্ধতার প্রতি অনুগত থেকে পালের নিরাপত্তাবলয়ের মধ্যে নিজেকে রাখতে পারে। সেই রোমান সাম্রাজ্যের শাসনবলয়ের মধ্যেই খ্রিস্টিয় ধর্মীয় পদাধিকারী কার্ডিনাল বেলারমাইন লিখেছিলেন:

> নিজ দায়িত্বে থাকা পালকে রক্ষা করতে প্রতিটি মেষপালকের তিন ধরনের ক্ষমতা থাকা দরকার। প্রথমটি হল তার পালের ভেড়ীদের যাতে শিকার না করতে পারে তার জন্য নেকড়ের উপর ক্ষমতা। দ্বিতীয়টি হল যাতে ভেড়ীদের কোনওরকম ক্ষতি না করতে পারে তার জন্য ভেড়াদের উপর ক্ষমতা। আর তৃতীয়টি হল প্রয়োজনীয় চারণক্ষেত্র প্রদান করার জন্য সাধারণভাবে সমস্ত ভেড়া ও ভেড়ীদের উপর ক্ষমতা।[১]

সুতরাং ঈশ্বরের কাছ থেকে মেষপালকের দায়িত্বপ্রাপ্ত চার্চের পদাধিকারীদের মনুষ্যগোষ্ঠীরূপী নিজ মেষপালকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হলে দস্তুরমতো যে ভূমিকা পালন করতে হবে তা হল: ১। সেই সমস্ত নেকড়ে-মানুষদের চিহ্নিত করতে হবে যারা তার পাল থেকে কোনও ভেড়ীকে শিকার করে নিয়ে যেতে

পারে এবং সেই নেকড়ে মানুষদের উপর এমন নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে হবে বা এমনভাবে দমন করতে হবে যাতে তারা তাদের শিকারের কাজ চালাতে না পারে; ২। ভেড়াদের উপর এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখতে হবে যাতে ভেড়ীদের কোনও ক্ষতি তারা না করতে পারে; ৩। মনুষ্যরূপী ভেড়া ও ভেড়ীদের উপর এমন সাধারণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে হবে যা কাজকর্ম, আচরণ ও বিচরণের পরিসরগুলো চিহ্নিত করে দিয়ে স্বাভাবিকতার মাপ তৈরি করে দেয়। এই চিহ্নিত পরিসর ও স্বাভাবিকতার মাপের বাইরে যারা তারা নেকড়ে-মানুষ, আর তার বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতাধারীরা হল সংক্রামক রোগের বাহক ভেড়া। নেকড়ে-মানুষদের নিকেশ করতে হবে বা সমাজপরিসরের বাইরে নির্বাসিত করতে হবে, আর সংক্রামক রোগবাহকদের পাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে হয় চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ-স্বাভাবিক করে তুলতে হবে আর তা সম্ভব না হলে রোগ ছড়ানো আটকাতে তাদেরও নিকেশ করতে হবে।

এই নেকড়ে-মানুষ ও রুগ্ন ভেড়ারাই ক্রমশ 'হেরেটিক' অর্থাৎ ধর্মদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রাষ্ট্র ও চার্চের যুগল আক্রমণের মুখে পড়েছিল। রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের খুঁজে বের করে নিকেশ করার অভিযান 'ইনকুইজিশন'-য়ের রূপ ধরে মধ্যযুগের ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার অসংখ্য উদাহরণের মধ্য থেকে একটিকে দেখা যাক। ১৩২৯ সালে অধুনা ফ্রান্সের অন্তর্গত কারকাসোন অঞ্চলের অধিবাসী সিমোঁ রোলাঁ-কে 'ইনকুইজিশন'-য়ের মুখে দাঁড় করানো হয় এই অভিযোগে যে পোপেরা বারবার যেসব ত্রুটি ও কু-প্রবণতাকে ধর্মদ্রোহের নামান্তর বলে চিহ্নিত করেছেন সেসব তাঁর মধ্যে দেখা গেছে এবং সাবধান করে দেওয়ার পরও তিনি শুধরাননি। 'ইনকুইজিশন'-য়ের বিচারের পর যে বিধান ঘোষিত হয় তা এইরকম:

> আমরা, পিলফোর্ট, পামিয়েরস-য়ের বিশপরা ঈশ্বরের কৃপাবলে ঘোষণা করছি... সংক্রামক রোগবাহী ভেড়ার মতো পালের বাকি ভেড়াদের মধ্যেও তুমি রোগ ছড়িয়ে দিতে পার এই আশঙ্কায় আমরা তোমাকে অনমনীয় ধর্মদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করছি এবং সেই হিসেবে সামাজিক আধিকারিকদের হাতে শাস্তিদানের জন্য তুলে দিচ্ছি।[২]

জনসমক্ষে সবার সামনে উদাহরণ তৈরি করতে এই ধর্মদ্রোহীদের পুড়িয়ে অথবা পাথর ছুঁড়ে মেরে হত্যা করা হত। আর কার্ডিনাল বেলারমাইন তাঁর

লেখায় ভেড়ীদের নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করলেও ধর্মদ্রোহী হিসেবে 'ডাইনি' আখ্যা দিয়ে অসংখ্য নারীকেও হত্যা করা হয়েছিল। মধ্যযুগের সেই ইতিহাস লিখতে গিয়ে বিশিষ্ট ফরাসি ইতিহাসকার জুল মিশেলেত লিখেছেন:

> সেই নারী, যে প্রাচ্যে তার সিংহাসনে বসে মানুষকে লতাপাতার গুণাগুণ ও তারাদের গতিপথ সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছিল, সেই নারী, যে ডেলফির তেপায়া টেবিলের উপর আলোর ঈশ্বরের দ্যুতি গায়ে মেখে তার সামনে আনত বিশ্বকে দৈববাণী উপহার দিত, সেই নারীকেই হাজার বছর পরে জনতা বুনো জন্তুর মতো তাড়া করে শিকার করছে, বারোয়ারি আনাচেকানাচে তাকে ঢুঁড়ে বের করে অপমানিত করছে, সন্ত্রস্ত করছে, পাথর ছুঁড়ে মারছে, জ্বলন্ত কয়লার উপর নিক্ষেপ করে মারছে!
>
> এই হতভাগীদের জন্য ধর্মগুরুদের জোগাড় করা জ্বালানী কাঠ, জনতার নিক্ষিপ্ত গালমন্দ আর বাচ্চা ছেলেপুলেদের ছোঁড়া পাথরও যেন কুলিয়ে উঠছে না। নিষ্ঠুরতমা বলে তকমা দিয়ে কবিও শিশুর মতো তার গায়ে আরও একটা পাথর ছুঁড়ে মারছে। কোনওভাবেই অবশ্য সর্বসময়ের জন্য সেই নারীকে বৃদ্ধা ও নোংরা-কুরূপা হিসেবে কল্পনা করা সম্ভব হচ্ছে না। 'ডাইনি' শব্দটি শুনলেই চোখের সামনে 'ম্যাকবেথ'-য়ের ভীতিপ্রদ বৃদ্ধাদের ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু নিষ্ঠুর দমনপ্রক্রিয়া থেকে বিপরীত শিক্ষাই উঠে আসে— অসংখ্য নারীকে তারুণ্য ও সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হওয়ার কারণেই মরতে হয়েছে।...
>
> প্রকৃতির পুজারী এই নারীদের মধ্যে ধর্মগুরুরা কী বিপদ দেখতে পেয়েছেন, কী প্রতিযোগিতার আশঙ্কায় ভীত হয়েছেন যে এত ঘৃণা উগরে দেওয়ার আসর তাঁরা বসিয়েছেন! অতীতদিনের ঈশ্বরদের থেকে এই নারীরা আলাদা ঈশ্বরদের কল্পনা করেছেন। অতীতদিনের শয়তানের নিকটবর্তী ভবিষ্যতের শয়তানকে আমরা এই নারীদের মধ্যে উদিত হতে দেখছি।[৩]

জুল মিশেলেত-য়ের ইতিহাসবর্ণনা থেকে আমরা দেখি যে এই তথাকথিত ডাইনিরা চার্চের দ্বারা অনুমোদিত নয় এমন প্রথাগত জ্ঞান (বিশেষ করে রোগ-জরা ও তার চিকিৎসা বিষয়ে) এবং জীবনাচরণ-বিশ্বাসমতের ভাণ্ডারী ও অনুশীলনকারী ছিল। চার্চ তার বেঁধে দেওয়া স্বাভাবিকতার পরিধি থেকে এইসব জ্ঞান-রীতি-চর্চাকে নির্মূল করার জন্যই ওই ভয়াবহ ডাইনিশিকার অভিযান পরিচালনা করেছিল।

এই নেকড়ে-মানুষ শিকার, সংক্রামক রোগবাহী ভেড়া শিকার ও ডাইনিশিকার কেবল ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের দমনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধেরও রূপ নিয়েছিল। অধুনা ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চল অধুনা ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে ১৩ শতকের গোড়ায় এক রক্তক্ষয়ী 'ক্রুসেড' অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ শুরু করেছিল যা প্রায় পাঁচ দশক জুড়ে চলেছিল। এই ধর্মযুদ্ধের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল 'ক্যাথার' নামক ধর্মদ্রোহী জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করা। ক্যাথার নামে চিহ্নিত দক্ষিণের অধিবাসীরা রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের অনুসারী ছিল না, ধর্মমতের সঙ্গে সঙ্গে তারা ভাষা, সমাজরীতি ও জীবনাচরণেও আলাদা ছিল। এই পৃথকত্বই চিহ্নিত করা হল ধর্মদ্রোহ বলে। পাঁচ দশক জোড়া রক্তাক্ত যুদ্ধের পরে ক্যাথাররা নিশ্চিহ্ন হল, তাদের স্বাধীন অঞ্চল স্বাধীনতা হারিয়ে উত্তরের কাপেশিয়ান রাজার হস্তগত হল, রোমান ক্যাথলিক ধর্মের আধিপত্য নিরঙ্কুশ হল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষদের গোটা সংস্কৃতিটাই লুপ্ত হল।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের ইতিহাসপথে যাজকীয় ক্ষমতারূপের এই আত্ম-উন্মোচনপর্বে অপর বা বিরোধীকে চিহ্নিত করা (সেই অপর বা বিরোধী ব্যক্তিমানুষ হতে পারে, মনুষ্যগোষ্ঠী হতে পারে, আবার স্বাভাবিকীকরণের গণ্ডির বাইরের জ্ঞান-ধারণা-আচরণও হতে পারে) এবং তাকে নিশ্চিহ্ন বা সমাজ-বহির্ভূত করার শিকারী প্রক্রিয়া দেখিয়ে দেয় যে নিমরড ধাঁচার শিকার-মনোবৃত্তি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে শাসনের তথাকথিত বিপরীতটিও তার বহিঃস্থ কোনও উপাদান নয়, বরং সেই 'বিপরীত'-টিকেও যাজকীয় ক্ষমতারূপ নিজমধ্যেই ধারণ করে। সর্বহিতাকাঙ্খী মেষপালক ও সন্ত্রাসী শিকারী পৃথক দুটি অস্তিত্ব নয়, একই অস্তিত্বের মধ্যে মিশে থাকে, পৃথক দুটি মুখ নয়, একই মুখের দুটি অভিব্যক্তি।

ক্রমশ যাজকীয় ক্ষমতা অনুশীলনের কৌশল ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটেছে। সর্বহিতাকাঙ্খার বিষয়গুলিতে পরজাগতিক বিবেচনার চেয়ে ইহজাগতিক বিবেচনার গুরুত্ব বেড়েছে— স্বাস্থ্য, ধনসম্পদে সচ্ছলতা, দুর্ঘটনা-দুর্যোগ থেকে নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হয়ে উঠেছে। তা কেন্দ্র করে চার্চের সঙ্গে সংযুক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির জায়গায় একগুচ্ছ সামাজিক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা, পরিবার-কল্যাণ, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদান সংক্রান্ত নিয়ামকগুলোকে ধরে ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ, স্বাভাবিকতার বিধি নির্মাণ ও

আরোপ এবং অস্বাভাবিকতাকে চিহ্নিত করে তাকে সমাজবিচ্ছিন্ন করা ও নিকেশ করার কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, প্রয়োগ করেছে। তার হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জ্ঞান ও নৈতিকতার নতুন মাপকাঠি, নতুন প্রমিতকরণ। ফুকো দেখিয়েছেন যে আঠারো শতকে এসে যখন চার্চের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের জীবনীশক্তি খুইয়ে বসেছে, তখনই কিন্তু এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বুনট গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে যাজকীয় ক্ষমতারূপকে আগের যে কোনও সময়ের থেকে বহুগুণ বৃদ্ধি ও বিস্তার এনে দিয়েছে। এই নতুন আদলের বিস্তৃত ক্ষমতারূপকে ফুকো শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা (disciplinary power) নাম দিয়েছেন।

যাজকীয় ক্ষমতার উৎসরূপ থেকে শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতায় বিকাশের পথে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো মূল ভূমিকা পালন করেছে, তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ফুকো পুলিশ নামক প্রতিষ্ঠানটিকে চিহ্নিত করেছেন। সতেরো শতকে ইউরোপে বিপুল সংখ্যক মানুষকে 'দরিদ্র', 'অলস' বা 'ভবঘুরে' হওয়ার জন্য আটক করা, বন্দি করে রাখা বা কর্তৃপক্ষ-নির্ধারিত কাজ করতে বাধ্য করার আয়োজন হয়। এলিজাবেথ-জমানার ইংল্যান্ডে তৈরি হওয়া দরিদ্র আইন (Poor Laws) ছিল এর সূচনা। ফ্রান্সেও ১৬৫৬ সালে প্রথম 'সাধারণ হাসপাতাল' (General Hospital) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় আটক করা দরিদ্র-অলস-ভবঘুরেদের একজায়গায় বন্দি করে রাখার জন্য। সমাজ ঢুঁড়ে তাদের আটক করে এনে হাসপাতালে বন্দি করার কাজ করার জন্য তৈরি হয় পুলিশ বাহিনী। জুল মিশেলেত এই সময়কার ফ্রান্সের ইতিহাস লিখতে গিয়ে লিখেছেন:

> দরিদ্রদের শিকার করে আনা হতো। পুলিশ সমস্ত উপায় খাটিয়ে দরিদ্রদের ঢুঁড়ে বের করে আটক করে নিয়ে এসে জড়ো করত— কুখ্যাত সব অত্যাচারের মাধ্যমে সন্ত্রস্ত করে তোলাও এই সমস্ত উপায়ের অন্যতম ছিল।[৪]

পারি শহরে পোস্টার পড়েছিল যে ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ, নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের চাবুক মেরে শাস্তি দেওয়া হবে। পরবর্তীকালে এই বরাদ্দ শাস্তির বদল ঘটেছিল। মহিলাদের নির্বাসিত করা হতো আর পুরুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে রাজার বিভিন্ন জাহাজে বদ্ধ শ্রমিক হিসেবে খাটানো হতো। শহরের রাস্তায় ঘুরে ভিক্ষুকদের শিকার করার এই কাজও প্রধানত পুলিশের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল।

দরিদ্র, অলস, ভবঘুরে বা ভিক্ষুকদের এভাবে অপরাধী বলে দেখার চোখ তখনও সমাজের সবার তৈরি হয়নি। বিশেষত যখন এই হতভাগ্যদের একটা বড় অংশই গ্রাম-গঞ্জ-শহরে তাদের প্রথাগত জীবন-জীবিকার উপায় থেকে উৎখাত হয়ে এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে, তখন তাদের প্রতি সাধারণ মানুষদের এক ধরনের সহানুভূতিও ছিল। আর ভবঘুরে জীবনকে অনেকে আলাদা রকমের কিন্তু সম্মানীয় এক জীবনাচরণ বলেই দেখত। তাই অনেকে পুলিশের হাত থেকে এই হতভাগ্যদের আড়াল করার জন্য আশ্রয় দিত, পুলিশ গ্রেফতার করতে গেলে বাধা দিত। এমনকি পারি সহ বেশকিছু শহরে সাধারণ হাসপাতালের উপর দলবেঁধে হামলা চালিয়ে আটক করে রাখা মানুষদের মুক্ত করার চেষ্টাও হয়েছিল বেশ কয়েকবার। এই অবস্থায় পুলিশের হাত শক্ত করতে প্রশাসন থেকে পুলিশবাহিনীর সদস্যদের জন্য আলাদা ব্যাজ, হেলমেট, অস্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাছাড়া দারিদ্র্যের অবসান ঘটিয়ে উন্নত সমাজ গড়ার জন্য কেন এই দরিদ্র-অলস-ভবঘুরে-ভিখারীদের শিকার জরুরী, প্রশাসন কীভাবে হাসপাতালে তাদের খাওয়া জুগিয়ে বা কাজ করতে বাধ্য করে 'উদার হৃদয়ের' পরিচয় দিচ্ছে তা প্রচার করা হয়েছিল।

আঠারো শতকেও এই দরিদ্রশিকার চলছিল পুরোদমে:

> ১৭২৪ সালে রাজার জারি করা নির্দেশের পর একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছিল বা আরও ভয়ানক দৃশ্য তৈরি হচ্ছিল... বিরাট বিরাট সব শিকার-অভিযান বিপুল সংখ্যক ভিখারী আর ভবঘুরেদের হাসপাতালে এনে জড়ো করছিল... পুরানো ঘিঞ্জি নোংরা হাসপাতালগুলোয় তাদের ঠেসে পোরা হচ্ছিল। কন্ট্রোলার জেনেরাল দোদুন হাসপাতালগুলোর সুপারিন্টেনডেন্টদের উদ্দেশ্যে নির্দেশিকা জারি করেছিলেন: 'ওগুলোকে সব খড়ের উপর শোয়ার ব্যবস্থা কর, আর রুটি ও জল খেতে দাও, তাহলে আরও কম জায়গায় ওদের আঁটানো যাবে।' [৫]

ইউরোপের সমাজের এই দরিদ্রশিকারের পাশে রেখে আর একটি শিকারের কাজকেও আমাদের দেখতে হবে। তা হল এই ইউরোপিয় দেশগুলোরই প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় সেই দেশগুলোর নাবিক-বণিকদের চালানো দাস-শ্রমিক শিকার। এই দ্বিতীয় শিকারটি চলছিল আফ্রিকায়, ক্যারিবিয় দ্বীপপুঞ্জে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়ায় সেই সমস্ত উপনিবেশের আদি

জনজাতিদের হত্যা করা হয়েছিল, সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়েছিল এবং বিপুল সংখ্যক মানুষকে ইউরোপিয় উদ্যোগপতিদের অধীনে দাসশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। কার্ল মার্কস এই প্রক্রিয়াকেই 'পুঁজির আদিম পুঞ্জীভবন' (Primitive accumulation of Capital) বলেছেন। বিপুল সম্পদ কেন্দ্রীভবনের পাশাপাশি এর মধ্য দিয়ে বিপুল মানুষের একটি শ্রমবাহিনী ও উদ্‌বৃত্ত শ্রমভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছিল যা পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদ বিকাশের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

ফুকো মনে করিয়ে দিয়েছেন যে আঠারো শতকে দরিদ্রশিকারের পাশাপাশি পুলিশের আরও কিছু করণীয় কাজ ছিল। সেগুলো হল: শহরে বিবিধ প্রাত্যহিক যোগানের কাজ, হস্তশিল্প ও বাণিজ্যে নির্ধারিত মান-ব্যবস্থা বজায় রাখার কাজ, ইত্যাদি। সুতরাং দরিদ্রশিকারের বিপুল কর্মসূচীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল গোটা জনগোষ্ঠীকে শিল্পোৎপাদনের নয়া ব্যবস্থার প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী গড়েপিটে নেওয়ার কাজ, সমাজজীবনকে এভাবে সাজিয়ে নেওয়ার কাজ যাতে শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন নির্দিষ্ট ভূমিকায় মানিয়ে নেওয়া ছাড়া সাধারণ মানুষের আর গত্যন্তর না থাকে। সমাজের এই গড়ে উঠতে থাকা ছকের বাইরে দাঁড়িয়ে অস্তিত্বযাপন করতে গেলেই তাকে শিকারের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠতে হবে, ঠিক যেমন আগের যুগে 'নেকড়ে-মানুষ' বা 'সংক্রামক রোগবাহী ভেড়া'-দের হতে হতো। এই বিবর্তিত যাজকীয় ক্ষমতারূপটি সমাজের আইনি বিধিব্যবস্থার থেকে পৃথকভাবে গড়ে উঠে একসময় তার সঙ্গে মিলে গেল। ফুকোর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী:

> ভবঘুরে, ভিখারী আর অলসদের ঢুঁড়ে শিকার করার এই পুলিশি বাছাই, বহিষ্কার ও বন্দি করার অনুশীলন বিচারবিধি ও আইনি চর্চাক্ষেত্রের বাইরে থেকে চলছিল।... তারপর উনিশ শতকের গোড়ায় এসে সামাজিক বাছাই প্রক্রিয়ার কার্যকরীকরণের এই পুলিশি ধাঁচা বিচারবিভাগীয় চর্চার মধ্যে অঙ্গীভূত করে নেওয়া হল কারণ নেপোলিয়ন-জমানার রাষ্ট্রে পুলিশ, বিচারব্যবস্থা ও কারা-প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পর সংযুক্ত হয়ে উঠেছিল।[৬]

শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতার প্রকৌশলের বিকাশ ও সমাজজুড়ে মান্যতা পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল কুষ্ঠের মতো সংক্রামক রোগের মহামারী আটকানোর জন্য উদ্ভাবিত কৌশল। কুষ্ঠরোগীদের চিহ্নিত করে সাধারণজনের থেকে বিচ্ছিন্ন সাধারণ বসতি থেকে দূরে তাদের জন্য নির্দিষ্ট

পৃথক এলাকায় নির্বাসিত করার কৌশল প্রয়োগের স্বার্থে এমন সব ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল যাদের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলকে বিভিন্ন ভাগে ভেঙে নজরদারি ও তথ্যসংগ্রহ করা যায়, অধিবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনের উপর তত্ত্বাবধান-তদারকি করা যায়, প্রতিটি অধিবাসীকে ব্যক্তিরূপে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, জীবনযাপনের খুঁটিনাটি নিয়েও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে কেন্দ্রীভূত করে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারভুক্ত করা যায়। প্রকৃত বা কল্পিত নানা মহামারীর বিরুদ্ধে নিরাপত্তালাভের তাড়না থেকে মহামারী মোকাবিলার বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভাবন এই ব্যবস্থাগুলো ক্রমশ সাধারণ নাগরিক অভ্যাসে পরিণত হতে থাকে। ফুকোর ভাষায়:

> একই সঙ্গে প্রকৃত ও কল্পিত নানা বিশৃঙ্খলার রূপ হিসেবে মহামারী এবং রোগনিয়ামক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়ে আসত। এই শৃঙ্খলাদায়ক কলকৌশলগুলোর পশ্চাদপটে অতিমারী, বিদ্রোহ, অপরাধ, ভবঘুরেবৃত্তি, বিতাড়ন-নির্বাসন, বিশৃঙ্খলার আবর্তে মানুষের আসা-যাওয়া বাঁচা-মরার অস্থির করে দেওয়া স্মৃতি বারবার ফিরে ফিরে আসত।...
>
> কুষ্ঠরোগীদের সংক্রামক রোগের শিকার বলে গণ্য কর, তাদের আটকে রাখার জন্য তৈরি পৃথগাবাসের বিশৃঙ্খল পরিসরে শৃঙ্খলার সূক্ষ্ম খণ্ডীকরণ আরোপ কর, তার সঙ্গে যুক্ত কর ক্ষমতার জন্য যথাযথ বিশ্লেষণাত্মক বিস্তারণের পদ্ধতি, যাকে বাতিল করা হয়েছে বা বাদ দেওয়া হয়েছে, তাকে ব্যক্তিপরিচয়ে সীমাবদ্ধ কর, কিন্তু এই ছাঁটাই বা বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করার জন্যই ব্যক্তিপরিচয়ে সীমাবদ্ধ করার প্রক্রিয়াগুলোকে ব্যবহার কর— শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা উনিশ শতকের গোড়া থেকে মনোরোগীদের হাসপাতালে, জেলখানায়, সংশোধনাগারে, অনুমোদিত বিদ্যালয়ে এবং কিছুটা মাত্রায় সাধারণ হাসপাতালে নিয়মিতভাবে এই কাজই করে এসেছে।[৭]

দুর্ভোগ ডেকে আনা 'বিশৃঙ্খলা' থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে মান্যতা আদায় করে নিয়ে নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিস্তৃতিলাভ করে। তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষের নজরদারি দৃষ্টির সামনে সমাজের প্রতিটি আনাচ-কানাচ উন্মুক্ত করে দেওয়া, নিচ থেকে উপরে তথ্যের প্রবাহ ও উপর থেকে নিচে নির্দেশ-প্রত্যাদেশের প্রবাহ বজায় রাখা, নির্দেশপালন নিশ্চিত করা, ইত্যাদির প্রয়োজনে যে প্রকৌশল জন্ম নিয়েছিল তার একটি আদর্শ ধাঁচা হিসেবে ফুকো ১৭৯১ সালে

জেরেমি বেন্থামের একটি প্রস্তাবকে উদ্ধার করে হাজির করেছেন। জেরেমি বেন্থামের এই প্রস্তাবটি প্রথম নজরে একটি স্থাপত্য-নকশা। বেন্থাম তার নাম দিয়েছিলেন 'প্যানঅপটিকন'। নকশাটিতে প্রহরী ও প্রহরাভুক্তদের স্থানিক বিস্তারণের এক বিশেষ কৌশলের মধ্য দিয়ে অবিচ্ছিন্ন প্রহরাকে সহজ ও সম্ভব করে তুলতে চাওয়া হয়েছে। বৃত্তাকার একটি পরিসরের কেন্দ্রে নজরদারি-মিনার, যেখানে প্রহরী অবস্থান করবে। আর বৃত্তটির পরিধি বরাবর এক সারি কুঠুরি, যেখানে প্রহরাভুক্তরা অবস্থান করবে। পাশাপাশি কুঠুরিগুলো একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, এক কুঠুরি থেকে অন্য কোনও কুঠুরি দেখা যায় না। কুঠুরির দুই দেওয়ালে, বৃত্তের বাইরের দিকে ও বৃত্তের ভিতরের দিকে, দুটি খোলা জানালা যা দিয়ে আলোর যাতায়াত কুঠুরির মধ্য দিয়ে অবারিতভাবে চলতে পারে ও তার ফলে কেন্দ্রস্থ নজরদারি মিনারের জানালা থেকে কুঠুরির মধ্যের ব্যক্তির সমস্ত চলাচল প্রহরীর চোখে ধরা পড়ে। নজরদারি মিনারের জানালাগুলো এমনভাবে নির্মিত যে ভিতর থেকে বাইরে দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে ভিতরে দেখা যায় না। অর্থাৎ, প্রহরীরা সবকটা কুঠুরির প্রহরাভুক্তদের দেখতে পেলেও, কোনও কুঠুরি থেকেই মিনারের ভিতরটা দেখা যাবে না। সুতরাং মিনারে দৈহিকভাবে কোনও প্রহরী উপস্থিত না থাকলেও প্রত্যেক প্রহরাভুক্তই ভাবতে থাকবে যে প্রহরী হয়ত উপস্থিত আছে এবং তার উপরই নজর রাখছে। এই বোধ থেকে প্রহরাভুক্ত বাস্তব প্রহরীর অনুপস্থিতিতেও তার উপস্থিতি বোধ করতে থাকবে এবং নিজের উপর নিজে থেকেই শৃঙ্খলা আরোপ করে রাখবে। জেরেমি বেন্থাম এই নকশাকে কেবল অপরাধীদের উপর নজর রাখার জন্য জেলখানার স্থাপত্য হিসেবে ভাবেননি। চিকিৎসাকেন্দ্রে রোগীদের উপর নজর রাখা, কারখানায় শ্রমিকদের উপর নজর রাখা, সরকারী নির্দেশ বলবৎ করতে প্রশাসকের দ্বারা সাধারণ নাগরিকদের উপর নজর রাখা— এমন সমস্ত নজরদারিই কম লোক দিয়ে ও কম খরচে করার সাধারণ উপায় হিসেবে তিনি এই প্রস্তাবটি রেখেছিলেন। ফুকোর মতে, প্যানঅপটিকন হল:

> অনুশীলনের একটি সাধারণিকরণযোগ্য ধাঁচা, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সাপেক্ষে ক্ষমতাসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার একটি উপায়।... ক্ষমতার কলকৌশলকে একটি নকশাচিত্রের মাধ্যমে এখানে একটা আদর্শ রূপে হাজির করা হয়েছে।... আসলে এটা হল রাজনৈতিক প্রকৌশলের এমন

> এক সাধারণ বিমূর্তচিত্র যা তার বিশেষ মূর্ত ব্যবহারগুলি থেকে বিযুক্ত করেই ধরতে হবে।...বহুদিকে বহুভাবে এর প্রয়োগ ঘটতে পারে।[৮]

বেন্থামের নকশাচিত্রের হুবহু অনুকরণ করে কোনও জেলখানা-হাসপাতাল-কারখানা-বিদ্যালয় তৈরি না হলেও এই নকশাকে ঘিরে চিন্তা-ভাবনা-আলোচনা-অনুশীলন সেইসব প্রকৌশলগুলোর উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে যাদের মধ্য দিয়ে প্রাত্যহিক নাগরিক জীবনের উপর অবিচ্ছিন্ন প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। ফুকোর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী:

> দুটো ধাঁচার মধ্যে বিরোধ থেকে বিভিন্ন ধরনের এক সারি দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হয়েছিল: ধর্মীয় দ্বন্দ্ব (ধর্মান্তরকরণকেই কি সংশোধনের মূল উপাদান হতে হবে?), অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব (কোন পদ্ধতিতে খরচ সবচেয়ে কম?), চিকিৎসাগত দ্বন্দ্ব (প্রহরাভুক্তদের প্রত্যেককে একে অপরের থেকে ও অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখলে তা কি তাদের মানসিক রোগীতে পরিণত করবে?), স্থাপত্যগত ও প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব (সবচেয়ে নিশ্ছিদ্র নজরদারি কোন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করা যেতে পারে?)। সন্দেহ নেই যে এইজন্যই বিতর্ক অত প্রলম্বিত হয়েছিল। কিন্তু সেই বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করে যা তাকে চালিত করছিল, তা হল আটক করে রাখার সেই বনেদি অভিপ্রায়, যা হল: কর্তৃপক্ষের তদারকির মধ্যে থেকে ঘটছে না বা উচ্চাবচ ধাপবন্দি কাঠামো অনুযায়ী সাজানো নয় এমন সমস্ত সম্পর্কে দাঁড়ি টেনে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে জোর করে গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখা।[৯]

উচ্চাবচ ধাপবন্দি কাঠামো অনুসারী নির্ধারিত সম্পর্কের গণ্ডিতে ব্যক্তিঅস্তিত্বকে বেঁধে জীবনাচরণকে নিরাপদ, স্বাভাবিক ও ফলপ্রসূ বলে যত প্রতিষ্ঠা করা গেছে, শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা ততই নতুন নতুন পরিসর অধিকার করে সর্বাত্মক হয়ে উঠেছে।

ধ্রুপদী রাজতন্ত্রে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা রাজা ও রাজন্যবর্গই ছিল উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে সর্বদৃশ্যমান। পরম সার্বভৌম ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে ইহজগতের সার্বভৌম রাজার অধিকার (প্রজাদের পালনের অধিকার এবং একইসঙ্গে প্রয়োজনবোধে বধেরও অধিকার) নির্ধারণই ছিল জ্ঞানের বিষয়। প্রজারা ছিল আলোকবৃত্তের বাইরে ছায়াচ্ছন্ন পৃথগীকরণ-অযোগ্য এক পিণ্ড। শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতার পরিসর এর ঠিক বিপরীত। এখানে ক্ষমতার কেন্দ্রস্থিত প্রহরী-কর্তৃপক্ষ ছায়াচ্ছন্ন মিনারে দৃষ্টির অগোচর। তীব্র আলো অবিচ্ছিন্ন দৃশ্যমানতায় ভাস্বর করে রাখতে চায় প্রহরীভুক্ত

জনতাকে। পিণ্ডরূপে নয়, ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেককে তার অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্তের বিশেষত্ব দিয়ে চিহ্নিত করে রাখতে চায়। সেইজন্য সমস্ত বিষয়ে সমস্ত সময়ে তথ্যসংগ্রহ, তথ্যের সারণিবদ্ধকরণ, তথ্যবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিরন্তর সূক্ষ্ম থেকে আরো সূক্ষ্ম বিভাজিকা রেখা টেনে বস্তুর বিভাজন এবং সেই বিভাজন অনুযায়ী তদারকি-নজরদারি-পরিচর্যার পৃথক ব্যবস্থাপনা তৈরির মধ্য দিয়েই এখন জ্ঞানচর্চার গতিপথ পাতা। জ্ঞানের বিষয়ী মানুষ, জ্ঞানের বিষয়ও মানুষ। জনতাকে ব্যক্তিঅস্তিত্বে বিচ্ছিন্ন করা ও নজরদারির অন্তর্গত করার রাজনৈতিক প্রকৌশলগুলোর অগ্রগতি ঘটল এই রাজনৈতিক সমস্যাটিকে রাজনৈতিক প্রতর্কের গণ্ডির বাইরে নিয়ে গিয়ে বিজ্ঞানের তথাকথিত নিরপেক্ষ প্রতর্কের অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকের শুরুতে ইউরোপে গড়ে ওঠা নতুন ধরনের হাসপাতাল-জেলখানা-সংশোধনাগারগুলো অপরাধ, অপরাধ-মানসিকতা ও অপরাধী বিষয়ে একটি জ্ঞানশাখা নির্মাণের গবেষণাগার হয়ে উঠল। বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্ববিদ্যার জন্ম হল এর মধ্য দিয়ে। আর রাজনৈতিক সমস্যাটি পরিণত হয়ে গেল প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের বৈজ্ঞানিক নির্ধারণের বিষয়ে। নির্ণয় করা হল যে হাসপাতাল-জেলখানা-সংশোধনাগারে বন্দি মানুষরা বিভিন্ন ধরনের 'অস্বাভাবিকতা'-র শিকার, তাদের স্বাভাবিকীকরণের জন্য চিকিৎসা বা সংশোধন-প্রচেষ্টা চালাতে হবে 'বৈজ্ঞানিক' মতে। ব্যক্তি-অস্তিত্বে বিচ্ছিন্ন করে নজরদারির মধ্যে বন্দি করে রাখার বিবিধ বিধানের 'অস্বাভাবিকতা সংশোধনের' ক্ষেত্রে ব্যর্থতা যখনই প্রকট হয়ে উঠত, তখনই আরো কড়া বিচ্ছিন্নতা ও আরো কড়া নজরদারি সংশোধনী হিসেবে প্রস্তাবিত হতো। ফুকোর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী:

> সাধারণ চিকিৎসা ও মনোরোগ চিকিৎসায় স্বাভাবিকতার তদারকি করার চর্চা গেঁড়ে বসল যা ওই স্বাভাবিকতা-আরোপকে এক ধরনের বৈজ্ঞানিকতার চরিত্র দান করল। বিচারবিভাগও এর সমর্থনে আইনি যুক্তি তৈরি করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার সহায় হল।[১০]

সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সম্পদবৃদ্ধির জন্য আদর্শ 'বৈজ্ঞানিক' ব্যবস্থা হিসেবে এক নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিকতার পোষাকে শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতার আদ্যন্ত রাজনৈতিক চেহারাটি ঢাকা পড়ল। তার ফলে 'রাজা/রাজন্য— প্রজা' বা 'যাজক— শরণাগতের' মতো গুটিকয় স্পষ্ট সম্পর্কের বদলে অসংখ্য স্পষ্ট বা অস্পষ্ট, সুগঠিত বা জায়মান সম্পর্করাজির রূপ ধরে শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা

কাজ করতে থাকে। সরকার/প্রশাসন— জনতা, কর্তৃপক্ষ— সভ্য/সদস্য, ব্যবস্থাপক— কর্মী, চিকিৎসক— রোগী, শিক্ষক— ছাত্র এমন তুলনামূলক স্পষ্ট সম্পর্কগুলোর সাথে জড়িয়ে বা গায়ে-গায়ে লেগে থাকে তুলনায় অস্পষ্ট বিবিধ সম্পর্ক, যেমন: বিশেষজ্ঞ— সাধারণজন, জ্ঞানোৎপাদক— জ্ঞানগ্রাহী, প্রশিক্ষিত— প্রশিক্ষণহীন, অগ্রসর— পশ্চাৎপদ, সুস্থ— রোগগ্রস্ত, স্বাভাবিক— অস্বাভাবিক, ইত্যাদি। ক্ষমতার চর্চা এখানে কেবল একটি বা কয়েকটি নির্ধারক সম্পর্কের গ্রন্থিপথ ধরে প্রবাহিত হয় না, বহুবিধ ও বহুবিক্ষিপ্ত গ্রন্থিপথ ধরে প্রবাহিত হয়ে এক বিস্তৃত জালের চেহারা নেয়। সেই জালের বুনট হয়ত বিশেষ কিছু প্রতিষ্ঠান বা কাঠামোর (যেমন, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান) নিকটাঞ্চলে বেশি ঘন ও আঁটো হয়ে ওঠে, কিন্তু সর্বত্রই তা প্রসারিত থাকে। এমনকি প্রহরাভুক্ত মানুষদের মগজও তার বাইরে থাকতে পারে না। প্যানঅপটিকন নকশার কুঠুরির বাসিন্দারা প্রহরীমিনারে প্রহরী উপস্থিত না থাকলেও ভাবতে থাকে যে প্রহরীর চোখ তার উপর রয়েছে, ফলে নিজেই নিজেকে শৃঙ্খলার বাঁধনে বেঁধে রাখে। এখানে প্রহরীভুক্তের ব্যক্তিসত্ত্বার একটি খণ্ডিত অংশই কি প্রহরীর কাজ করে না? প্রহরী কি প্রহরীভুক্তের অন্তঃস্থ হয়ে যায় না? সেভাবেই শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতার পরিসরের মধ্যে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান বা বিজ্ঞান কি আমাদের মগজের মধ্যে বসেই প্রহরা চালিয়ে যায় না? ফলে ক্ষমতাধর ও ক্ষমতাহীন এমন সহজ কোনও বিভাজনকে অসম্ভব করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই ক্ষমতারূপ সহজ কোনও দ্বিপাক্ষিক বৈরিতার পথ ধরে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধকেও অকার্যকরী করে তোলে।

আঠারো শতকের শেষদিক ও উনিশ শতকের গোড়া থেকে শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতার সাধারণ কাঠামোর মধ্যেই আরেক ক্ষমতারূপের উদ্ভব ফুকো চিহ্নিত করেছেন। জনসংখ্যা-বিস্ফোরণ ও পুঁজিবাদী শিল্পায়নের গতি এমন এক ক্ষমতার চাহিদা জন্ম দিয়েছিল যা কেবল ব্যক্তির ব্যক্তি-অস্তিত্বকে শৃঙ্খলায়িত করবে না, সমষ্টিগতভাবে জনসমষ্টিকেও নজরদারি, স্বাভাবিকীকরণ ও প্রমিতকরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে বাঁধতে পারবে। সেই ক্ষমতারূপকে ফুকো 'জৈবক্ষমতা' (Biopower) নাম দিয়েছেন। এই ক্ষমতারূপ এমন কিছু প্রকৌশল জারি করার মধ্য দিয়ে সক্রিয় হল যা ব্যক্তির দেহের স্বতন্ত্রীকরণ করে তার উপর প্রযুক্ত হওয়ার বদলে সাধারণ জৈবিক প্রক্রিয়াসমূহের উপর প্রযুক্ত হল। জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জৈবিক উৎপাদন-

পুনরুৎপাদন, সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত করে জনসমষ্টিকে উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণ করা— এহেন জৈবিক প্রক্রিয়াসমূহের ব্যবস্থাপনার আশু লক্ষ্য নিয়ে তা হাজির হল। রাষ্ট্রীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, গণকল্যাণ তহবিল, বীমা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মতো একগুচ্ছ রাষ্ট্রীয় স্তরের নিচেরতলার সামাজিক প্রতিষ্ঠান দ্রুত বংশবিস্তার করে এই ক্ষমতারূপের প্রবাহপথের জাল সমাজজুড়ে ছড়িয়ে দিল। জন্মহার, মৃত্যুহার সহ গণস্বাস্থ্যের নানা সূচক ও উৎপাদিকা হার পরিমাপের নানা সূচক তৈরি করে তার সাপেক্ষে নিরন্তর তথ্যসংগ্রহের পরিসংখ্যানগত কাজ, তা বিশ্লেষণ করে সাধারণ গতি নির্ণয়, 'বৈজ্ঞানিক' পূর্বাভাস ঘোষণা, নির্ধারিত সমষ্টিগত লক্ষ্যের সঙ্গে তার তুলনা করে বৈজ্ঞানিক বিধানপত্র রচনা ও সমষ্টির স্তরে সেই বিধান প্রয়োগ করার উপায় উদ্ভাবন— এর মধ্য দিয়ে জ্ঞানের বিষয় ও রূপও নতুনভাবে নির্ধারিত হল। এককথায় বললে, শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতাকাঠামোর মধ্যেই এমন এক জৈবিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামো স্ফূরিত হল যা জৈবিক নিয়ামকের কাজ করতে পারে।

ইউরোপে জৈবিক প্রক্রিয়াসমূহের উপর নজরদারি, নিয়ন্ত্রণ ও প্রমিতকরণের এই ক্ষমতারূপ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুগপৎভাবে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদ প্রধান হয়ে উঠল। ব্যক্তি হিসেবে দেখার চেয়ে প্রজাতি হিসেবে দেখার উপর জোর পড়ার পাশাপাশিই বিবর্তনবাদ এমন এক তত্ত্বকাঠামো হাজির করল যেখানে বিভিন্ন প্রজাতিকে বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের আনুভূমিক বিস্তারে না দেখে ক্রমবিকাশের উচ্চাবচ ধাপবন্দি কাঠামোর উল্লম্ব বিস্তারে ফেলে দেখাই মান্যতা পেল। ক্রমবিকাশের প্রায় সরলরৈখিক ধারায় অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রজাতি অবস্থিত ধরে নিয়ে অগ্রগামিতা-পশ্চাৎপদতার একটি ক্রমবিন্যস্ত সারণি নির্মিত হল। নির্মিত সেই সারণি অনুযায়ী ইউরোপের প্রধান জনগোষ্ঠীগুলো ও তাদের সমাজব্যবস্থা সবচেয়ে অগ্রগামী আর বাকি গোটা বিশ্বের বিবিধ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী ও তাদের সমাজব্যবস্থাগুলো সবই পিছিয়ে পড়া, অবিকশিত বা বিকাশ-অর্জনে ব্যর্থ। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল বিভিন্ন প্রজাতিদের মধ্যে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তুলনায় কম সমর্থ প্রজাতিদের বিনাশ ও অগ্রবর্তীদের আধিপত্যের মধ্য দিয়ে 'প্রাকৃতিক বাছাই প্রক্রিয়া' সম্পন্ন হওয়ার তত্ত্ব। ফলে ইউরোপের প্রধান জাতিগুলোর উপনিবেশ বিস্তারের হিংস্র অভিযান, আমেরিকা

মহাদেশের আদি মানবগোষ্ঠীদের হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে হত্যা বা দাসে পরিণত করার ভয়ংকর অভিযান, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়া মহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা ও এই সবের মধ্য দিয়ে পৃথিবী জুড়ে মানবসমাজের বিবিধ রূপের বৈচিত্র্য ও পার্থক্যকে দুরমুশ করে নিজেদের সমাজরূপ-সংস্কৃতির একরঙা বিবর্ণ আকিঞ্চনতায় সবকিছু ঢেকে দেওয়ার প্রক্রিয়া সবই 'প্রাকৃতিক বাছাই প্রক্রিয়া' হিসেবে এক বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিকতা-নিরপেক্ষতার মুখোশ পরে নিল। অপর সমস্ত বৈচিত্র্য ধ্বংস করে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এক নিদারুণ রাজনৈতিক প্রতর্ক মুখোশ পরে জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সাধারণ প্রতর্ক হিসেবে মর্যাদার আসন দখল করল।

ইউরোপের নিজের সমাজের মধ্যেও প্রজাতিগত ধাপবন্দি কাঠামো নির্মাণের এই জৈবক্ষমতাগত কৌশল গভীর ছাপ ফেলল। তার একটি বড় উদাহরণ হিসেবে আমরা ইহুদিবিদ্বেষের রূপান্তরকে দেখতে পারি। ইহুদিবিদ্বেষের ইতিহাস অনেক পুরানো। বিদ্বেষপোষণকারীরা তাদের বিদ্বেষের কারণ হিসেবে সেই পুরাকালে যিশুর সময়ে ইহুদিদের ধর্মীয়-রাজনৈতিক ভূমিকা বা আরও সম্প্রতিতে তাদের করসংগ্রাহক বা সুদখোর মহাজন হিসেবে ভূমিকার দিকেই আঙুল তুলত। কিন্তু উনিশ ও বিশ শতকে এই ইহুদিবিদ্বেষের রূপ পাল্টে গেল। ইহুদিরা যা করে বা সমাজে ইহুদিদের যা ভূমিকা, তা এখন আর ইহুদিবিদ্বেষের প্রধান কারণ নয়, এখন একজন ইহুদি যে ভূমিকাই পালন করুক না কেন, কেবলমাত্র ইহুদি হওয়ার জন্যই সে বিদ্বেষের পাত্র। অর্থাৎ, সে ব্যক্তিগতভাবে কী, বা সে কী করে বা করেছে, তার জন্য নয়, তার প্রজাতিগত পরিচয়ের জন্যই সে বিদ্বেষের পাত্র। আর প্রজাতিগতভাবে চিহ্নিত বিদ্বেষের পাত্র জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করতে হবে প্রজাতিগতভাবেই— যে ভাবনা তার চূড়ান্ত রূপে পৌঁছেছিল জার্মান নাজিদের পরিকল্পিত 'অন্তিম সমাধান'-য়ের মধ্য দিয়ে সমস্ত ইহুদিদের হত্যা করার প্রকল্পের মধ্য দিয়ে। সোভিয়েত রাশিয়াতেও স্তালিনি শাসনে তাতার, চেচেন, জার্মান, ইউক্রেনিয়, ইহুদি ইত্যাদি বিভিন্ন অ-রুশ জনজাতির মানুষদের বাসভূমি থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা, নজরবন্দি শিবিরে জড়ো করা ও সন্ত্রাসে বেঁধে রাখার মধ্য দিয়ে এর রূপ আমরা দেখেছি। বিশ শতকে আবির্ভূত হওয়া সর্বাত্মকতাবাদী (totalitarian) রাষ্ট্রের এই দুই রূপ— ফ্যাসিবাদী রূপ ও কম্যুনিস্ট রূপ— বিদ্বেষী জাতিবাদকে তার

চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে গিয়ে প্রকাশ করেছিল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে অন্যান্য ইউরোপিয় রাষ্ট্ররূপগুলো বিদ্বেষী জাতিবাদ থেকে মুক্ত ছিল। বরং উদারনৈতিক থেকে সর্বাত্মকতাবাদী সবধরনের রাষ্ট্রগুলোই জাতিরাষ্ট্র হিসেবে জৈবক্ষমতার প্রকৌশলসমূহ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বিদ্বেষী জাতিবাদকেই তার ভিত্তি করেছিল। এর হাত ধরেই ভিনদেশী শ্রমিকদের প্রতি বিদ্বেষ, অপর ধর্মগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ, উদ্বাস্তু সমস্যা ও উদ্বাস্তু-বিদ্বেষ, রাষ্ট্রহীন ত্রিশঙ্কু জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও তাদের প্রতি বিদ্বেষ নতুন চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে ও ক্রমাগত তীব্র হয়ে উঠেছে। কোনও অঞ্চলের অধিবাসীদের বা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব পরিচয় নির্ধারণ করা বা খণ্ডন করা, চিহ্নিত অ-নাগরিকদের তাড়িয়ে দেওয়া বা প্রাণে মেরে ফেলা যে কোনও রাষ্ট্রের 'স্বাভাবিক' অধিকার হয়ে উঠেছে। 'জাতীয়' জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির যুক্তির বাঁধনে রাষ্ট্র এই কাজে তার 'আইনি নাগরিকদের' সমর্থন ও অংশগ্রহণও নিশ্চিত করে তুলতে পারছে। ফুকোর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী:

> একদিকে রয়েছে এই ধারণা যে রাষ্ট্র তার নিজস্ব প্রকৃতি ও নিজস্ব চরমাবস্থার অধিকারী। অন্যদিকে আছে এই ধারণা যে মানুষ যে মাত্রায় উদ্‌বৃত্ত শক্তি উৎপাদন করে, যে মাত্রায় সে একটি জীবিত, কর্মরত ও বাঙ্ময় জীব, যে মাত্রায় সে একটি সমাজের অংশ এবং যে মাত্রায় সে একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যের একটি জনসমষ্টির অংশ, সেই মাত্রাতেই সে রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রকৃত বিষয় হয়ে ওঠে। এই দুই ধারণার মধ্য থেকে ব্যক্তি-মানুষের জীবনে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ ঘটতে আমরা দেখি। এই ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতার সমস্যাবলীতে জীবন ক্রমশ আরও গুরুত্বের স্থান পেতে থাকে; তার ফলাফল হিসেবে সবচেয়ে সূক্ষ্ম রাজনৈতিক প্রকৌশলের সাহায্যে মানুষের এক ধরনের পাশবিকীকরণ সম্পন্ন করা হয়। মানববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান-গুলোর সম্ভাবনা যেমন বিকশিত হতে থাকে, পাশাপাশি তেমনই জীবনরক্ষার সম্ভাবনা ও গণহত্যা সংঘটনের সম্ভাবনা যুগপৎভাবে ইতিহাসের মঞ্চে আবির্ভূত হয়।[১১]

জৈবক্ষমতা ও তৎসংযুক্ত বিদ্বেষী জাতিবাদ কেবলমাত্র রাষ্ট্রের শাসন-নিপীড়ন চালানোর একটি জোরালো হাতিয়ার নয়, গণস্তরে প্রতিটি মানুষের আত্মপরিচয়নির্মাণ ও অপরের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এই প্রসঙ্গে ইহুদিনিধনের যুক্তি হিসেবে হিটলারের করা

একটি উক্তিকে সামনে রেখে আলোচনা করা যাক। উক্তিটি হিটলার করেছিলেন অন্তরঙ্গ মহলে, তাঁর সহকর্মীদের কাছে। উক্তিটি এইরকম:

> ইহুদিদের নিছক অস্তিত্বটাই ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির। বহু ইহুদি নিজেরা এ সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু কেউ যদি জীবনকে ধ্বংস করে, তাহলে সে নিজেই নিজেকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেয়, তাই ইহুদিদের ক্ষেত্রেও এখানে কোনও ব্যতিক্রম হবে না। বিড়াল যখন ইঁদুর ধরে খায়, তখন বিড়াল বা ইঁদুর কাউকেই কি কোনও দোষ দেওয়া যায়?[১২]

এখানে একটি জনগোষ্ঠীর, অর্থাৎ ইহুদিদের, কোনও কাজ বা ভূমিকাকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন পড়ে নি, তাদের অস্তিত্বটাকেই সমাজ-সভ্যতা ও জীবনের জন্য ধ্বংসাত্মক হিসেবে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেই জন্য তারা নিজেই নিজেদের মৃত্যুর কারণ বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। একেবারে জৈবক্ষমতার ছাঁচে তৈরি কথা। তার পরের কথাটি আরও চমকপ্রদ। এখানে ইহুদিদের ইঁদুরের সঙ্গে আর ইহুদি-শিকারীদের বিড়ালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ইঁদুর-শিকার যেমন বিড়ালের জৈবিক প্রবণতা, ইহুদি-শিকারও তেমন জার্মানদের জৈবিক প্রবণতা, তাই এই নিয়ে কোনও নীতি-নৈতিকতার বিচার অর্থহীন! এহেন মনোভাবকে কেবলমাত্র হিটলার-সুলভ বা ফ্যাসিবাদ-সুলভ বলে গণ্য করা ঠিক হবে না, কারণ হিটলার-পতনের পরও বহু স্বঘোষিত অ-ফ্যাসিবাদী বা ফ্যাসিবাদবিরোধীও এই চোখেই তাঁদের অপরকে দেখেন। সেই অপর ইহুদি হওয়ার বদলে কখনও 'সন্ত্রাসবাদী', কখনও 'দেশদ্রোহী', কখনও মুসলিম, আবার কখনও নেহাতই কোনও সংখ্যালঘু বা অপর জনগোষ্ঠীর মানুষ। জৈবক্ষমতার যুক্তি অপরকে ধ্বংস করা বা হত্যা করাকে এমন এক স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরে যার মধ্য দিয়ে নিজ জনগোষ্ঠীর জীবন ও সভ্যতার জীবনীশক্তিকে আরও তেজিয়ান করে তোলা যায়, নাছোড় সমস্যাগুলোর মূল উপড়ে ফেলা যায়। এই রূপ ধরে জৈবক্ষমতার যুক্তিপ্রণালী জ্ঞান ও কান্ডজ্ঞান হিসেবে শাখা বিস্তার করে।

ক্ষমতার এই বিভিন্ন রূপ— সার্বভৌম ক্ষমতা, যাজকীয় ক্ষমতা, শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা, জৈবক্ষমতা— বিশ্লেষণ করার সময় ফুকো প্রতিটি রূপেরই উদ্ভব ও বিকাশকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি কোনও বিবর্তনমূলক ধারায় তাদের বাঁধেননি, সেই ভাবে কোনও বিবর্তনমূলক ধারা তৈরির তিনি বিরোধীও বটে। বর্তমান সময়ের ইউরোপিয় ঘরানার সমাজের

দিকে তাকালে আমরা জৈবক্ষমতা ও শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতার প্রাধান্য দেখতে পেলেও যাজকীয় ক্ষমতা ও সার্বভৌম ক্ষমতার বিভিন্ন রূপকেও খুঁজে পাব। অর্থাৎ, বিষয়টি এমন নয় যে বিবর্তনের ধারায় একটি ক্ষমতারূপ আরেকটি ক্ষমতারূপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। বরং এভাবে দেখা যেতে পারে যে বিবর্তন ও বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার বুনট আরও ঠাসবুনট হচ্ছে, আরও জটিল হচ্ছে।

এহেন জটিল, ঠাসবুনট ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রশ্নটাকে তাহলে আমরা কীভাবে দেখব? ফুকোই বা কীভাবে দেখেছেন? এবার আলোচনা সেইদিকে ঘোরানো যাক।

২। প্রতিরোধ প্রসঙ্গে

ফুকোর একটি সংহত সূত্রায়ণ সামনে রেখে এই প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করা যাক। ফুকোর মতে:

> যেখানে ক্ষমতা, সেখানেই প্রতিরোধ। তবু, বা বলা ভালো, সেইজন্যই, ক্ষমতার সাপেক্ষে প্রতিরোধ কখনই বহিঃস্থ নয়। তার মানে কি এই যে সর্বদাই ক্ষমতার 'অভ্যন্তরে' থাকতে হয়, তাকে 'এড়ানোর' কোনও পথ নেই, তার সাপেক্ষে 'বহিঃস্থ' বলে কিছু হয়না কারণ যে কোনও অবস্থাতেই তার নিয়মের অধীন থাকতে হয়? বা, এমনটা কি বলতে হবে যে, যুক্তিবন্ধনের ছল যেমন ইতিহাস, ইতিহাসের ছল তেমন ক্ষমতা, শেষাবধি সর্বদাই সে জয় হাসিল করে? কিন্তু তা হলে তো ক্ষমতা-সম্পর্কগুলোর কঠোরভাবে সম্পর্ক-সাপেক্ষ চরিত্রকে ভুল বোঝা হবে। ক্ষমতা-সম্পর্কের প্রতিপক্ষ, সহায় ও বাঁটের ভূমিকা পালন করে যে প্রতিরোধ-বিন্দুর বহুত্ব, তার উপর ক্ষমতা-সম্পর্কের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। ক্ষমতার জালের সর্বত্রই এহেন প্রতিরোধবিন্দু বর্তমান। সুতরাং মহান 'প্রত্যাখ্যানের' কোনও একমেবাদ্বিতীয়ম গতিপথ নেই, নিটোল সত্ত্বা বিশিষ্ট এমন কোনও বিদ্রোহ থাকতে পারে না যা সমস্ত বিদ্রোহের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে, নেই বিপ্লবের কোনও খাঁটি নিয়ম। তার পরিবর্তে আছে প্রতিরোধসমূহের বহুত্ব। প্রতিটি প্রতিরোধ একটি বিশেষ ঘটনা: সম্ভবপর প্রতিরোধ, প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ, সম্ভাবনাহীন প্রতিরোধ; প্রতিরোধ যেগুলো স্বতঃস্ফূর্ত বা অপরিশীলিত বা নিঃসঙ্গ বা কয়েকজনের দ্বারা পরিকল্পিত বা অনিয়ন্ত্রিত বা হিংসাত্মক; আবার অন্যতর প্রতিরোধ যেগুলো আপসমুখী বা স্বার্থচালিত বা

আত্মবলিদানমুখী; সংজ্ঞার্থে তারা কেবল ক্ষমতা-সম্পর্কের কৌশলক্ষেত্রের মধ্যেই অস্তিত্বধারণ করতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এগুলো শুধুমাত্র এমনই প্রতিক্রিয়া বা ছিটকে ওঠা যা শেষ বিচারে বুনিয়াদী আধিপত্যের সাপেক্ষে নিষ্ক্রিয়তাসর্বস্ব ও পরাজয়-নিশ্চিত এক তলদেশ তৈরি করে। হাতে গোনা কয়েকটা অসমসত্ত্ব নীতি থেকে প্রতিরোধ উদ্ভূত হয়না, আবার এমন কোনও প্রলোভন বা অঙ্গীকার থেকেও হয়না যা বাধ্যতামূলকভাবেই অধরা থাকবে। ক্ষমতার সাপেক্ষে প্রতিরোধ হল বেজোড় পদ; ক্ষমতার মধ্যে লঘুকরণ-অসম্ভব বিপরীত হিসেবে তারা আকীর্ণ। আর সেজন্যই প্রতিরোধের বিন্যাস নিয়মহীন: সময় ও পরিসরের জমিতে প্রতিরোধের বিন্দু, গ্রন্থি ও অধিশ্রয়ণগুলো পরিবর্তনশীল ঘনতায় ছড়ানো, সময়বিশেষে তা ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীদের কোনও এক সুনির্দিষ্ট পন্থায় সংহত করে, কোনও নির্দিষ্ট দেহবিন্দু বা জীবনমুহূর্ত বা আচরণাবলীকে প্রজ্জ্বলিত করে তোলে। তাহলে কি কোনও মহান বিপ্লবী ভাঙন হতে পারে না, হতে পারে না কোনও বিপুল দ্বি-বিভাজন? কখনও কখনও হতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই যা ঘটে তা হল প্রতিরোধের অস্থিতিশীল ও ক্ষণস্থায়ী বিন্দুসমূহ, যেগুলো সমাজে ফাটল তৈরি করে, ফাটলগুলো অনবরত অবস্থান পাল্টাতে পাল্টাতে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যে ভাঙন ধরায় ও নিত্যনতুন গোষ্ঠীগঠন ঘটায়, ব্যক্তির নিজের মধ্যেও গর্ত খুঁড়ে, টুকরোয় কেটে আবার পুনর্গঠন করে দেহে ও মনে লঘুকরণ-অসম্ভব অঞ্চল চিহ্নিত করে দিয়ে যায়। ক্ষমতা-সম্পর্কের জাল যেমন বিশেষ যন্ত্রাদি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আসলে সীমাবদ্ধ না হয়েও বহমানতায় তাদের মধ্যে নিবিড় বুনটের রূপ ধারণ করে, রাষ্ট্র যেভাবে ক্ষমতা-সম্পর্কগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সংহতকরণের উপর নির্ভর করে, ঠিক তেমনই প্রতিরোধের বিন্দুগুলোর ঝাঁক সামাজিক স্তরবিন্যাস ও ব্যক্তিদের ঐক্য পেরিয়ে বহমান থাকে। আর সন্দেহ নেই যে এহেন প্রতিরোধের বিন্দুগুলোর কৌশলী সংহিতাকরণ বিপ্লবকে সম্ভব করে তোলে।[১৩]

ফুকোর উপস্থাপনার এই ঘন সংবদ্ধ রূপের অন্তর্গত কিছু কিছু দিককে একটু ছড়িয়ে মেলে দেখা যাক। প্রথমত ক্ষমতার জটিল ঠাসবুনট বুনন সমাজব্যাপী হওয়ার মানে এই নয় যে প্রতিরোধ অসম্ভব বা প্রতিরোধের পরিসর ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। বরং ঠিক তার বিপরীতটাই ফুকোর বক্তব্য। ক্ষমতা যতটা ব্যাপ্ত, প্রতিরোধও ততটাই ব্যাপ্ত: যেখানে ক্ষমতা, সেখানেই প্রতিরোধ। কিন্তু প্রতিরোধকে তিনি ক্ষমতার সাপেক্ষে বহিঃস্থ বলে মনে করেন না।

অর্থাৎ, ক্ষমতার বাইরে থেকে ক্ষমতার বিরোধকারী কোনও বস্তু প্রতিরোধ নয়। এই খণ্ডনের মধ্য দিয়ে ফুকো আসলে ক্ষমতা ও প্রতিরোধ সম্বন্ধে বহুপ্রচল একটি ধারণাকে খণ্ডন করতে চাইছেন, যে ধারণাকে তাঁর 'যৌনতার ইতিহাস' বইয়ে তিনি 'অধিকারক্ষেত্রীয়-প্রতার্কিক' (juridico-discursive) ধারণা বলে আখ্যাত করেছেন।[১৪] ফুকোর ধারণাকে বোঝার জন্য যে ধারণাকে তিনি খণ্ডন করছেন তাকে প্রথমে বোঝা যাক।

এই ধারণামতে ক্ষমতা এমনকিছু যা বাধা, দমন ও নিষেধাজ্ঞার মধ্য দিয়ে কাজ করে। প্রকৃত বাস্তবতাকে সে আড়াল করতে চায়, স্বতঃস্ফূর্ততায় বেড়ি পড়াতে চায়, সত্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মিথ্যাকে জাহির করতে চায়, জ্ঞানের উৎপাদন বন্ধ করতে বা অন্তত বিকৃত করতে চায়। আর এর মধ্য দিয়ে ক্ষমতা স্বাভাবিক আকাঙ্খাকে অবদমন করে, মিথ্যা বা কৃত্রিম চেতনা জাগায়, জ্ঞানহীনতার পৃষ্ঠপোষণা করে। সত্য-স্বাভাবিকতা-স্বতঃস্ফূর্ততা ক্ষমতার প্রতিপক্ষ, তাই অবদমন-নিষেধাজ্ঞা অস্বীকার করে সত্যকে তুলে ধরা, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই হল প্রতিরোধ।

এই ধারণায় ক্ষমতা ও প্রতিরোধকে একটি নঙর্থক > < সদর্থক বিরোধের মধ্য দিয়ে দেখা হয়। ক্ষমতা নঙর্থক কারণ তা সত্য, জ্ঞান, স্বতঃস্ফূর্ততার অবদমনকারী বা খণ্ডনকারী, আর প্রতিরোধ সদর্থক কারণ তা সত্য, জ্ঞান, স্বতঃস্ফূর্ততাকে বাধামুক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করে। এই অর্থেই প্রতিরোধ ক্ষমতার বহিঃস্থ বস্তু, তার অস্তিত্ব ক্ষমতার বিপরীতে পৃথক বা আলাদা।

কিন্তু ক্ষমতা সম্পর্কে ফুকোর বিশ্লেষণ থেকে আমরা দেখি যে ক্ষমতাকে কেবলমাত্র এই নঙর্থক অস্তিত্ব দিয়ে দেখা ঠিক নয়। ক্ষমতা কেবলমাত্র সত্য, জ্ঞান ও স্বতঃস্ফূর্ততাকে অবদমন বা খণ্ডন করে না, তা সত্য, জ্ঞান ও স্বতঃস্ফূর্ততা উৎপাদনও করে। একটি প্রতর্কের সত্যাসত্য বিচার করার পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞানের বিষয় কী হবে এবং কাকে জ্ঞান বলে স্বীকার করা হবে, কোন প্রবৃত্তিগুলোকে স্বাভাবিক বলে ধরা হবে ও সেই সূত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা বলে কাকে মান্যতা দেওয়া হবে— এই সবই ক্ষমতাসম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত হয়। যাজকীয় ক্ষমতা, শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা ও জৈবক্ষমতা— ক্ষমতার সবকটা রূপের অধীনেই এই সত্য, জ্ঞান ও স্বতঃস্ফূর্ততা উৎপাদনের নিজস্ব প্রকৌশলসমূহ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সুতরাং সত্য, জ্ঞান ও স্বতঃস্ফূর্ততার প্রতর্ক হাজির করা, তা যতই প্রতিস্পর্ধী হোক না কেন, তাকে আমরা একলপ্তে ক্ষমতাবলয়ের বাইরের একটি ক্রিয়া হিসেবে

ধরে নিতে পারি না। বরং তা ক্ষমতাবলয়ের মধ্যে, ক্ষমতাসম্পর্কের মধ্যস্থতায়, ক্ষমতার প্রকৌশল ব্যবহারের মধ্য দিয়েই সম্পাদিত একটি কাজ। ক্ষমতা কেবল অবদমন ও নিষেধাজ্ঞা আরোপের মধ্য দিয়ে কাজ করে না, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা সৃষ্টির মধ্য দিয়েও কাজ করে, মান্যতা তৈরি করে। একটি আধিপত্যবাদী প্রতর্ক আরোপ করার মধ্য দিয়ে কেবল নয়, বহু পরস্পরবিরোধী প্রতর্কের প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়েও সে কাজ করে (যেমন জৈবক্ষমতা জীবনকে নিরাপত্তা দেওয়া ও গণহত্যা সংঘটিত করার পরস্পরবিরোধী প্রতর্ককে যুগপৎভাবে ব্যবহার করে)। প্রতিরোধ তাই ক্ষমতার বহিঃস্থ নয়। প্রতিরোধ ও ক্ষমতা এমনভাবে কুস্তির প্যাঁচে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে যা নব নব কৌশল উদ্ভাবনের পথে একে অপরকে উত্তেজিত, উৎসাহিত করতে থাকে। ক্ষমতার জাল জুড়ে প্রতিরোধবিন্দু ছড়িয়ে থাকে।

ক্ষমতা ও প্রতিরোধকে একে অপরের বাইরে ও একে অপরের বিরোধী হিসেবে স্থাপনের আর একটি তাৎপর্য থাকে। অবদমনকারী, নিষেধাজ্ঞা-আরোপকারী ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অবদমিত সত্যটিকে উপলব্ধি ও উদ্ধার করে তুলে ধরছেন যিনি, তিনি সর্বজনীন পথপ্রদর্শক হিসেবে ক্ষমতার বাইরে ও প্রতিরোধের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সত্যদ্রষ্টা বুদ্ধিজীবী হিসেবে, প্রতিরোধের নেতা হিসেবে ক্ষমতাধিপত্য-মুক্ত এক ভবিষ্যতে পৌঁছানোর পথ সাধারণজনের সামনে হাজির করছেন ও সেই পথে সাধারণজনকে শামিল করছেন। প্রতিরোধের সদর্থক বলয়ের মধ্যে তিনি প্রধান পুরুষ। এই প্রধান পুরুষের ভূমিকায় কোনও দার্শনিক থাকতে পারে, রাজনীতিবিদ থাকতে পারে, আবার কোনও বিপ্লবী মতবাদ বা মতবাদ-চালিত বিপ্লবী পার্টিও থাকতে পারে। তার মধ্য দিয়ে এই প্রতিরোধের বলয়েও একটি ধাপবন্দি কাঠামো তৈরি হয় যেখানে সর্বোচ্চ ধাপে স্থিত এই প্রধান পুরুষের কাছে নিচের ধাপে স্থিত সাধারণজনকে প্রতিরোধের স্বার্থে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এই ধাপবন্দি কাঠামোও তার স্বকীয় শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতার জন্ম দেয়। শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতার সমস্ত প্রকৌশল (যেমন, বিপ্লবী শৃঙ্খলার সংহিতাকরণ, শৃঙ্খলা ও মতবাদের শুদ্ধতা রক্ষার্থে নজরদারি, শৃঙ্খলাভ্রষ্ট বা মতবাদভ্রষ্টদের শাস্তিদান বা বিতাড়ন, ইত্যাদির বিভিন্ন প্রকৌশল) এই ধাপবন্দি কাঠামোর উপর থেকে নিচ অবধি সমস্ত সম্পর্ককে

নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবে ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার বদলে একটি ঠাসবুনট ক্ষমতার ক্ষেত্রই তৈরি হয়।

এভাবে প্রতিরোধের নামে ক্ষমতার অপর একটি ঠাসবুনট ক্ষেত্র গড়ে তোলাকে প্রতিরোধ করতেই ফুকো বলেছেন যে মহান 'প্রত্যাখ্যানের' কোনও একমেবাদ্বিতীয়ম গতিপথ নেই, নিটোল সত্ত্বা বিশিষ্ট এমন কোনও বিদ্রোহ থাকতে পারে না যা সমস্ত বিদ্রোহের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে, নেই বিপ্লবের কোনও খাঁটি নিয়ম। অর্থাৎ প্রতিরোধের বিন্দুগুলোকে কোনও মতবাদ বা মহান নেতৃত্বের নেতৃত্ব দিয়ে দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে অপর একটি ধাপবন্দি ক্ষমতার ক্ষেত্রনির্মাণ তিনি নাকচ করতে চেয়েছেন। তার পরিবর্তে তিনি জোর দিয়েছেন প্রতিরোধবিন্দু বা প্রতিরোধমুহূর্তগুলোর বহুত্ব ও বিবিধতার উপর, সাধারণ কোনও নিয়মে যে তাদের বাঁধা যায় না তার উপর এবং ক্ষমতাসম্পর্কের কৌশলক্ষেত্রের মধ্যে তাদের লঘুকরণ-অযোগ্যতার উপর। এহেন প্রতিরোধবিন্দুগুলোর কৌশলী সংহিতাকরণের মধ্য দিয়েই বিপ্লব সম্ভব হয় বলে ফুকো মনে করেন, কিন্তু সেই সংহিতাকরণের কৌশল আবশ্যিকভাবেই শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা বা জৈবক্ষমতার প্রকৌশলের অনুকরণ বা অনুগমন হলে হবে না।

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক খেয়ালে আনা যেতে পারে। তা হল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও জৈবক্ষমতার মধ্যে যোগাযোগ সম্বন্ধে ফুকোর কিছু মন্তব্য। তিনি এই মন্তব্যগুলো করেছিলেন ১৯৭৬ সালে কলেজ-দি-ফ্রাঁস-য় জৈবক্ষমতা বিষয়ে বক্তৃতার মধ্যে।[১৫] সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন উনিশ শতকের শেষভাগে তার সামরিক যুদ্ধকৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে আঠারো শতক থেকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত জৈবক্ষমতার কলকৌশলগুলোকে কোনওরকম পূনর্মূল্যায়ন না করেই স্বয়ংসিদ্ধ রূপে গ্রহণ করেছিল বলে তিনি বলেছিলেন। একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে সম্মুখসমরে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করা, দৈহিক লড়াই করা, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিপক্ষকে হত্যার চেষ্টা, ইত্যাদির যৌক্তিকতা ও কৌশল নির্মাণের ক্ষেত্রে যুদ্ধের অধিকার, খুনের অধিকার, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার অধিকার সম্বন্ধে যে ধারণা ও কৌশলগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছিল তা জৈবক্ষমতাবলয়ের বিদ্বেষী জাতিবাদের ধারণা ও কৌশলগুলোরই পুনরাবৃত্তি। ব্লাঁকিবাদ, কম্যুন ও নৈরাষ্ট্রবাদকে এই বিচারে তিনি জাতিবাদী চরিত্রের বলে চিহ্নিত করেছেন। সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক অবস্থার

যে রূপান্তরসাধনের (মালিকানা ব্যবস্থার রূপান্তর, উৎপাদন ও বন্টন সম্পর্কের রূপান্তর) কথা বলা হয় তার জন্য বিদ্বেষী জাতিবাদের প্রয়োজন হয় না অথচ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সামরিক কৌশল নির্ধারণে বিদ্বেষী জাতিবাদ নির্মিত কৌশল আঁকড়ে ধরে জাতিবাদী এক ক্ষমতাক্ষেত্রে প্রবেশ করা হয়। উনিশ শতকের শেষভাগের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে ফুকোর এই সমালোচনা বিশ শতকে সর্বাত্মকতাবাদী রাষ্ট্রের চেহারা নেওয়া সোভিয়েত রাশিয়া ও তার অনুগামীদের পথটিকে বিচার করার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এর মধ্য দিয়ে উঠে আসে। যুদ্ধের অধিকার, খুনের অধিকার, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার অধিকারের যৌক্তিকতা ও কৌশল নির্ধারণ করাকে যেভাবে ফুকো জৈবক্ষমতাবলয়ের বিদ্বেষী জাতিবাদের কৌশলের চিন্তাহীন পুনরাবৃত্তি বলেছেন, তার মধ্য দিয়ে কি ফুকো আদপে হিংসাকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন না? প্রতিরোধের কৌশল হিসেবে হিংসাকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে জৈবক্ষমতার যুগে কেবলমাত্র প্রতিরোধের নামে অপর একটি ক্ষমতাক্ষেত্রই নির্মাণ করা হয়, এমন একটি ধারণাতেই কি আমরা পৌঁছে যাচ্ছি না? এইদিক থেকে হানা আরন্ট-য়ের রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে হিংসা সম্পর্কে বিশ্লেষণের[১৬] খুব কাছাকাছি মনে হয় ফুকো অবস্থান করছেন। সেই অবস্থানটি হল: রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে হিংসাবলম্বনের পথ নিজ চরিত্রগুণেই এমন কিছু ক্ষমতাসম্পর্ক আরোপ করার মধ্য দিয়ে কাজ করে, যে ক্ষমতাসম্পর্কগুলো প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার প্রকৌশলসমূহের প্রসারণের নতুন দরজা খুলে দেয়।

এই সমস্ত বিবেচনা ফুকোর ভাবনাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে যেখান থেকে তিনি ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে কোনও মতবাদ বা কোনও অলঙ্ঘনীয় নীতি চালিত দৃঢ়বদ্ধ আন্দোলনের রূপে না দেখে একটি 'জীবনযপনের শিল্প' হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। দেল্যুজ ও গুয়াতারির অ্যান্টি-ঈদিপাস বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে ১৯৭৬ সালে তাই তিনি লেখেন:

> ...ইতিমধ্যে বর্তমান বা ক্রম আসন্ন সমস্ত ধরনের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধাচরণ করে জীবনযাপনের শিল্পকে আমি কয়েকটি আবশ্যকীয় নীতির সঙ্গে যুক্ত বলে সারসংকলন করব:

- একমেবাদ্বিতীয়ম হওয়ার দাবি করে এমন সব ধরনের সর্বাত্মকতার ভ্রম-বাতুলতা থেকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকে মুক্ত কর।
- নিয়ত বিস্তারলাভ, অপরাপরকে পাশাপাশি স্থাপন করা ও পৃথককরণের মধ্য দিয়ে ক্রিয়া, ভাবনা ও কামনাকে বিকশিত কর। অধীনস্থের শৃঙ্খলে বিন্যাস বা পিরামিডের চেহারার ধাপবন্দি কাঠামো পরিহার কর।
- আইন, সীমা, নির্বীজকরণ, অভাব, ছায়া-গহ্বর ইত্যাদির মতো পুরানো নঙর্থক প্রতীতি, যেগুলোকে এতাবধিকাল ক্ষমতার একটি রূপ ও বাস্তবকে পাঠ করার উপায় হিসেবে পবিত্র জ্ঞান করা হয়েছে, তাদের প্রতি বশ্যতা কাটিয়ে ওঠ। সদর্থক ও বহুত্বব্যঞ্জক প্রতীতি পছন্দ কর, দৃঢ়নির্মিত কাঠামোর বদলে গতিশীল ব্যবস্থাপনা পছন্দ কর। বিশ্বাস কর যে যা সৃজনশীল তা যাযাবরী চরিত্রের, তা কখনই স্থাণু হতে পারেনা।
- এমনটা ভেব না যে মিলিটান্ট হতে গেলে দুঃখী বিরসবদন হতে হয়। এমনকি অতি ঘৃণ্য বীভৎসার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়েও নয়। বাস্তবের সঙ্গে কামনার সংযোগরেখাই বিপ্লবী বলের অধিকারী (বিবিধ রূপে প্রতিমূর্তিকরণের পশ্চাদগমন বিপ্লবী বলের অধিকারী নয়)।
- একমেবাদ্বিতীয়ম সত্যের উপর রাজনৈতিক চর্চার ভিত স্থাপন করার বাসনায় চিন্তাশক্তি অপব্যয় কোরো না। অপর চিন্তাধারাকে ফাঁপা দূরকল্পনা হিসেবে হেয় করার জন্য রাজনৈতিক সক্রিয়তার অপব্যয় কোরো না। চিন্তাশক্তিকে আরও তীব্র করার জন্য রাজনৈতিক চর্চাকে ব্যবহার কর। রাজনৈতিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হস্তক্ষেপের কাজে ক্ষেত্র ও রূপের বহুত্ববিধান করার জন্য বিশ্লেষণকে ব্যবহার কর।
- দর্শনে সংজ্ঞাত ব্যক্তিসত্তার 'অধিকারবলী' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার দাবি রাজনীতির কাছে কোরো না। ব্যক্তিসত্তা ক্ষমতার হাতে নির্মিত। যা প্রয়োজন তা হল বহুত্বকরণ, বিবিধ সমবায় ও স্থানান্তরকরণের মধ্য দিয়ে 'ব্যক্তিসত্তাকে নাকচ করা'। ধাপবন্দি কাঠামোর বিভিন্ন ধাপে বিন্যস্ত ব্যক্তিসত্তাদের জৈব ঐক্যবন্ধন হিসেবে যেন কোনও গোষ্ঠী কাজ না করে, বরং ব্যক্তিসত্তা নাকচের প্রক্রিয়াকে যেন অনবরত বহমান রাখা যায়।
- ক্ষমতার আসক্তিতে ডুবে যেও না।

ফুকোর হাজির করা এই সাতটি 'আবশ্যকীয় নীতি' যেমন প্রতিরোধকে নঙর্থক থেকে সদর্থক প্রতীতির দিকে ফেরাতে চাইছে, একমুখী দিশার নামে একমেবাদ্বিতীয়মতার দাবিদার মতবাদের পশ্চাদগমনের পরিবর্তে বহুত্ব, বহুমুখীনতা ও অপরের সংসর্গসুখে বিস্তৃত করতে চাইছে, তেমনই

ব্যক্তিমানুষের সামনে বিবিধ সমবায় ও স্থানান্তরকরণের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তা নাকচের মধ্য দিয়ে নিরন্তর উৎক্রমণের এক পথ হাজির করছে। তা যত না কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনের কৌশল, তার থেকে বেশি জীবনযাপনের কৌশল। ক্ষমতাধিপত্য বিরোধী জীবনযাপনের শিল্প নিয়ে ফুকোর এই ভাবনা প্রলম্বিত হয়েছিল 'পারহেসিয়া' নিয়ে তাঁর অনুসন্ধানী বিশ্লেষণে, যা ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ সালে তাঁর মৃত্যু অবধি কলেজ-দি-ফ্রাঁস-য় তাঁর পরিচালিত পাঠক্রম ও তাঁর বক্তৃতাবলীর বিষয় হয়ে উঠেছিল।[১৭] এবার তাই ফুকোর জীবনের অন্তিমপর্বের এই বিশ্লেষণগুলোর দিকে নজর ফেরানো যাক।

'পারহেসিয়া' সংক্রান্ত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফুকো চোখ ফিরিয়েছিলেন খ্রিস্টপূর্ব গ্রিক ও রোম সভ্যতার প্রাচীনযুগে ও খ্রিস্টধর্মের প্রত্যুষকালে 'সিনিক' (cynic) দার্শনিকদের চিন্তাধারা ও জীবনপ্রণালীর দিকে। 'সিনিক' দার্শনিকরা সাধারণভাবে পরিচিত অর্থ ও বিলাসব্যসনের প্রতি তাঁদের ঘৃণার জন্য, সমস্তকিছুর তীব্র সমালোচনা হাজির করার জন্য, যে কারণে তাঁদের অসূয়ক বা ছিদ্রান্বেষী হিসেবেও গণ্য করা হয়ে থাকে। ফুকোর উদ্ধার করা ইতিহাস অনুযায়ী 'সিনিক'-দের আদি পরম্পরাকে আমরা এভাবে দেখতে পারি: খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রিক সাহিত্যে, বিশেষ করে ইউরিপিদিসের নাটকগুলোর মধ্যে প্রথম সদর্থক অর্থে 'সিনিক' দর্শনের আবির্ভাব হয়, তার পরবর্তীকালে গ্রিক শহরের নাগরিকসভায় ও রাজার প্রতিস্পর্ধী রাজনৈতিক পারহেসিয়ার মধ্য দিয়ে তা বিস্তৃত হয়, তারপরে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ায় নৈতিক বা সক্রেতিয় পারহেসিয়া হিসেবে দেখা দেয়, খ্রিস্টান ধর্মের প্রত্যুষকালে ঈশ্বরের সঙ্গে এক মুখোমুখি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে তোলার উপায় হিসেবে খ্রিস্টিয় পারহেসিয়ায় রূপান্তরিত হয়। 'পারহেসিয়া' একটি গ্রিক শব্দ। ফুকো তার মানে করেছেন 'সাহসী (বা ভয়মুক্ত) সত্যভাষণ' হিসেবে। এই সাহসী বা ভয়মুক্ত সত্যভাষণ কেবল অপ্রিয় বা অসুবিধাজনক কোনও সত্যোপলব্ধিকে ভাষা দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং জনসমক্ষে তা বলা, সেই বলার দায় স্বীকার করা, নিজ জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে তা প্রয়োগ করা, তার জন্য মূল্য চুকানো ও তাকে নিজ অস্তিত্বের ভরকেন্দ্র করে তোলা। এই সমগ্রটা নিয়েই পারহেসিস, যেখানেই তা নিছক ভাষণ (rhetoric)-য়ের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাই পারহেসিস একজন

সিনিক-য়ের গোটা জীবনচর্যাকে কয়েকটি আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করত। ফুকো এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করেছেন:

১। যে কোনও স্থানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক বদ্ধতাকে এড়িয়ে নিয়ত গতিময়তা ও পরিবর্তনশীলতার গুণে জীবন একটি অবিরাম উৎক্রান্তি যাত্রা।

২। সিনিক-য়ের দেহ আবরণহীন, আভরণহীন, সম্পদহীন, উলঙ্গপ্রায়রূপে অনাবৃত। তাঁরা 'অনাবৃত জীবন'-য়ের বাহক। সেটাই তাঁদের স্বাধীনতার ভিত্তি। শৃঙ্খলা দেহকে ক্রমবর্ধমান উপযোগের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে একটি শৃঙ্খলিত উৎপাদনশীল দেহ গড়ে তোলে, ঠিক তার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে সিনিক-য়ের অশৃঙ্খলায়িত দেহ।

৩। সত্যভাষণের জন্য সিনিক তার সাহসিকতা বা ভয়মুক্তিকে চরম সীমা অবধি ঠেলে নিয়ে যায় যেখানে রূঢ়তা ও অবিমৃশ্যকারিতার একচুল দূরত্বে হয়ত সে দাঁড়িয়ে থাকে। শৃঙ্খলা যেরকম বাধ্য, নিরাপত্তাভাবনা-সর্বস্ব সমাজজীব উৎপাদন করতে চায়, ঠিক তার বিপরীত মেরুতে পৌঁছানোই সিনিকের জীবন-অভিযানের লক্ষ্য।

৪। সিনিকদের জীবন একটি নিরন্তর সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম নিজের বিরুদ্ধে, আবার নিজের জন্যও। সেই সংগ্রাম অপরের বিরুদ্ধে, আবার অপরের জন্যও। সার্বভৌম জীবনের দার্শনিক ধারণাটি ব্যক্তির নিজের উপর এমন এক প্রভুত্বের কথা বলে যা নিজেকে উপভোগ করা ও অন্যকে সহায়তা করার উপযোগী হয়ে ওঠে। সার্বভৌম জীবনের এই দার্শনিক ধারণাটির বিপরীতে সিনিকের জীবনভাবনা বিস্তৃত হয়।

৫। সিনিকদের মূল অভিপ্রায় হল নিয়ম, অভ্যাস, রীতি ও আইন ভেঙে ফেলা। কিছু দার্শনিক নিয়ম বা সূত্রাবলীর অনুসরণের মধ্য দিয়ে প্রকৃত জীবন বা সত্য জীবন আয়ত্ত করা সম্ভব বলে সে মনে করে না। প্রতিনিয়ত অপর কিছুতে উৎক্রমণের মধ্য দিয়েই সিনিকরা প্রকৃত জীবন বা সত্য জীবনকে অস্তিত্বাপনে মূর্ত করে তুলতে চায়।

পারহেসিয়ার এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো ফুকো চিহ্নিত করেছেন তা ক্ষমতাধিপত্যবিরোধী জীবনশিল্পের একটা উদাহরণ তুলে ধরে। 'কারেজ অফ ট্রুথ' বক্তৃতামালার শুরুতে ফুকো বলেছিলেন:

> বিষয়ী ও সত্যের মধ্যে সম্পর্কাদি নিয়ে আমার করা বিশ্লেষণে সর্বদা হাজির থাকা মূল ভাবনাটি হল: ক্ষমতাসম্পর্কসমূহ নিয়ে ভাবনা এবং বিষয়ী ও সত্যের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ায় ক্ষমতাসম্পর্কাদির ভূমিকা নিয়ে ভাবনা।

পারহেসিয়া নিয়ে আমার পাঠকাজ আমাকে সেই মূল ভাবনার আরও কিছুটা ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে।[১৮]

পারহেসিয়া থেকে ফুকো কি তাহলে শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা ও জৈবক্ষমতার বুনটের মধ্যে প্রতিরোধবিন্দুগুলোর সংহিতাকরণের একটি উপায় আহরণ করতে চেয়েছেন? বিষয়টি অবশ্যই এমন সোজাসাপটা নয় যে পারহেসিয়া নিছক অনুকরণ করার কথা তিনি ভেবেছেন, কারণ অন্য সময়ে, অন্য সমাজে, অন্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিকশিত হওয়া কোনও রূপ যে বর্তমান সময়, সমাজ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে না তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হুবার্ট দ্রেইফুস ও পল রেনবোর-র এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন:

> দ্রেইফুস, রেনবো: প্রাচীন গ্রিকরা একটি আকর্ষণীয় ও বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প হাজির করে বলে কি আপনি মনে করেন?
>
> ফুকো: না! প্রাচীন গ্রিসে আমি কেনও বিকল্প খুঁজছি না। আজকের কোনও সমস্যার সমাধান আপনি অন্য সময়ে অন্য মানুষদের দ্বারা উত্থাপিত সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়ে কখনওই পাবেন না। খেয়াল করবেন যে আমি যা করতে চাই তা কখনওই সমাধানসমূহের ইতিহাস রচনা নয়, আর সেই কারণেই 'বিকল্প' শব্দটিকে গ্রহণ করতে পারি না। আমি যা করার চেষ্টা করি তা হল সমস্যা-সন্দেহ-প্রশ্নাবলীর কুলজিশাস্ত্র (genealogy) রচনা করা। আমার বলার বিষয় এ নয় যে সবকিছুই খারাপ, বরং আমার বলার বিষয় হল যে সবকিছুই বিপজ্জনক। খারাপ আর বিপজ্জনক ঠিক এক জিনিস নয়। যখন সবকিছুই বিপজ্জনক, তখন আমাদের আশু অর্থেই কিছু করার থাকে। সুতরাং আমার অবস্থান আমাকে সবকিছুর প্রতি হতশ্রদ্ধা-অনীহা-উদাসীনতার দিকে নিয়ে যায় না, বরং অনাশাচারী অতি-সক্রিয়তার দিকে নিয়ে যায়।...[১৯]

এর মধ্য দিয়ে যেমন এটা স্পষ্ট হয় যে পারহেসিস কোনও অনুকরণের জন্য তুলে ধরা ছক নয়, তেমনই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও উঠে আসে, যা হল, সমালোচনা-বিরোধিতার মধ্য দিয়ে খারাপ অবস্থা থেকে উন্নততর বা আরও ভালো অবস্থায় যাওয়ার কোনও দীর্ঘসূত্রী প্রক্রিয়া এ নয়, এ হল বিপন্নের আশু অতি-সক্রিয়তা। ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করার মধ্য দিয়ে উন্নত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনও মতবাদিক প্রয়াসের আলোচনা এখানে

হচ্ছে না। ক্ষমতাসম্পর্ক বিপজ্জনক, ক্ষমতাসম্পর্ক আমাদের আশু অস্তিত্বকে আক্রমণ করছে, বিপন্ন করছে। তাই সেই আক্রান্ত বিপন্নতার জায়গা থেকে, আশু অতি-সক্রিয়তার পথেই প্রতিরোধ। পারহেসিয়া যেমন একইসঙ্গে ভয়মুক্তভাবে ঝুঁকি নেওয়ার মধ্য দিয়ে অস্তিত্বকে বিপন্ন করে, আবার নতুন অস্তিত্ব নির্মাণেরও চেষ্টা করে, স্থানু-স্থবিরকে ভেঙে ছিটকে বেরতে চায়, তা বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে থাকার বোধ থেকেই উৎসারিত হতে পারে। গ্রিক সিনিকদের পৃথিবীর সঙ্গে শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা ও জৈবক্ষমতার বুনটের মধ্যে অস্তিত্বধারী মানুষের পৃথিবী আলাদা। বিপদবোধ আলাদা। ছিটকে বের হওয়ার অতি-সক্রিয়তার রূপও তাই আলাদা। উনিশ শতকের শেষভাগে নোবেলের ডিনামাইট আবিষ্কারের সময় থেকে আজকের পরমাণু অস্ত্র, জৈব অস্ত্রের প্রতুলতা অবধি এসে জীবন-ধ্বংসকারী শক্তি যে রূপ নিয়েছে, শিল্পদূষণের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট ও বাস্তুতন্ত্রের ক্ষয় জীবনের প্রাকৃতিক প্রাগশর্তগুলোকেই যেভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে, আক্রান্ত-বিপন্নতার মাত্রা আজ পূর্ববর্তী যে কোনও সময়ের থেকে অনেক গভীর, অনেক ব্যাপক হয়ে উঠেছে। জীবনঅস্তিত্ব বাজি রেখে পারহেসিয় অতি-সক্রিয়তা শৃঙ্খলাদয়ক ক্ষমতা ও জৈবক্ষমতার বুনটে কীভাবে ফালা দিতে পারে তা এই গভীর-ব্যাপক বিপদের মুখে অভ্যাস-রীতি-নিয়ম-আইন-ভাঙা জীবনশৈলীর পরিসরেই বুঝি নতুনভাবে উদ্ভাবিত হতে হবে।

ফুকোর সদ্য-উদ্ধৃত উক্তিটির শেষ বাক্যের একটি শব্দকে খেয়াল করা যাক। অতি-সক্রিয়তার বিশেষণ হিসেবে তিনি 'অনাশাচারী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। (মূল ইংরেজিতে শব্দটি ছিল: 'pessimistic', যার বঙ্গানুবাদ সাধারণত 'নৈরাশ্যবাদী' বা 'নিরাশাবাদী' হিসেবে করা হয়। কিন্তু 'নৈরাশ্যবাদী' বা 'নিরাশাবাদী' বললে আশাকে নাকচ করে নিরাশাকে সর্বময় করার যে বোধ তৈরি হয়, ফুকোর কথায় সেই অর্থ নেই। তিনি কোনও নির্মিত আশা বা আশাবাদকে তাঁর সক্রিয়তার ভিত্তি করতে চান না— এই অর্থটি ধরতেই আমি বঙ্গানুবাদ হিসেবে অপ্রচলিত শব্দ 'অনাশাচারী' ব্যবহার করেছি।) অর্থাৎ, ক্ষমতা-প্রতিরোধকারী সক্রিয়তার ভিত্তি হিসেবে যে কোনও ধরনের আশাবাদের বিপরীতে অনাশাচারকেই ফুকো গ্রহণ করছেন। এর তাৎপর্য কী তা একটু খুলেমেলে দেখা যাক।

আশা-নির্মাণ বা আশাবাদকে ক্ষমতা-প্রতিরোধকারী সক্রিয়তার ভিত্তি সাধারণত দুইভাবে করা যায়—১। মৌলিক কোনও গুণ বা স্বভাবের প্রকাশ

হিসেবে প্রতিরোধকে 'স্বাভাবিকতা' হিসেবে দেখা, আর, ২। শেষ বিচারে প্রতিরোধের জয় নিশ্চিত বলে প্রতিপন্ন করা।

প্রথমটিতে, অর্থাৎ প্রতিরোধকে স্বাভাবিক প্রতিপন্ন করার কাজ নানা উপায়ে হতে পারে। তার একটা প্রধান উপায় হল মানুষ সম্পর্কে একটা আদর্শ ধারণা নির্মাণ করা বা কোনও এক আদর্শ গুণের অধিকারী হল মানুষ এভাবে দেখা। যেমন: মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা (ও অধিকার) হল স্বাধীনতা, মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা (ও অধিকার) হল সাম্য, অবদমন ও হিংসা মানুষের প্রকৃতিজ স্বভাবের বিরোধী, সহযোগিতা মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র,...— এমন নানা নির্ধারণের মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন করা হয় যে ক্ষমতাসম্পর্ক হল মানুষের স্বাভাবিকতা-বিরোধী একটি আরোপ আর প্রতিরোধ হল স্বাভাবিকতার অভিব্যক্তি। এর মধ্য দিয়ে এই আশা সঞ্চারিত হয় যে ভয়-ভীতি বা আরোপিত বাধ্যতা অতিক্রম করতে পারলে ক্ষমতা-প্রতিরোধই মানুষের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া। ফুকো এই আশাবাদ নাকচ করেছেন। ক্ষমতার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে আদর্শ মানুষের ধারণা, কোনটা স্বাভাবিক আর কোনটা স্বাভাবিক নয় সেই ধারণা, কোনটি প্রকৃতিসিদ্ধ আর কোনটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ সেই ধারণা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট সমাজের ক্ষমতাপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়। ক্ষমতা মানুষের মধ্যে কেবল অবদমিত-আক্রান্ত বোধই গড়ে তোলে না, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির বোধও গড়ে তোলে। সুতরাং ইতিহাস-নিরপেক্ষ সমাজ-নিরপেক্ষ কোনও আদর্শ মানুষের রূপ বা মানুষের আদর্শ গুণের রূপ যেমন হয় না, তেমনই মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেবল ক্ষমতার বিরোধে দাঁড়ায় না, মানুষ ক্ষমতার আসক্তিতে মজেও যায়।

দ্বিতীয় উপায়টিতে, অর্থাৎ, প্রতিরোধের চূড়ান্ত জয় নিশ্চিত তা প্রতিপন্ন করতে সাধারণত কিছু সামাজিক-ঐতিহাসিক সাধারণ নিয়মকে হাজির করা হয়। সে নিয়ম এমন হতে পারে: 'কিছু মানুষকে কিছু দিনের জন্য ভুল বোঝানো যেতে পারে, কিন্তু সব মানুষকে সব দিনের জন্য ভুল বুঝিয়ে রাখা যায় না'। আবার তা বিস্তারিত মতবাদ নির্মিত এমন নিয়ম হতে পারে: 'ঐতিহাসিক সমাজবিকাশের নিয়মে পুঁজিবাদের অবসান ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য'। প্রথম উদাহরণটিতে, অর্থাৎ শেষ অবধি সত্যের জয়ের নিশ্চয়তা কল্পনায় নিজ আকাঙ্খাকে নিয়মের রূপে হাজির করা বা সত্য-মিথ্যা নিরূপণে জনসমষ্টির এক শেষ বিচারে নিখুঁত সক্ষমতাকে কল্পনা করার

দৌর্বল্য ছাড়াও আর একটি সমস্যা আছে। সেই সমস্যা হল সত্যের একটি স্বয়ম্ভূ অস্তিত্ব কল্পনা করা। সত্যের এই স্বয়ম্ভূ অস্তিত্বের কল্পনাকে ফুকো নাকচ করেছেন যখন তাঁর বিশ্লেষণ স্পষ্ট করে তুলেছে কীভাবে সমাজের ক্ষমতাপ্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানোৎপাদন প্রক্রিয়া প্রতিনিয়ত 'সত্য' উৎপাদন করে চলে। আর দ্বিতীয় উদাহরণটিতে সামাজিক-ঐতিহাসিক নিয়মের যে ইতিহাস-বিমূর্ত সমাজরূপ-বিমূর্ত সাধারণ রূপ হাজির হয়, তা এই ঐতিহাসিকতাকে ঢেকে রাখে যে বিশেষ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত ও সমাজরূপের সন্ধিক্ষণে (পুঁজিবাদের উদ্ভব ও দ্রুত বিস্তারের সন্ধিক্ষণে) সমাজবিকাশের নিয়ম এইভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। জৈবক্ষমতার বিস্তার আজ যখন প্রাকৃতিক-বাস্তুতান্ত্রিক সংকটের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন-অস্তিত্ব সমাজ-অস্তিত্বকেই আশু ধ্বংসের সম্ভাবনার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তখন সমাজবিবর্তনের ওইরকম আশাবাদী ব্যাখ্যান আজ কি আর স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে? বা অন্যদিক থেকে দেখলে, অ-ইউরোপিয়, অ-পুঁজিবাদী তথাকথিত আদিম আদিবাসী সমাজের কোনও মানুষ কি এহেন সমাজবিবর্তনের নিয়ম, যার যাত্রার মহান রথচক্রের তলে তার নিজের সমাজরূপ চূর্ণ পিষ্ট হওয়া আবশ্যিক, তাকে প্রকৃতি-নির্দিষ্ট বলে বিমূর্তায়ন করতে পারে? শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা ও জৈবক্ষমতা এহেন বিবর্তনের নিয়মকেই তো তার প্রকৌশল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। তাই এহেন নিয়ম দিয়ে আশাবাদের ভিত্তি তৈরি করে তার উপর প্রতিরোধকে স্থাপন করলে সেই প্রতিরোধের বিন্দু ক্ষমতাকে আরও বিস্তৃত করার নতুন পথই তৈরি করে দেয় বোধহয়।

সুতরাং ফুকো আশাবাদের কোনওরকম ভিত্তির উপর প্রতিরোধী সক্রিয়তাকে স্থাপন করতে চাননি। তাঁর প্রতিরোধ-পরিকল্পনায় 'আমরা করব জয় নিশ্চয়'— এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই, সত্য ও প্রাকৃতিক নিয়মের কবজকুণ্ডলী আমাদেরই বাহুতে বাঁধা— এমন কোনও আত্মশক্তির বোধ নেই। ক্ষমতা যে প্রতিরোধের বিন্দুগুলোকে তার সহায় বা বাঁট হিসেবে ব্যবহার করে সেই সচেতনতা আছে, আবার প্রতিরোধের বিন্দুকে ক্ষমতার লঘুকরণ-অসম্ভব বিপরীত করে তোলার নিত্য তাগিদ আছে। পার্থক্য, বহুত্ব, অপরতার সঙ্গে নিত্য বিনিময় ও সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকীকরণ-বিরোধী, নিয়মানুগকরণ-বিরোধী এক জীবনশৈলী নবায়নের কাজ নিরন্তর জারি রাখার অতি-সক্রিয়তা আছে। ফুকোর মধ্যে থেকে কেউ

যদি প্রতিরোধের কোনও সাধারণ তত্ত্ব বা নিয়ম নিঙড়ে বের করতে চায়, সে নিশ্চিতভাবেই হতাশ হবে। আবার আন্যদিকে, কেউ যদি ক্ষমতাসম্পর্কের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জীবনশৈলী সৃজনের পরিসরটিকে বহুত্বে, বিবিধতায়, উপলব্ধির সূক্ষ্মতায় ও তীব্রতায় আবিষ্কার করতে চায়, ফুকোর মধ্য দিয়ে সে তার প্রবেশপথ খুঁজে পাবে।

মিশেল ফুকো তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিচর্চাকে প্রতিরোধচর্চার একটি অঙ্গ হিসেবেই নিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনও ছিল প্রতিরোধচর্চার নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা-ক্ষেত্র। বর্তমান উপস্থাপনার পরিসরে তার বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁর সক্রিয়তার সঙ্গে তাঁর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল বলেই সেই আলোচনা পুরো এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। তাই তাঁর সামাজিক জীবনের কয়েকটি প্রতিরোধক্রিয়ার কথা আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ প্রসঙ্গে আলোচনা আপাতত শেষ করব:[২০]

তুনিসিয়া

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৮ সালের অক্টোবর অবধি উত্তর আফ্রিকার তুনিসিয়ায় ফুকো শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত হয়ে বাস করেছিলেন। সেই সময় হাবিব বুরগুইবা ছিলেন তুনিসিয়ার শাসক। অত্যাচারী বুরগুইবা-সরকারের বিরুদ্ধে তুনিসিয়ার ছাত্রদের আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। মার্কসবাদী রাজনীতিতে অনুপ্রাণিত ছাত্ররা রাষ্ট্রীয় সেনা-পুলিশের হাতে শারীরিক নিগ্রহ, আট-দশ এমনকি চোদ্দ বছর অবধি কারাবাস ও মৃত্যুর সম্ভাবনাকেও তোয়াক্কা না করে বড় বড় গণবিক্ষোভে অংশ নিচ্ছিল। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শিক্ষক ফুকোর মনে বড় ছাপ ফেলেছিল। ফুকো বলেছেন যে তুনিসিয়ায় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে রাজনীতি করা মানে কেবল রাজনৈতিক তত্ত্ব আলোচনার জট পাকানো ও জট ছাড়ানো নয় (যেমনটা ফ্রান্সের মার্কসবাদী মহল সম্পর্কে তাঁর ধারণা হয়েছিল), বরং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা মানে এমন একটা অস্তিত্বযাপন যা নির্দিষ্ট কিছু সমস্যাকে সমাধানের প্রয়াসে ব্যক্তিজীবন-ব্যক্তিনিরাপত্তা-কে বাজি রেখে সোৎসাহে বিপদের মুখোমুখি হয়। এই রাজনৈতিক অস্তিত্বযাপন তিনি কেবল দর্শক বা বিশ্লেষক হিসেবে দেখেননি, তাতে তিনি নিজেও অংশ নিয়েছিলেন। গণবিক্ষোভে অংশ নেওয়া, গ্রেফতার হওয়া ছাত্রদের জন্য আইনি সাহায্য সংগঠিত করা,

কারাবন্দি ছাত্রদের মুক্তির জন্য জাতীয়-আন্তর্জাতিক চাপ তৈরির চেষ্টা করা— এসব তো ছিলই, এছাড়াও তিনি তাঁর নিজের বাসভবনের বাগানে একটি রোনিও কোম্পানির মুদ্রণযন্ত্র লুকিয়ে স্থাপন করেছিলেন, যাতে ছাত্ররা নিষিদ্ধ সরকারবিরোধী রাজনৈতিক প্রচারপত্র ছাপা ও বিলি করার কাজে সরকারি নজরদারি এড়িয়ে তাঁর বাড়িকে ব্যবহার করতে পারে। শেষাবধি সরকার-বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্তির জন্য সরকারের রোষ এড়াতে তিনি তুনিসিয়া ছাড়তে বাধ্য হন।

'জি আই পি' ও অন্যান্য

১৯৬৮ সালের শেষদিকে ফুকো ফ্রান্সে ফেরেন। ফ্রান্সের মে-১৯৬৮-র আন্দোলন তখন সমাজের রাজনৈতিক চালচিত্র বদলে দিয়েছে। পাগল, মানসিক বিকারগ্রস্ত, অপরাধী ইত্যাদি তকমা দিয়ে সমাজে অপরদের কন্ঠরোধ করা ও দমনমূলক নজরদারি ব্যবস্থায় আটকে রাখার বিরুদ্ধে ফুকো ও তাঁর সঙ্গীরা আগে থেকেই যা বলছিলেন, তা এই বদলে যাওয়া চালচিত্রে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই পরিবেশের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য ফুকো আরো বেশ কিছুজনের সঙ্গে মিলে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'জি আই পি' (পুরো নামের অর্থ: জেলখানা সম্বন্ধে তথ্য উপস্থাপক গোষ্ঠী) নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র-আরোপিত 'সুরক্ষাবলয়' ভেদ করে জেলখানার মানুষদের নিজেদের কথা ব্যক্ত করার সুযোগ ও পরিসর তৈরি করে দেওয়া। এর পরের দুই বছর এই সংগঠনের হয়ে জেলখানার ভিতরে যোগাযোগ করা, সাক্ষাৎকার নেওয়া, জেলখানার রীতি-বিধি-আইনকানুনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা তৈরি করা, গণপ্রচারপত্র তৈরি করা ও তা ছাপিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিলি করা, জনমত গড়ে তোলা, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের জন্য প্রেস-রিলিজ প্রস্তুত করা ও তা প্রকাশের বন্দোবস্ত করা ফুকোর দৈনিক কাজের অংশ হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী, অধিকার আন্দোলনের কর্মী ও সাধারণ মানুষ— সব মহলের অনেক মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ফুকো ছিলেন এই আন্দোলনের সবচেয়ে তৎপর কর্মী ও সবচেয়ে পরিচিত হয়ে ওঠা মুখ। ফুকোর বাসাঘরটি হয়ে উঠেছিল এই আন্দোলনের অঘোষিত প্রধান দপ্তর। কিন্তু ফুকো নিজেকে 'নেতা' হিসেবে হাজির করেননি। ফুকো কেন, এই আন্দোলনের কোনও নেতাই ছিল না। ফুকো ও তাঁর

সঙ্গীরা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন যাতে কাজের সুবিধার দোহাই দিয়ে একটি ধাপবন্দি সাংগঠনিক কাঠামো না গড়ে ওঠে এবং কিছুজন সাংগঠনিক আমলায় না পরিণত হন। পূর্বজীবনে ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে তাঁর হওয়া সাংগঠনিক আমলাতান্ত্রিকতার করুণ অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে কীভাবে আন্দোলন-সংগঠনের কাজ চালানো যায়, সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটা উর্বর ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল এই দুই বছর। জি আই পি-র মূল কাজ ছাড়াও এই সময়পর্যায়ে ফুকো একাধিক নাগরিক অনুসন্ধান কমিটি গড়ে তুলেছিলেন পুলিশি অত্যাচারের তথ্যপ্রতিষ্ঠা করার জন্য, যেমন: সাাাংবদিক অ্যালাঁ জবেরকে পুলিশের মারধোর করা নিয়ে, প্রান্তনিবাসী আরব তরুণ জেলালি বেন আলির পুলিশের হাতে আরব বসতি এলাকার রাস্তায় খুন হওয়া নিয়ে, ইত্যাদি। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে জি আই পি নিজেকে ভেঙে দেয় এই যুক্তিতে যে জেলখানার ভিতরের চাপা পড়া কন্ঠস্বরকে বাইরে প্রকাশ করার তার উদ্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফুকো ও তাঁর সহযোগীরা এরপরও রাষ্ট্রীয় দণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ তোলার কাজ চালিয়ে যান। তেমন দুটি উদাহরণ হল: ১। স্পেনের একনায়কতন্ত্রী ফ্যাসিবাদী শাসক ফ্রাঙ্কো ১৯৭৫-য়ের সেপ্টেম্বরে বাস্ক প্রদেশের ফ্যাসিবাদবিরোধী স্বশাসনকামী কিছু রাজনৈতিক কর্মীকে জেলে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার হুকুম দেয়, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জনসমক্ষে বিবৃতি পাঠ করার জন্য ফুকো মাদ্রিদে যান, ২। ১৯৭৭ সালের নভেম্বরে পশ্চিম জার্মানীতে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে চিহ্নিত হয়ে ফ্রান্সে রাজনৈতিক আশ্রয় নেওয়া আইনবিদ ক্লাউস ক্রুসাঁকে পশ্চিম জার্মানির হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ফরাসি সরকার, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বিক্ষোভপ্রদর্শনে অংশ নেন ফুকো, সেখানে ফরাসি পুলিশের লাঠির ঘা তাঁর বুকের হাড়ে চিড় ধরিয়ে দিয়েছিল। এই গোটা অভিজ্ঞতাপর্ব শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা ও জৈবক্ষমতার বিশ্লেষণ ও রাজকতা (governmentality)-র ধারণায় পৌঁছানোর তত্ত্বযাত্রার প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছে।

ইরানের পালাবদল

১৯৭৮ সালে ফুকো দুইবার ইরানে যান সেখানকার ঘনায়মান আন্দোলন প্রত্যক্ষ করে ইতালিয় পত্রিকা 'কোরিয়ের ডেলা সেরা'-তে প্রতিবেদন লেখার জন্য। ফুকোর লিখিত এই প্রতিবেদনগুলোই রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে বিতর্কিত। ইরানে শাহ-য়ের রাজতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে

গণবিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ১৯৭৭-য়ের অক্টোবরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিবাদ-প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। ১৯৭৮ সালের গোড়ার দিকে তা ইসলামিক ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিবাদে যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং ওই বছরের শেষের দিকে বিশাল বড় বড় প্রতিবাদী গণসমাবেশ রাস্তায় নেমে আসে। কিছু কিছু সমাবেশে কুড়ি লাখের বেশি মানুষ জড়ো হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী বিভিন্ন অংশ প্রতিবাদী মানুষদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়ে। গণবিক্ষোভের পাশাপাশি তার সমর্থনে নাগরিকদের খোলা চিঠি, আবেদন, হরতাল, সাধারণ ধর্মঘটের প্লাবন দেখা যায়। এর চাপে ১৯৭৯-র জানুয়ারিতে শাহ ক্ষমতা ছেড়ে ইরান ত্যাগ করতে বাধ্য হন, আর ফেব্রুয়ারিতে পনের বছর ধরে দেশের বাইরে নির্বাসিত ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লাহ খোমেইনি দেশে ফিরে নতুন শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেন। ১৯৭৮-য়ের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৯-র মে-র মধ্যে ইরানের আন্দোলন নিয়ে ফুকোর একসারি প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার ইতালিয়, ফরাসি ও ফারসি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জৈবক্ষমতা যে জনসমষ্টিকে ধাপবন্দি ক্ষমতাকাঠামোর শৃঙ্খলায় বাঁধতে চাইছে, সেই জনসমষ্টি শৃঙ্খলাছেঁড়া বিপ্লবী ভূমিকা কীভাবে নিতে পারে তার উদাহরণ হিসাবে ইরানের আন্দোলন ফুকোকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকারে তিনি ইরানের বিদ্রোহের তাৎপর্যকে পশ্চিমী অভিজ্ঞতার দুটি বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে বলেছিলেন। এই দুটি বিপর্যয় হল: ১। পশ্চিমী আলোকপ্রাপ্তি (enlightenment)-র আদর্শ থেকে গড়ে ওঠা 'ভালো বা উন্নত সমাজ' সম্বন্ধে ধারণা যার পরিণতি দাঁড়িয়েছে শিল্প-পুঁজিবাদের উত্থানের মধ্য দিয়ে 'সবচেয়ে রূঢ়, সবচেয়ে বন্য, সবচেয়ে স্বার্থপর, সবচেয়ে অসৎ ও সবচেয়ে দমনমূলক সমাজের' প্রতিষ্ঠা, আর ২। মার্কসীয় বস্তুবাদ ও যুক্তিবাদের নীতি গ্রহণের অভিজ্ঞতা যা সর্বাত্মক ক্ষমতাধিপত্য প্রতিষ্ঠার উপযোগী এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজ-সংগঠন ও অর্থনৈতিক কলকৌশলের জন্ম দিয়েছে যাকে আমরা আজ নিন্দা করতে ও বর্জনীয় বলে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। পশ্চিমী এই দুই অভিজ্ঞতাকে অনুসরণ না করাকে তিনি তাই ইরানের সীমাবদ্ধতা হিসেবে না দেখে ইরানের নতুন সম্ভাবনা হিসেবে দেখেছেন। ফুকোর মতে:

নতুনভাবে শুরু করার সাহস আমাদের থাকতে হবে। মতবাদমূলক সমস্ত নীতি আমাদের ছাড়তে হবে। অবদমনের উৎস হিসেবে কাজ করেছে এমন সমস্ত নীতিকে এক এক করে ধরে তাদের বৈধতা যাচাই করতে হবে। রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে দেখলে আমরা এখন আদিবিন্দু শূন্যতে দাঁড়িয়ে আছি। অন্য এক রাজনৈতিক চিন্তা, অন্য এক রাজনৈতিক কল্পনা আমাদের গড়ে তুলতে হবে আর তার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের ছবি আবার নতুন করে আঁকতে হবে। আমি একথা বলছি কারণ আমি বোঝাতে চাই যে কোনও পশ্চিমী মানুষই, যদি বুদ্ধিবৃত্তিচর্চায় তিনি কিছুটা অন্তত নিষ্ঠাবান হন, ইরান সম্পর্কে— যে ইরান জাতি একাধিক সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্ধগলির শেষে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই ইরান সম্পর্কে— কী শুনছেন ও কী জানছেন সে বিষয়ে নির্বিকার থাকতে পারেন না। একই সঙ্গে এখানে আমরা তাদের পাচ্ছি যারা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে এক পৃথক ধারায় চিন্তা করার ধারাকে হাজির করার জন্য সংগ্রাম করছেন। তা এমন এক ধারা পশ্চিমী দর্শন থেকে যা কিছু ধার করেনি, পশ্চিমী অধিকারক্ষেত্রীয় ও বিপ্লবী ভিত্তি থেকেও কিছু ধার নেয়নি। অন্য ভাবে বললে, তারা ইসলামি শিক্ষার উপর দাঁড়িয়ে একটি নতুন বিকল্প হাজির করার চেষ্টা করছেন।[২১]

সুতরাং ফুকো এখানে ভাবনাগত ও অভিজ্ঞতাগত ভাবে অপরের সক্রিয়তা থেকে পশ্চিমী বদ্ধ পরম্পরার বাইরে বের হওয়ার প্রস্থানপথের হদিশ পাওয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন। ইরান আন্দোলনের অবসানের পর আয়াতোল্লাহ খোমেইনির নেতৃত্বে সংকীর্ণ ইসলাম ধর্মকেন্দ্রীক শৃঙ্খলাদায়ক শাসন কায়েম হওয়ার মধ্য দিয়ে সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি, ফুকো যে সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন তা মূর্ত হয়নি।

পোল্যান্ডের সলিডারিটি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পোল্যান্ড একদিকে নাজি ও অন্যদিকে সোভিয়েত দখলদারি ও সর্বাত্মকতাবাদী (totalitarian) শাসনের ভয়ংকর হিংসাত্মক রূপ দেখেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পোল্যান্ডে সোভিয়েত রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কম্যুনিস্ট শাসন আরোপিত হয়েছিল। ১৯৫০, ১৯৬০ ও ১৯৭০-য়ের দশকে এই চাপিয়ে দেওয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম নাগরিক প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। ১৯৭০

দশকের মাঝবরাবর এসে অহিংস প্রতিরোধের নানা কৌশল উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে এই প্রতিরোধ নতুন মাত্রা ও নতুন ব্যাপ্তি অর্জন করেছিল। এই নয়া প্রতিরোধ আন্দোলনই ১৯৮০ সালে 'সলিডারিটি' আন্দোলনের জন্ম দেয়। ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে শ্রমিকরা প্রথম 'সলিডারিটি' গঠন করেন। গোড়ায় তাকে একটি ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে হাজির করলেও অচিরেই তা সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের সম্পূর্ণ অহিংস প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মঞ্চ হয়ে ওঠে এবং সংগঠনের থেকেও বেশি একটি সামাজিক গণআন্দোলনের চরিত্র গ্রহণ করে। তুঙ্গমুহূর্তে এর সদস্যসংখ্যা ১ কোটি ছুঁয়েছিল। এক-পার্টি কম্যুনিস্ট শাসন বা কম্যুনিস্ট-নিয়ন্ত্রিত আংশিক গণতন্ত্রের পরিবর্তে পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনই ছিল সলিডারিটি আন্দোলনের অভিপ্রায়। কম্যুনিস্ট শাসকরা প্রথমে এই আন্দোলনকে ভিতর থেকে দুর্বল করে তুলে ভেঙে দেওয়ার নানা কৌশল গ্রহণ করেছিল, যার মধ্যে ছিল: নেতাদের বেছে আলাদা করে সুযোগসুবিধা ও পদক্ষমতা দিয়ে শাসনকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া এবং তাদের সামনে রেখে হামলা চালিয়ে আন্দোলনে সমবেতজনেদের মনোবল ভেঙে দেওয়া। কিন্তু এই কৌশল ব্যর্থ হয়। সলিডারিটি আন্দোলন আরও শক্তিসঞ্চয় করতে থাকে। সোভিয়েত রাষ্ট্রনেতারা তাঁদের অনুগত পোল শাসকদের উপর চাপ তৈরি করেন আন্দোলন দমনের জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। ১৯৮১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর সেই চূড়ান্ত ব্যবস্থাগ্রহণের কথা ঘোষণা করেন পোল শাসকরা। সেই চূড়ান্ত ব্যবস্থার পোল নাম হল 'স্ট্যান উওজেননি', বাংলা ভাষায় যার মানে 'যুদ্ধপরিস্থিতি'। এই যুদ্ধপরিস্থিতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে সামরিক শাসন কায়েম করা হয়। অহিংস সলিডারিটি আন্দোলনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সেনা লেলিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম সপ্তাহেই সশস্ত্র পুলিশ গুলি চালিয়ে শ্রমিকদের হত্যা করে। নির্বিচার ধরপাকড়, জেলে আটকে রেখে অত্যাচার চালানো, সলিডারিটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, কোনওরকম প্রচার যাতে সলিডারিটি না চালাতে পারে তার জন্য রাষ্ট্রীয় নজরদারি ও দমন ব্যবস্থাকে অতি-সক্রিয় করা— এককথায়, সামরিক শাসনের পেষণযন্ত্রে সলিডারিটির কণ্ঠরুদ্ধ করে পিষে মারার কাজ শুরু হয়।

ফ্রান্সে তখন সমাজতান্ত্রিক পার্টির নেতৃত্বে সরকার নবনির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় বসেছে। সেই নতুন সরকার পোল্যান্ডের সামরিক শাসন

ঘোষণাকে সেই দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে অজুহাত দিয়ে এই নিয়ে কোনও অবস্থান নেওয়া এড়িয়ে যেতে চাইল। ফুকো তীব্র প্রতিবাদ করলেন। সমাজতত্ত্ববিদ পিয়ের বোর্দ-র সঙ্গে যুক্তভাবে তিনি 'না রাখা কথা' (Missed Appointments) নামে একটি বিবৃতি প্রকাশ করলেন। সেই বিবৃতিতে তাঁরা বললেন যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নির্দেশে সোভিয়েত রাষ্ট্রের অনুগত শাসকবর্গ ও সেনা ব্যবহার করে পোল্যান্ডের ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি সলিডারিটি আন্দোলন দমন করাকে পোল্যান্ডের 'আভ্যন্তরীণ বিষয়' তকমা দেওয়া এমন এক মিথ্যাচার যা রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতাকে প্রশ্রয় দেয় আর রাজনৈতিক আদর্শনিষ্ঠাকে বিসর্জন দেয়, সুতরাং ফ্রান্সের যে রাজনীতিবিদরা নিজেদের 'সমাজতান্ত্রিক' বলে দাবি করেন তাঁরা যেন নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শ জলাঞ্জলি দেওয়ার এই সুবিধাবাদিতার পুরানো পথ অনুসরণ না করে আদর্শনিষ্ঠ একটি অবস্থান নেন এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যথার্থ ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেন। ফ্রান্সের সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু মানুষ— বিখ্যাত জন থেকে সাধারণ জন— এই বিবৃতিতে তাঁদের সই যোগ করতে থাকেন, একাধিক সংবাদপত্রে প্রথম পাতায় তা ছাপা হয়, তৎকালীন জনপ্রিয় এক অভিনেতা গণসম্প্রচারমাধ্যমে তা পাঠ করেন এবং তারপর এই বিষয়ে ফুকোর সাক্ষাৎকার সম্প্রচারিত হয়। সমাজতান্ত্রিক পার্টির কিছু নেতা এর জন্য ফুকোকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে 'পাগল' বা 'ভাঁড়' বলে গালি দিলেও ক্রমশ সংগঠিত হতে থাকা জনমতের চাপে ফরাসি সরকার তার 'নিরপেক্ষ' অবস্থান কিছুটা বদলাতে বাধ্য হয়: সামরিক শাসনে পর্যুদস্ত পোল নাগরিকদের জন্য আপৎকালীন সাহায্যদানের ব্যবস্থা নেয়, ফরাসি প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত পোল্যান্ড সফর বাতিল করে।

কেবল সরকারি স্তরেই নয়, নাগরিক স্তরেও সলিডারিটি সম্পর্কে ঘটনা-তথ্যাবলী হাজির করা ও সমর্থন সংগঠিত করার কাজে ১৯৮১ সালের শেষ থেকে গোটা ১৯৮২ সাল জুড়ে ফুকো পূর্ণমাত্রায় আত্মনিয়োগ করেন। ফরাসি শ্রমিক সংগঠন 'ফ্রেঞ্চ ডেমোক্রেটিক কনফেডারেশন অফ লেবার' এবং পারি শহরের সলিডারিটি কমিটির সঙ্গে মিলে সলিডারিটি আন্দোলনের বিভিন্ন তথ্য, বিশ্লেষণ, দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার জন্য গণপ্রচারযোগ্য পুস্তিকা-প্রচারপত্র তৈরি করা, সমর্থনব্যঞ্জক ব্যাজ

তৈরি করে তা নিজে পরা ও অন্যদের মধ্যে বিলি করা— এই ধরনের সমস্ত কাজে সাধারণ কর্মীর মতো তিনি অংশ নেন। তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেন যে সলিডারিটির কণ্ঠকে স্তব্ধ হয়ে যেতে দেওয়া যাবে না, তার জন্য যা যা করা সম্ভব তা করতে হবে। ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরে 'ডক্টরস অফ দি ওয়ার্লড' নামে একটি সংগঠনের উদ্যোগে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ-তে সামরিক শাসনে ভুক্তভোগীদের সাহায্য পৌঁছে দিতে একটি 'হিউম্যানেটেরিয়ান ক্যারাভান' যাত্রার আয়োজন করা হয়। সেই যাত্রার অন্যতম সংগঠক ও অংশগ্রহণকারী ছিলেন ফুকো।

খেয়াল করার মতো বিষয় যে এই সময়পর্যায়েই ফুকো পারহেসিয়া নিয়ে তাঁর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে রত ছিলেন। সোভিয়েত রাষ্ট্র নির্দেশিত পোল সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে, ফরাসি রাজনীতিবিদদের সুবিধাবাদিতার বিরুদ্ধে 'ভয়মুক্ত সত্যভাষণ' যেন বাস্তবেও একটি পারহেসিয় মুহূর্ত তৈরি করেছিল।

৩। বর্তমান পাঠপরিপ্রেক্ষিত প্রসঙ্গে

ক্ষমতা/প্রতিরোধ বিষয়ে পাঠপ্রক্রিয়াকে ফুকো প্রতিরোধমূলক জীবনশৈলী যাপনের অংশ করেছেন। ফুকো তাই অবশ্যম্ভাবী ভাবে তাঁর পাঠকদের পাঠকাজকেও এমন এক দিকে ঠেলে দেন যেখানে পাঠবস্তুর পাশাপাশি পাঠকের বিশেষ ঐতিহাসিক-সামাজিক প্রেক্ষিতে প্রতিরোধের কাজ ও সম্ভাবনাকে বিচারের মধ্যে নিয়ে আসতে হয়। আবার, ফুকো কোনও ইতিহাস-নিরপেক্ষ সমাজ-নিরপেক্ষ তত্ত্ব হাজির করেননি, সচেতনভাবে তিনি তাঁর নিজের পশ্চিম-ইউরোপীয় পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখেই তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে ভারতীয় কোনও পাঠককে ফুকো পড়তে গেলে সমান্তরালভাবে অন্তত দুটি প্রক্রিয়া চালাতে হয়— ১। ফুকোর পশ্চিম-ইউরোপীয় পরিপ্রেক্ষিতটিকে বোঝা, ২। নিজস্ব ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মিল-অমিল বা সমতা-পার্থক্যের জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করে স্বতন্ত্রভাবে ভাবা। এই উপস্থাপনার প্রথম দুটি ভাগে প্রথম প্রক্রিয়াটিকে অনুসরণ করা হয়েছে। উপস্থাপনার এই তৃতীয় ভাগে আমরা দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি নিয়ে কিছু কথা বলব। এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি প্রতিটি পাঠকের নিজস্ব চিন্তাপ্রক্রিয়া, সৃজন ও চর্চার বিষয়। তাই এই নিয়ে সামগ্রিক

আলোচনা হাজির করা নয়, বরং যাত্রাশুরুর কিছু পথ চিহ্নিত করাই এখানে আমাদের অভিপ্রায় হবে।

ভারতীয় উপমহাদেশের একজন হিসেবে আমরা এমন এক সমাজে আজ বাস করছি যেখানে ক্ষমতাসম্পর্কগুলো শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা ও জৈবক্ষমতার ছাঁচে ক্রমশ আরও পোক্তভাবে ঢালাই হয়ে চলেছে। পশ্চিম ইউরোপে যাজকীয় ক্ষমতার যে উৎস থেকে এই ছাঁচের উদ্ভব ফুকো চিহ্নিত করেছেন, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সেই একই উৎস কাজ করেছে এমনটা নয়। এখানে রাজতন্ত্রের যুগে সার্বভৌম ক্ষমতার যে রূপ ছিল ইউরোপীয় যাজকীয় ক্ষমতারূপের সঙ্গে তা প্রধানত মেলে না— প্রাতিষ্ঠানিক খ্রিস্টান ধর্ম পশ্চিম ইউরোপে যে ক্ষমতাকাঠামো তৈরি করেছিল, ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মের তেমন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছিল না। আমাদের ইতিহাসে তাই শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতার উৎস হিসেবে ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রকেই ধরতে হবে বলে মনে হয়। এই উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের পোক্ত রূপটা ব্রিটিশ উপনিবেশ বিস্তারকারীদের হাত ধরে তৈরি হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপে বিকাশমান শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতাসম্পর্কের শাসনরূপটি ঔপনিবেশিক শোষণের বিশেষ তীব্রতায় জারিত করে ব্রিটিশ শাসকরা এখানে কায়েম করেছিল। সমাজরূপ ও জ্ঞানের একটি ধাপবন্দি কাঠামো তৈরি করে তার শীর্ষে ইউরোপীয় জ্ঞান ও সমাজরূপকে স্থাপন করে,'শীর্ষ'-কে অনুকরণই শাসিতদের উপরে ওঠার নিয়ম বলে প্রতিষ্ঠা করেছিল। নজরদারি, পুলিশরাজ ও নিয়মানুগকরণের প্রকৌশল সমাজজুড়ে কায়েম করেছিল। উপমহাদেশের বিবিধ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জ্ঞানের বহুত্ব এবং বিবিধতা ধ্বংস হয়েছিল। জৈবক্ষমতাসুলভ জনসমষ্টি-নিয়ন্ত্রণ, পরিমিতকরণ ও বিদ্বেষী জাতিবাদের চাষও হয়েছিল। বিশ শতকের মাঝামাঝি ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলেও, তাদের প্রবর্তিত ছাঁচে ঢেলেই 'স্বাধীন' শাসনতন্ত্রগুলো নির্মিত হয়েছিল। সমাজসম্পর্কে, মানসিকতায় ও জ্ঞানচর্চাতেও ঔপনিবেশিক খোয়ারি প্রলম্বিত হয়ে কোনও বুনিয়াদি বদল ঘটতে দেয়নি। এরসঙ্গে আরেকটি সমস্যার তীব্রতা ও জটিলতা ক্রমশ বেড়েছে। হিন্দু ও মুসলমানদের সম্প্রদায়গতভাবে একে অন্যের বিদ্বেষপরায়ণ অপর করে তুলে একে অপরের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রসাদলাভের প্রতিযোগিতায় ও পরস্পরের শত্রুতায় যাতে ব্রিটিশ শাসকদের অনুগত মুখাপেক্ষী করে রাখা যায় তার বিবিধ কৌশল ঔপনিবেশিক

শাসনকালে প্রযুক্ত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকদের বিদায়কালে ভারত ও পাকিস্তান রূপে দুটি বিদ্বেষপরায়ণ রাষ্ট্র তৈরি হওয়ার মধ্য দিয়ে তা পাকাপোক্ত হয়েছে। আর তারপরে এই হিন্দু-মুসলমান পরস্পর বিদ্বেষ জৈবক্ষমতাসুলভ বিদ্বেষী জাতিবাদের সবচেয়ে উর্বর উৎসভূমি হিসেবে কাজ করছে। এই উৎসভূমি থেকেই ভারতে মুসলমান-বিদ্বেষী হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হিন্দু বিদ্বেষী মুসলমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতি একে অপরকে ইন্ধন জুগিয়ে ক্রমশ নিজ নিজ ভূখণ্ডে সমাজ-রাজনীতিতে নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠেছে। এই বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়েই ভারতীয় উপমহাদেশে শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা ও জৈবক্ষমতার আদলটিকে বুঝতে হবে ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে হবে।

একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা প্রবাহিত আছে। বিভিন্ন কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সমাজতান্ত্রিক পার্টি আঞ্চলিকভাবে সংসদীয় রাজনীতি-বলয়ের ভিতরে ও বাইরে উপস্থিত আছে। এই পার্টিগুলোর মতবাদিক গঠন, ধাপবন্দি কাঠামোয় বিন্যাস ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মোহবন্ধনে আবদ্ধতা অতি প্রকট। বিভিন্ন শাসিত-নিপীড়িত বর্গের, এমনকি শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিরোধবিন্দুগুলোর কার্যকরী সংহিতাকরণের বদলে তারা প্রতিরোধের উপর শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতার নিয়মোচিতকরণ ও পরিমিতকরণের শাসন আরোপ করার উপায় হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার বাঁট বা হাতল হিসেবেই প্রধানত কাজ করছে। সুতরাং এই ধারার বাইরে বেরিয়ে সমাজজোড়া প্রতিরোধবিন্দুগুলোর কার্যকরী সংহিতাকরণের বিকল্প উপায় নির্ধারণ করতে হবে, সৃজন করতে হবে।

পারহেসিয় প্রতিরোধের উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করার জন্য ফুকো ইউরোপীয় আদিযুগের খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের গ্রিক সিনিকদের থেকে শুরু করেছেন। আমাদের ইতিহাসের আদিযুগের দিকে ফিরে তাকিয়ে আমাদের সংস্কৃতিতে এর তাৎপর্য নিয়ে ভাবা জরুরী। খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে গণরাজ্যগুলো যখন ক্ষয়ের মুখে ও রাজতন্ত্রের উত্থান ঘটছে, তখন গৌতম বুদ্ধ যে রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন (গণরাজ্যগুলোর ক্ষয়রোধের চেষ্টা করা, গণশাসনের সংহিতাকরণ করার প্রয়াস)[২২],বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রত্যুষকালে ভিক্ষুরা যে সমাজযাপন ও জীবনযাপন চর্চা করেছিল, তা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েও পারহেসিয়ার রূপকে

বোঝার চেষ্টা করা জরুরী। আর পারহেসিয়াকে ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীচর্চার বিষয় করে না রেখে ক্ষমতাবিরোধী গণআন্দোলনের স্তরে তার প্রয়োগ কীভাবে করা যায় তা নিয়ে মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, তার বিশ্লেষণ ও পুনর্মূল্যায়নও জরুরী।

ক্ষমতা/প্রতিরোধ বিষয়ে ফুকো-পাঠ-কে প্রতিরোধের জীবনশৈলীর দিকে প্রসারিত করতে আগ্রহী পাঠক নিশ্চিতভাবেই নিজ সমাজ-ইতিহাস-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই পাঠের পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটানোর আরও নানা পথ সৃজন করে নেবেন। সেই পাঠক-সক্রিয়তায় প্রাথমিক সহায়ক হিসেবে ভূমিকা নিতে পারলে এই উপস্থাপনার অভিপ্রায় পূর্ণ হবে।

বিপ্লব নায়ক
জুলাই-আগস্ট, ২০২১

সূত্রনির্দেশ

১। গ্রিগয়ের চ্যামায়ু-র মূল ফরাসি রচনা থেকে স্টিভেন রেন্ডাল কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত 'ম্যানহান্টস: এ ফিলজফিকাল হিস্ট্রি' (প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১২) বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

২। গ্রিগয়ের চ্যামায়ু-র মূল ফরাসি রচনা থেকে স্টিভেন রেন্ডাল কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত 'ম্যানহান্টস: এ ফিলজফিকাল হিস্ট্রি' (প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১২) বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

৩। জুল মিশেলেট-য়ের মূল ফরাসি রচনা থেকে এল জে ট্রটার কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত 'দি উইচ অফ দি মিডল এজেস' (সিম্পকিন, মার্শাল অ্যান্ড কোম্পানি, ১৮৬৩) বইয়ের ভূমিকা অংশ। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

৪। জুল মিশেলেট, L'Histoire de France। গ্রিগয়ের চ্যামায়ু-র মূল ফরাসি রচনা থেকে স্টিভেন রেন্ডাল কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত 'ম্যানহান্টস: এ ফিলজফিকাল হিস্ট্রি' (প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১২) বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ের শুরুতে উদ্ধৃত। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

৫। লয়সেলেউর, Les Crimes et les Peines dans l'Antiquite et dans les temps modernes, গ্রিগয়ের চ্যামায়ু-র মূল ফরাসি রচনা থেকে স্টিভেন রেন্ডাল কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত 'ম্যানহান্টস: এ ফিলজফিকাল হিস্ট্রি' (প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১২) বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে উদ্ধৃত। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

৬। মিশেল ফুকো, ফুকো লাইভ (সেমিওটেক্সট, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৬), পৃষ্ঠা:৮৪।

৭। মিশেল ফুকো-র মূল ফরাসি রচনা থেকে অ্যালান সেরিডান কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত 'ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ: দি বার্থ অফ দি প্রিজন' (ভিনটেজ/র‍্যান্ডম হাউজ, ১৯৭৯), পৃষ্ঠা: ১৯৮, ১৯৯। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

৮। মিশেল ফুকো-র মূল ফরাসি রচনা থেকে অ্যালান সেরিডান কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত 'ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ: দি বার্থ অফ দি প্রিজন' (ভিনটেজ/র‍্যান্ডম হাউজ, ১৯৭৯), পৃষ্ঠা: ২০৫। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

৯। মিশেল ফুকো-র মূল ফরাসি রচনা থেকে অ্যালান সেরিডান কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত 'ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ: দি বার্থ অফ দি প্রিজন' (ভিনটেজ/র‍্যান্ডম হাউজ, ১৯৭৯), পৃষ্ঠা: ২৩৯। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

১০। মিশেল ফুকো-র মূল ফরাসি রচনা থেকে অ্যালান সেরিডান কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত 'ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ: দি বার্থ অফ দি প্রিজন' (ভিনটেজ/র‍্যান্ডম হাউজ, ১৯৭৯), পৃষ্ঠা: ২৯৬। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

১১। মিশেল ফুকো, ক্যালিফোর্নিয়ার পালো অল্টো স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত ভাষণ, ১৯৭৯-র অক্টোবর। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

১২। অ্যাডল্ফ হিটলার, মোনোলোগ ইম ফ্যুহরার-হাউপ্টকোয়ারতিয়ের, ১৯৪১-১৯৪৪ (হামবুর্গ: এ.ক্রাউস, ১৯৮০), পৃষ্ঠা: ১৪৮। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

১৩। মিশেল ফুকো-র মূল ফরাসি থেকে রবার্ট হার্লে কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত দি উইল টু নলেজ: দি হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি, ভলুম-১ (পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৯৮), পৃষ্ঠা: ৯৪। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

১৪। মিশেল ফুকো-র মূল ফরাসি থেকে রবার্ট হার্লে কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত দি উইল টু নলেজ: দি হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি, ভলুম-১ (পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৯৮), পৃষ্ঠা: ৮২।

১৫। মিশেল ফুকো, সোসাইটি মাস্ট বি ডিফেন্ডেড, পৃষ্ঠা: ২৬২-২৬৩। বক্তৃতাটি এই বইয়ে 'জৈবক্ষমতা' শীর্ষক অধ্যায়ে অনুবাদ করা হয়েছে।

১৬। হানা আরন্ট, অন ভায়োলেন্স, ১৯৭২। বাংলা ভাষার পাঠকের জন্য: হানা আরন্ট, হিংসা প্রসঙ্গে (সম্পাদনা ও অনুবাদ-বিপ্লব নায়ক), অন্যতর পাঠ ও চর্চা, ২০১৯।

১৭। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ সাল অবধি মিশেল ফুকোর দেওয়া এই বক্তৃতামালা ইংরেজি অনুবাদে পাওয়া যায় এই বইগুলোয়: ১। দি হেরমেনিউটিকস অফ দি সাবজেক্ট, প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান, ২০০৫, ২। দি গভর্নমেন্ট অফ সেল্ফ অ্যান্ড আদারস, প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান, ২০১০, ৩। দি কারেজ অফ ট্রুথ, প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান, ২০১১। এছাড়াও ১৯৮৩ সালে এই একই বিষয়ে বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে ফুকো একটি ইংরেজিতে বক্তৃতামালা দেন, যা

২০০১ সালে সেমিওটেক্সট(ই) থেকে 'ফিয়ারলেস স্পিচ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই বইগুলোর ভিত্তিতেই এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

১৮। মিশেল ফুকো, দি কারেজ অফ ট্রুথ, প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান, ২০১১, পৃষ্ঠা: ৮। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

১৯। হুবার্ট এল দ্রেইফুস এবং পল রেনবো, মিশেল ফুকো: বিয়ন্ড স্ট্রাকচারালিজম অ্যান্ড হেরমেনিউটিকস (দ্বিতীয় সংস্করণ), দি ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা: ২৩১-২৩২। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

২০। আগ্রহী পাঠক এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য এই বইটি পড়তে পারেন: মার্সেলো হফম্যান, ফুকো অ্যান্ড পাওয়ার: দি ইনফ্লুয়েন্স অফ পলিটিকাল এনগেজমেন্ট অন থিয়োরিজ অফ পাওয়ার, ব্লুমসবারি, ২০১৪।

২১। আফারি ও অ্যান্ডারসন, ফুকো অ্যান্ড দি ইরানিয়ান রেভলুশন বইয়ের ১৮৪ পৃষ্ঠায় মিশেল ফুকোর সঙ্গে বকির পারহাম-য়ের কথোপকথন থেকে উদ্ধৃত। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

২২। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা এখানে করা গেল না। উৎসাহী পাঠকদের এ বিষয়ে বিশদ জানার জন্য ধর্মানন্দ কোসম্বীর এই বইগুলো পড়তে অনুরোধ করব: ১। ধর্মানন্দ কোসম্বী, ভগবান বুদ্ধ, মূল মারাঠি থেকে বঙ্গানুবাদ: চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮০, ২। ধর্মানন্দ কোসম্বি, দি এসেনশিয়াল রাইটিংস, সম্পাদনা ও ইংরেজিতে অনুবাদ: মীরা কোসম্বি, পার্মানেন্ট ব্ল্যাক, ২০১০, পৃষ্ঠা: ২৪৩-৩১৫, ৩২৭-৪০৮।

পরিভাষাপঞ্জী

সাধারণ দার্শনিক পরিভাষা

প্রতর্ক (discourse)

ভাষাতাত্ত্বিক সংজ্ঞা অনুসারে প্রতর্ক হল একটি বাক্যের চেয়ে দীর্ঘ কোনও ভাষিক অনুক্রম। কথোপকথন, সংলাপ, বিবরণ, ভাষণ, যুক্তিবিস্তার— এই সবই প্রতর্কের এক একটি রূপ। প্রতর্কে যুক্ত বক্তা ও শ্রোতার অবস্থান ও অভিপ্রায় এবং প্রতর্ক উপস্থাপনার স্থান-কাল-গত বৈশিষ্ট্য বিচারে এনে প্রতর্কের বিশ্লেষণ করা হয়। কোন যুক্তি বা মনুষ্যপ্রকৃতি সম্পর্কিত কোন তত্ত্বের উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তার উপর কোনও সামাজিক/ রাজনৈতিক অনুশীলনের বৈধতা নির্ভর করে— এই সাবেক ধারণা ছেড়ে তার বিপরীতে ইউরোপীয় দর্শনে এই মত জায়গা করে নিয়েছে যে সামাজিক/রাজনৈতিক অনুশীলনের বৈধতা বিচার করতে হবে তার গঠনের উপাদান হিসেবে কাজ করা প্রতর্কগুলোকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। প্রতিষ্ঠিত ভাষারূপ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন ছাঁচে ঢালাই হয়ে আছে তা উন্মুক্ত করার জন্যেও প্রতর্ক বিশ্লেষণকে হাতিয়ার করা হয়।

প্রতীতি (phenomenon)

গ্রিক শব্দ 'phainomenon' থেকে ইংরেজি 'phenomenon' শব্দটি এসেছে। এর আক্ষরিক অর্থ হল: যা নিজে থেকে আবির্ভূত হয়েছে। সাধারণভাবে এই শব্দটি দিয়ে দৃষ্টিতে বা বোধে ধরা দেয় এমন কোনও আবির্ভাব বা উপস্থিতিকে বোঝায়। আরিস্ততল-য়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী,

কোনও বিশেষ বস্তু সম্পর্কে বহুল প্রচলিত বিশ্বাস বা ধারণা, তা সাধারণ্যেই প্রচলিত হোক, বা প্রাজ্ঞমহলে প্রচলিত হোক, তাকেও এই শব্দ দিয়ে বোঝানো হবে। এখানে এই শব্দটির সমার্থক বাংলা শব্দ হিসেবে 'প্রতীতি' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

ফুকোর ব্যবহার করা বিশেষ পরিভাষা

কুলজিশাস্ত্র (genealogy)

কোনও বস্তুর উৎস ও বংশ-উৎপত্তি সম্পর্কে অনুসন্ধান বোঝাতে নিৎশে তাঁর ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত 'On the Genealogy of Morals'-বইয়ে 'genealogy' শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন । উক্ত বইতে তিনি মনুষ্য নৈতিকতার উৎপত্তির শিকড়ের খোঁজে পিছোতে পিছোতে ক্ষমতার জন্য নগ্ন সংগ্রামে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। নিৎশে ব্যবহৃত এই পরিভাষাটিকে ফুকো গ্রহণ করে ইতিহাস সম্পর্কিত একটি সাধারণ ধারণায় পরিণত করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে ফুকো ইতিহাস সম্পর্কিত চালু ধারণাগুলোর বাইরে এক আলাদা ধারণা হাজির করেছিলেন। ইতিহাস সম্পর্কে চালু ধারণায় অতীত থেকে এক অবশ্যম্ভাবী বিবর্তনের পথ ধরে বর্তমানের হাজির হওয়াকে দেখানো হয় এবং বর্তমান থেকেও তেমনই এক অবশ্যম্ভাবী বিবর্তনের পথে ভবিষ্যৎ উপস্থিত হবে বলে ধরে নেওয়া হয়। ফুকো-প্রস্তাবিত 'genealogy'-র পদ্ধতি এই বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতা ও অবিচ্ছিন্নতাকে নাকচ করে। এই পদ্ধতিতে বর্তমান থেকে শুরু করে বিশ্লেষণ করতে করতে সময়ের পথে পিছিয়ে যাওয়া হয় যতক্ষণ না একটি পার্থক্য বা অসাদৃশ্যকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে। এই চিহ্নিত করা পার্থক্য বা অসাদৃশ্য অতীতের সঙ্গে বর্তমানের ছেদবিন্দু বা অসন্ততার বিন্দু হিসেবে কাজ করে এবং অবশ্যম্ভাবী বিবর্তনের ফল হিসেবে বর্তমান যে বৈধতার দাবিদার ছিল, সেই বৈধতাকে ভিত্তিহীন বলে সাব্যস্ত করে। অবশ্যম্ভাবী বা অবিচ্ছিন্ন বিবর্তনের বর্ণনা নির্মাণের জন্য যে ধরনের কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ধারণ ও ব্যাখ্যার প্রকৌশলকে ব্যবহার করা হয় এবং ওই অবিচ্ছিন্ন বিবর্তনের প্রতিরূপ হিসেবে একটি অবিচ্ছিন্ন তত্ত্বদেহকেও (বা জ্ঞানদেহকেও) নির্মাণ করা হয়— সেসবই 'genealogy' প্রত্যাখ্যান করে। সেসবের

পরিবর্তে 'genealogy' বিচ্ছিন্ন ও আঞ্চলিক চরিত্রের জ্ঞানের উপর অভিনিবেশ করে, কোনও ঘটনার পিছনে কারণের বা প্রভাবের বহুত্বকে তুলে ধরে এবং যে কোনও ঐতিহাসিক রূপ বা কাঠামোর ক্ষণস্থায়িত্ব বা ভঙ্গুরতাকে উন্মোচিত করে। বর্তমানে যে প্রতীতিগুলোকে স্বাভাবিক, চিরকালীন বা স্বয়ংসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, সেগুলোর আপেক্ষিক, উৎক্রমণকালীন বা ক্ষণস্থায়ী চরিত্র উন্মোচিত করাই 'genealogy'-র অভিপ্রায়। 'genealogy'-র সমার্থক হিসেবে এই বইয়ে কুলজিশাস্ত্র শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রত্নশাস্ত্র (archaeology)

'প্রত্নশাস্ত্র' (archaeology), বিশেষত, 'জ্ঞানের প্রত্নশাস্ত্র' (archaeology of knowledge) ধারণাটি মিশেল ফুকোই নিয়ে এসেছেন। গ্রিক শব্দ 'arche'-য়ের মানে হল 'উৎস'। ফুকো যে অর্থে 'archaeology' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তা কিন্তু এই 'arche' বা 'উৎস' সম্পর্কে পাঠ বোঝাতে নয়, বরং 'archive' সম্পর্কে পাঠ বোঝাতে। 'archive' বলতে ফুকো এমন একটি গভীর কাঠামো বা রূপকে বুঝিয়েছেন যা কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থান-কাল-পর্বে জ্ঞানের সম্ভাব্যতার শর্ত নির্ধারণ করে। 'archive' আবিষ্কার করতে হয়, যুক্তিবিস্তারের অবরোহমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তাতে পৌঁছানো যায় না। এর মধ্য দিয়ে ফুকো চিন্তার ইতিহাস বিশ্লেষণের সাধারণ ধারা থেকে একটি পৃথক স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়েছেন। চিন্তার ইতিহাস বিশ্লেষণের সাধারণ ধারা প্রতর্কের মধ্যে ধৃত চিন্তা, প্রসঙ্গ ও প্রতিনিধিত্বমূলক উপস্থাপনাগুলোকে স্পষ্ট করে তুলে ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। অন্যদিকে ফুকো-প্রস্তাবিত 'archaelogy'-র প্রক্রিয়া স্বয়ং প্রতর্কগুলোকেই নির্দিষ্ট বিশেষ নিয়মে বাঁধা অনুশীলন হিসেবে ধরে নিয়ে সেগুলোর উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং সেই নির্দিষ্ট বিশেষ নিয়মগুলোকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। কোনও প্রতর্কগুচ্ছের পূর্বাপর বিচার, পরিপ্রেক্ষিত হাজির করা বা প্রভাব নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে চিন্তার ইতিহাস বিশ্লেষণের সাধারণ ধারা একটি ধারাবাহিকতা ও সংলগ্নতা হাজির করার উপর জোর দেয়। উল্টোদিকে, 'archaeology' প্রতর্কগুচ্ছের বিশেষত্ব বা স্বাতন্ত্র্য হাজির করার উপর জোর দেয় এবং নির্দিষ্ট প্রতর্কগুচ্ছের অনুশীলন যে নিয়মাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

সেগুলোকে অলঘুকরণযোগ্য (অর্থাৎ, অন্য কোনও বনিয়াদী নিয়মের প্রকাশ বা ফলাফল হিসেবে সেগুলোকে ধরা যাবে না) বলে দাবি করে। চিন্তার ইতিহাস বিশ্লেষণের সাধারণ ধারা যেখানে ব্যক্তি চিন্তাবিদদের উপর এবং সেই ব্যক্তি চিন্তাবিদদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর জোর দেয়, 'archaeology' সেখানে দাবি করে যে ব্যক্তি চিন্তাবিদদের সচেতনতা ও বক্তব্য তাঁদের নিজ সময়ের প্রদত্ত ধারণাকাঠামো দ্বারা নির্ধারিত হয় আর সেইজন্যই কোনও ব্যক্তি চিন্তাবিদের বিশ্বাস বা অভিপ্রায় বিচার করার চেয়ে তাঁর সময়ের গভীর ধারণাকাঠামোটাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করাই শ্রেয়। এই গভীর ধারণাকাঠামো আবিষ্কার করার উপায় হিসেবে 'archaeology' যে কৌশলগুলো অবলম্বন করে তা হল: নতুন উদ্ভবকে চিহ্নিত করা, দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ, তুলনামূলক বর্ণনা, রূপান্তরের প্রক্রিয়াগুলোকে চিহ্নিত করা। এই 'archaeology'-র সমার্থক হিসেবেই এই বইয়ে 'প্রত্নশাস্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিষয়ে বিশদ পাঠের জন্য উৎসাহী পাঠক মিশেল ফুকোর 'জ্ঞানের প্রত্নশাস্ত্র' ('TheArchaeology of Knowledge') বইটি পড়তে পারেন।

সার্বভৌম ক্ষমতা (sovereign power)

যাজকীয় ক্ষমতা (pastoral power)

শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা (disciplinary power)

জৈবক্ষমতা (biopower)

রাজকতা (governmentality)

উপরের পাঁচটি পরিভাষার বিশদ ব্যাখ্যা পাঠবস্তুর মধ্যে করা হয়েছে বলে এখানে আর আলাদা করে করা হল না।

savoir, connaissance

'savoir' ও 'connaissance' — এই দুটি শব্দের মধ্য দিয়েই ফুকো 'জ্ঞান' বুঝিয়েছেন, কিন্তু দুই রকমের জ্ঞান, যে দুটি রকমের মধ্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য টেনেছেন। 'savoir' বলতে এমন জ্ঞান বা জানার প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন যার মধ্য দিয়ে যে জানছে সে রূপান্তরিত হচ্ছে। অন্যদিকে, 'connaissance' এমন জ্ঞান বা জানার প্রক্রিয়া যা যে জানছে তার কোনও রূপান্তর ঘটাচ্ছে না, কেবল জ্ঞাতব্য তথ্য ও যুক্তিসংগতির পুঞ্জীকরণ ঘটিয়ে যাচ্ছে। এই বইয়ে আমরা শব্দদুটোকে অপরিবর্তিত রেখেছি।

অবয়ববাদ (structuralism)

অবয়ববাদ (structuralism) হল পশ্চিমী দর্শনের একটি ধারা। যে মৌল ধারণা অবয়ববাদের ভিত্তি তা হল: সমস্ত সামাজিক প্রতীতি, বহিঃপ্রকাশে তা যত বিবিধ রূপই ধারণ করুক না কেন, আভ্যন্তরীণভাবে তারা পরস্পর-সংযুক্ত এবং কোনও না কোনও অসচেতন নকশা মেনে বিন্যস্ত। এই আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ও বিন্যাসের নকশাই হল অবয়ব বা কাঠামো এবং এই অবয়ব বা কাঠামোটিকে উন্মোচিত করাই হল জ্ঞানচর্চার কাজ। সাধারণভাবে এই কাঠামো বা অবয়বটিকে সামগ্রিকতার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, রূপান্তরের প্রক্রিয়ার অধীন ও স্বনিয়ন্ত্রিত হিসেবে ধরা হয়। অবয়ববাদ এই সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে যে একটি অর্থ-প্রকাশক ব্যবস্থার উপাদান হিসেবেই কেবল বস্তুসকল অস্তিত্বমান। সেই হিসেবে, অবয়ববাদ সারবস্তুর থেকে কাঠামোর উপর বেশি গুরুত্ব দেয়, বস্তুদের চেয়ে তাদের সম্পর্কের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। ফার্দিনান্দ লা সাসুরের (১৮৫৭-১৯১৩) অবয়ববাদী ভাষাতত্ত্বে (তাঁর মৃত্যুর পর ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'কোর্স ইন জেনেরাল লিঙ্গুয়িস্টিকস' বইয়ে) হাজির হয়ে এই ধারণাগুলো প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সাসুর ভাষাকে একটি চিহ্নসমূহের নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। তারপরে ১৯৬০-য়ের দশকে ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ ক্লদ লেভি-স্ত্রস এই ভাবনাকে নৃতত্ত্ব সহ সমস্ত অর্থ-প্রকাশক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রসারিত করেছিলেন, যে কারণে তাঁকেই আধুনিক অবয়ববাদের জনক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

অস্তিত্ববাদ (existentialism)

কিয়ের্কগার্দ ও নিৎশে-র দর্শনভাবনায় এই দার্শনিক ধারার সূত্রপাত হলেও অস্তিত্ববাদ নামটি প্রথম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফরাসি দার্শনিক গাবরিয়েল মারসেল নিয়ে আসেন। এর মধ্য দিয়ে আধুনিক যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা হয়েছিল। আধুনিক যুক্তিবাদ দাবি করে যে যুক্তিই হল সর্বোচ্চ উপায় যার মধ্য দিয়ে যে কোনও সমস্যার সমাধান করা যায়। যুক্তিবাদের চোখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল একটি বোধ্য যুক্তিসংগত তন্ত্র। এর সমালোচনা করে অস্তিত্ববাদ যুক্তির উপর এমন পরম

বিশ্বাসস্থাপনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সমস্ত রকমের নিখাদ বিমূর্ত যুক্তিবিন্যাসকে পরিহার করে চলে। অস্তিত্ববাদ দাবি করে যে বিমূর্ত যুক্তিবিন্যাস ও বিমূর্ত বিশ্লেষণের বদলে মূর্ত ব্যক্তিদের জীবন-অভিজ্ঞতা ও নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করাই দর্শনের কাজ। মার্টিন হেইডেগার, কার্ল জ্যাসপারস, জাঁ পল সার্ত্র, মরিস মার্লো-পন্টি, আলবেয়ার কামু এই ধারায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।

প্রতীতিবাদ (phenomenology)

প্রতীতিবাদ (phenomenology) বলতে ইউরোপীয় দার্শনিক চিন্তার একটি বিশেষ ধারাকে বোঝানো হয়। বিশ শতকের গোড়ায় জার্মানিতে এডমুন্ড হুসেরল-য়ের চিন্তার মধ্য দিয়ে এর উৎপত্তি। পরবর্তীতে এই চিন্তাধারাকে আরও প্রসারিত করেন জার্মানির ম্যাক্স শিলার, নিকোলাই হার্টম্যান ও মার্টিন হেইডেগার আর ফ্রান্সের গাবরিয়েল মার্সেল, জাঁ পল সার্ত্র ও মরিস মার্লো-পন্টি। এই প্রক্রিয়ায় তা ক্রমে অস্তিত্ববাদ (existentialism) ও হেরমেনিউটিকস-য়ের মধ্যে মিশে গেছে। এই অর্থে ধরলে, প্রতীতিবাদ হল এমন একটি সচেতনতার দর্শন যা আশু অভিজ্ঞতার যৌক্তিকতা বা সত্যতা নিয়ে ভাবিত।

মানবতাবাদ (humanism)

মানুষ হল কিছু চিরায়ত বা ধ্রুব গুণ বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধারক— এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিবিধ দার্শনিক ধারাকে মানবতাবাদ আখ্যা দেওয়া হয়।

হেগেলবাদ (Hegelianism)

জার্মান দার্শনিক গিয়র্গ উইলহেল্ম ফ্রিয়েদরিশ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১)-য়ের দার্শনিক ভাবনা ও সেই ভাবনার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে বিকশিত বিবিধ দার্শনিক ধারাকে একলপ্তে হেগেলবাদ বলা হয়। হেগেলের বহুব্যাপ্ত কাজের মধ্যে একটি প্রধান ধারণা ছিল এই যে: প্রতীতিগত বিশ্বের অন্তরালে একটি পরম আত্মা বা চেতনা (Absolute Spirit) বিরাজ করছে, বিষয় ও বস্তু উভয়ই হল সেই পরম আত্মা এবং তা রূপের যুক্তিবোধ্য বিবর্তনের মধ্য দিয়ে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় ঐতিহাসিকভাবে বিকাশলাভ করছে।

কথোপকথন

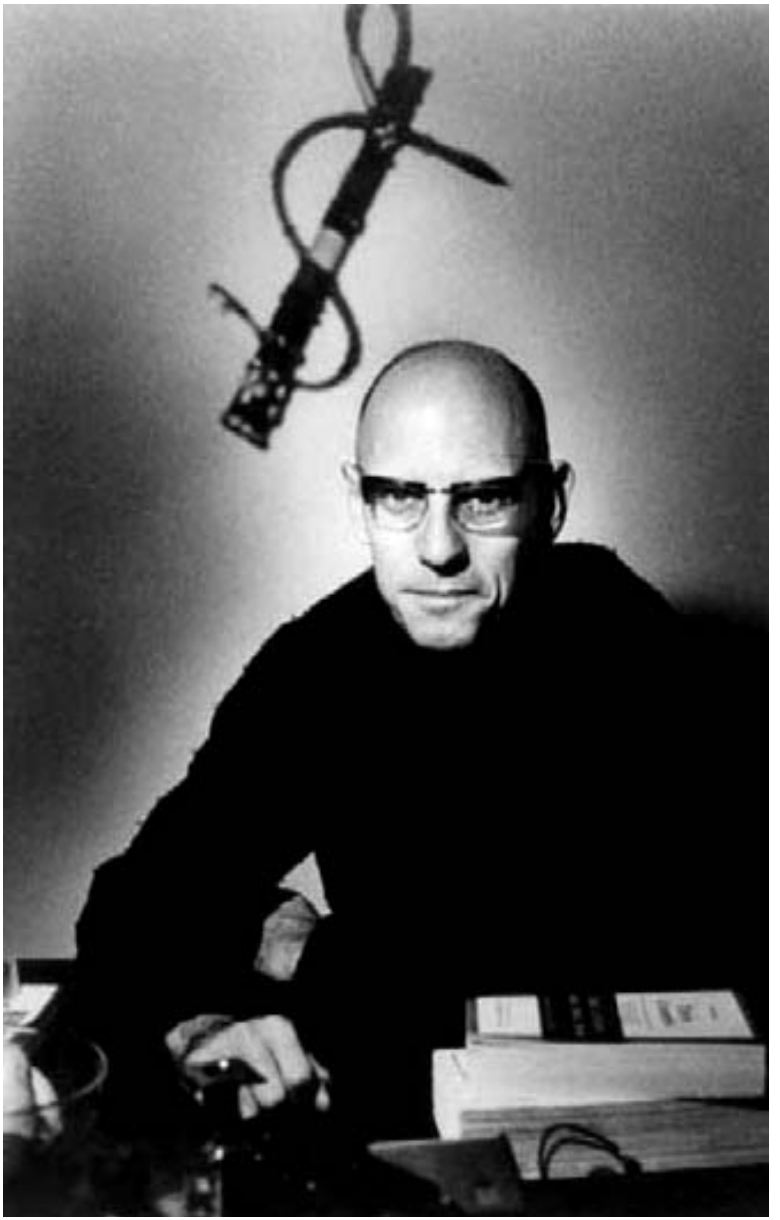

মিশেল ফুকো

ফুকো-ত্রোমবাদোরি আলাপ

ত্রোমবাদোরি: বিশেষত গত কয়েক বছর ধরে (এই কথোপকথনটি ১৯৭৮ সালের শেষে ঘটেছিল।—অনুবাদক) আপনার কাজকর্ম যে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তা বোধহয় এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: ভাষা ও মতবাদিক দৃষ্টিকোণ নিরপেক্ষভাবে এমন চিন্তাশীল মানুষ খুব বিরল যিনি সমসাময়িক বিশ্বে শব্দ ও বস্তুর মধ্যে ক্রমবর্ধমান ও অপ্রতিভকর বিচ্ছেদের কথা স্বীকার করেন না। এর থেকে আমাদের আলোচনার একটা দিকনির্দেশ পাওয়া যেতে পারে। আপনার চিন্তা ও অনুসন্ধানের চর্চাপথকে আরও ভালো ভাবে বোঝা, বিশ্লেষণের পালাবদল ও নতুনতর তাত্ত্বিক অবস্থানে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াটাকেও বোঝাই হল এই আলোচনার অভিপ্রায়। 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' (Madness and Civilization)-য় অভিজ্ঞতার মৌল রূপগুলোর অনুসন্ধান থেকে শুরু করে 'যৌনতার ইতিহাস' (History of Sexuality)-য়ের প্রথম খণ্ডে অতি সম্প্রতি হাজির করা যুক্তি-তর্ক অবধি যাত্রাপথ দেখলে মনে হয় যে আপনি অনুসন্ধানের একটা স্তর থেকে আরেকটা স্তরে লাফ দিতে দিতে স্থানবদল করে এগিয়েছেন। আপনার চিন্তার আবশ্যিক উপাদানগুলো ও ধারাবাহিকতার বিন্দুগুলোকে যদি আমি ধরতে চাই, তাহলে বোধহয় এই প্রশ্ন থেকেই শুরু করা সমীচীন হবে যে ক্ষমতা এবং জানার অভিপ্রায় সম্পর্কিত আপনার সাম্প্রতিক পাঠের আলোকে পূর্ববর্তী লেখাপত্রের কী কী জিনিস বাতিল হিসেবে পর্যবসিত হয়েছে?

ফুকো: অবশ্যই অনেক কিছু বাতিল হয়ে গিয়েছে। যে বিষয় নিয়ে আমার উৎসাহ এবং যা আমি ইতিমধ্যেই ভেবেছি— এই উভয়ের

সাপেক্ষেই যে আমি নিরন্তর অবস্থান বদল করে চলেছি, তা নিয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। আমি যা ভাবি তা কখনই আমার পূর্ববর্তী ভাবনার সদৃশ হয়না। তার কারণ হল এই যে আমার বইগুলো আমার কাছে এমন এক একটা অভিজ্ঞতা যাকে আমি এক অর্থে যতটা সম্ভব পূর্ণতার চূড়ান্ত রূপ অবধি নিয়ে যেতে চাই। অভিজ্ঞতা এমনই একটা বস্তু যার মধ্য থেকে মানুষ রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে আসে। লিখনপ্রক্রিয়ার আগেই ভাবা শেষ হয়ে গিয়েছে এমন কিছুকে জ্ঞাপন করার জন্য যদি আমায় বই লিখতে হত, তাহলে কখনও লেখা শুরু করার সাহসই আমার হতো না। আমি কেবল এইজন্যই বই লিখি যে আমার উৎসাহের বিষয়টি নিয়ে ঠিক কী ভাবা উচিত তা তখনও আমি জানি না, বই লেখার প্রক্রিয়া আমাকে রূপান্তরিত করে, আমার ভাবনাকেও রূপান্তরিত করে। একটা বই লেখা শেষ করার মুহূর্তে আমি যা ভাবছিলাম, পরের বইটা লেখার প্রক্রিয়া তা পালটে দেয়। আমি হলাম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিযুক্ত এক অনুসন্ধানী, আমি তাত্ত্বিক নই। তাত্ত্বিক আমি তাঁদেরই বলি যাঁরা কোনও সাধারণ তন্ত্র গড়ে তোলেন, সে তন্ত্র অবরোহী অনুমানভিত্তিক হতে পারে, আবার বিশ্লেষণাত্মকও হতে পারে এবং সেই সাধারণ তন্ত্রকে সমভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। আমি তা করি না। আমি পরীক্ষায়-নিরীক্ষায় নিযুক্ত একজন অনুসন্ধানী এই অর্থে যে আমি লিখি নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য এবং আগে ভাবা বস্তুর পুনরাবৃত্তি না করার জন্য।

ত্রোমবাদোরি: যাই হোক, লিখনকাজকে একটা অভিজ্ঞতা বিসেবে ভাবা একটি পদ্ধতিবিদ্যাগত সূচকবিন্দুর আভাস দেয়, বা, অন্ততপক্ষে, আপনি গবেষণার যে উপায় ব্যবহার করেন ও যে ফলে পৌঁছন তার মধ্যের সম্পর্ক আপনার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা করার সম্ভাবনা করে দেয়।

ফুকো: আমি যখন কোনও বই লিখতে শুরু করি, কী ভাবনা নিয়ে আমি শেষ করব তা অজানা থাকে তো বটেই, এমনকি কী পদ্ধতিতে আমি এগোব তাও সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করা থাকেনা। খোদাই করতে করতে একটি বিষয়ের রূপ স্পষ্ট করা এবং বিশ্লেষণের একটি পদ্ধতি তৈরি করতে করতে যাওয়াই হল আমার প্রতিটি বই। বইটি লেখা শেষ হওয়ার পর সদ্য পার হয়ে আসা অভিজ্ঞতাকে ফিরে দেখে বিচার করে একটা ধারণা তৈরি করতে পারি যে কী পদ্ধতি অনুসরণ করা সমীচীন হতো। তাই অনুসন্ধানী চরিত্রের কোনও

বইয়ের পরই পর্যায়ক্রমে আমি পদ্ধতি সংক্রান্ত বই লিখে থাকি। যেমন, অনুসন্ধানী চরিত্রের বই: 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' (Madness and Civilization), 'চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্ভব' (Birth of a Clinic), ইত্যাদি, আর পদ্ধতি সংক্রান্ত বই: 'জ্ঞানের প্রত্নশাস্ত্র' (The Archaeology of Knowledge)। তারপরে আমি লিখলাম 'শৃঙ্খলা ও শাস্তিদান' (Discipline and Punish) এবং 'যৌনতার ইতিহাস' (History of Sexuality)-য়ের ভূমিকার মতো বই। তাছাড়া, কিছু নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকারেও আমি পদ্ধতি সংক্রান্ত ভাবনা হাজির করেছিলাম। সেগুলো ছিল একটা বই শেষ করার পর তাকে নিয়ে আবার ফিরে ভাবা যা আরেকটি সম্ভাব্য প্রকল্পের পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করতে পারে। এ একপ্রকার নতুন করে ভারা বাঁধা ও খুঁটি গাড়ার কাজ যা একটা কাজের শেষ ও পরেরটার শুরুর মধ্যে গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু আমি একে এমন কোনও সাধারণ পদ্ধতিগত নিয়ম হিসেবে হাজির করতে চাই না যা সর্বদা অপর যে কারও, বা এমনকি আমার ক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে সত্য। আমি যা লিখেছি তা নির্দেশমূলক বা উপদেশমূলক নয়— আমার জন্যও নয়, অপর কারও জন্যও নয়, খুব বেশি হলে তা পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহারযোগ্য।

ত্রোমবাদোরি: আপনি যা বলছেন তা আপনার অবস্থানের বিকেন্দ্রিত চরিত্রকে প্রমাণ করে। একভাবে তা ব্যাখ্যা করে কেন সমালোচক, ব্যাখ্যাকার ও ভাষ্যপ্রণেতারা আপনার কাজকে প্রণালীবদ্ধ করে সমসাময়িক দার্শনিক চিন্তাক্ষেত্রে আপনার অবস্থানকে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে জটিলতার মুখে পড়ে।

ফুকো: আমি নিজেক দার্শনিক পদবাচ্য বলে মনে করিনা। আমি যা করি তা দর্শনচিন্তা করার কোনও উপায় নয়, আবার তা অন্যদের দর্শনচিন্তা করতে অনাগ্রহী করে তোলারও কোনও উপায় নয়। বেশ কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখক আমায় প্রেরণা যুগিয়েছেন— এমনটা বলব না যে তাঁরা আমার ভাবনার আদল গড়ে দিয়েছেন, বরং বলব যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া প্রশিক্ষণের বাঁধা পথ ছেড়ে সরে আসতে তাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁরা হলেন: জর্জ বাতাই, ফ্রিয়েদরিশ নিৎশে, মরিস ব্লাঁশো ও পিয়ের ক্লোসোওসকি। এই ব্যক্তিদের কাউকেই প্রতিষ্ঠানের বাঁধা গত অনুযায়ী দার্শনিক বলা যায় না। তাছাড়া অবশ্যই বেশ কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও ছিল। ওই লেখকদের যে দিকটা আমায় সবচেয়ে বেশি নাড়িয়ে দিয়েছে,

মোহিত করেছে এবং আমার কাছে তাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম করে তুলেছে, তা হল এই যে তাঁদের কাছে সমস্যাটা কোনও তন্ত্রকে গড়ে তোলা নয়, বরং একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা গড়ে তোলা। উল্টোদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে চালিত করা হয়েছিল হেগেলবাদ, প্রতীতিবাদ (phenomenology)-য়ের মতো বিপুল দর্শনযন্ত্রগুলো চালনায় দক্ষ করে তোলার জন্য...

ব্রোমবাদোরি: আপনি প্রতীতিবাদের কথা বলছেন, কিন্তু সমস্ত প্রতীতিবাদী চিন্তাই অভিজ্ঞতার সমস্যার উপর কেন্দ্রীভূত এবং নিজস্ব দিগন্তনির্মাণের জন্য অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভরশীল। তাহলে আপনার সঙ্গে তার ফারাক ঘটছে কোথায়?

ফুকো: প্রতীতিবাদীদের কাছে অভিজ্ঞতা হল মূলত 'যাপিত অভিজ্ঞতার' কোনও বিষয়কে নিয়ে বা ক্ষণস্থায়ী রূপসম্পন্ন প্রাত্যহিকতাকে নিয়ে তার অর্থোপলব্ধির জন্য গভীর চিন্তা নিয়োগ করার উপায়বিশেষ। অন্যদিকে নিৎশে, বাতাই, ব্লাঁশো-র কাছে অভিজ্ঞতা হল জীবনযাপনে 'অযাপনযোগ্য'-র যতটা কাছে পৌঁছানো যায় ততটা কাছের কোনও বিন্দুতে পৌঁছানোর চেষ্টা করা, এমন একটা বিন্দুতে পৌঁছানো যা যাপনের মধ্যে পেরিয়ে যাওয়া যায় না। তার জন্য দরকার সর্বোচ্চ তীব্রতা ও সর্বোচ্চ অসম্ভাব্যতা। এর বিপরীতে, প্রতীতিবাদী প্রয়াস প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রটিকেই খুলেমেলে ধরে মাত্র।

তাছাড়া, প্রতীতিবাদ প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অর্থকে পুনরুদ্ধার করতে চায় যাতে তার মধ্য দিয়ে পুনরাবিষ্কার করা যায় কী অর্থে 'আমি'-রূপ বিষয়ী তার তুরীয় বৃত্তিতে এই অভিজ্ঞতা ও তার অর্থ নির্মাণের দায়ভাগী। অন্যদিকে, নিৎশে, বাতাই ও ব্লাঁশো-র ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা হল বিষয়ীকে তার নিজত্ব থেকে উপড়ে নিয়ে আসার উপায়, বিষয়ী যাতে আর নিজত্বে অপরিবর্তিত না থাকে তা নিশ্চিত করার উপায়, বা বিষয়ীর নিজত্বের ধ্বংসসাধন বা বিগলন করার উপায়। এ হল নিবিষয়ীকরণের প্রকল্প।

নিৎশে, বাতাই ও ব্লাঁশো পাঠে এটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ হল বিষয়ীকে তার স্ব থেকে উপড়ে আনতে সক্ষম প্রান্তিকসীমার অভিজ্ঞতা, তাই-ই বই লেখাকে আমি যেভাবে নিয়েছি তা ব্যাখ্যা করে। আমার বই, তা যতই একঘেয়ে বা যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হোক

না কেন, সেগুলোর পরিকল্পনা আমি সেভাবেই করেছি যাতে তারা এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে যা আমাকে আমার নিজত্ব থেকে বিযুক্ত করে মুক্ত করতে পারে, একই রকম থেকে যাওয়া থেকে বিরত করতে পারে।

ত্রোমবাদোরি: আপনি যা বলছেন তা যদি আমি বুঝতে পেরে থাকি, তাহলে মনে হয় যে আপনার বৌদ্ধিক মনোভঙ্গিমার তিনটি আবশ্যিক দিক আছে: প্রতিনিয়ত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজকে নেওয়া, পদ্ধতি বিষয়ে চূড়ান্ত আপেক্ষিকতা এবং বিষয়ীকরণের সাপেক্ষে নিরন্তর টানাপোড়েন। এগুলোকে যদি আমরা বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরে নিই, তাহলে এই প্রশ্ন অবাক করে যে কোনও একটি অনুসন্ধানের ফলাফল তাহলে বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করে কীভাবে, আর, সত্য বিচারের কোন মান-নির্ণায়কই বা তাহলে আপনার চিন্তাভঙ্গিমার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে?

ফুকো: আমার বক্তব্যের সত্যতার প্রশ্নটি আমার কাছে খুব কঠিন একটি সমস্যা, বলা যায়ে যে এটিই কেন্দ্রীয় সমস্যা। এই প্রশ্নের উত্তরে আমি এখনও পৌঁছতে পারিনি। তবু আমি বহুল প্রচলিত পদ্ধতিগুলোই ব্যবহার করি, যেমন: ঐতিহাসিক বস্তুর ক্ষেত্রে প্রতিপাদন বা কোনওরূপ প্রমাণ, মূল উৎস নির্দেশ, প্রাধিকারী নির্দেশ, লিখিত নথি এবং তথ্যের মধ্যে সংযোগস্থাপন, অর্থনির্মাণের ধাঁচা প্রস্তাব করা, বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা হাজির করা। এই-ই আমি করে থাকি, এর মধ্যে কোনও অভিনবত্ব নেই। সেদিক থেকে দেখলে, আমি আমার বইয়ে যা বলেছি তার সত্যতা এবং যে কোনও ইতিহাসের বইয়ের বক্তব্যের সত্যতা একই উপায়ে নির্ধারণ করা সম্ভব।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আমার লেখার পাঠকরা— বিশেষত আমার কাজকে গুরুত্ব দেয় এমন পাঠকরা— প্রায়শই হেসে বলেন, 'তুমি নিজেও ভালোই জানো যে তুমি যা বলছ তা নেহাতই গল্পগাছা।' জবাবে আমিও সবসময় বলি, 'অবশ্যই! গল্পগাছা ছাড়া অন্যকিছু হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

যেমন ধরা যাক, আমি যদি সতেরো ও আঠারো শতকের মধ্যবর্তী কালের ইউরোপে মনরোগ চিকিৎসার প্রতিষ্ঠানগুলোর ইতিহাস লিখতে চাইতাম, তাহলে নিশ্চয়ই 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা'-র মতো কোনও বই লিখতাম না। কিন্তু পেশাদার ইতিহাসবিদদের সন্তুষ্ট করা আমার অভীষ্ট নয়। আমার অভীষ্ট হল নিজেকে গঠন করা এবং অন্যদেরও আমন্ত্রণ জানানো এক বিশেষ

অভিজ্ঞতার অংশীদার হওয়ার জন্য। এই বিশেষ অভিজ্ঞতা হল আমরা যা তার অভিজ্ঞতা। কেবল আমাদের অতীত নয়, আমাদের বর্তমানও। আমাদের আধুনিকতার এমন এক অভিজ্ঞতা যার মধ্য দিয়ে যাত্রার পর আমরা রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে আসব। অর্থাৎ, বইয়ের শেষে আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ীর সঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করব: উন্মত্ততার সঙ্গে, উন্মত্ততার সমসাময়িক সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে এবং আধুনিক বিশ্বে উন্মত্ততার ইতিহাসের সঙ্গে লেখক হিসেবে আমার এবং পাঠক হিসেবে অন্যদের ভিন্নতর এক সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

ত্রোমবাদোরি: আপনার প্রতর্কের ঈপ্সিত ফলদানের ক্ষমতা নির্ভর করে একটি ভারসাম্যের উপর। সেই ভারসাম্যের একদিকে আছে প্রমাণের ক্ষমতা আর অন্যদিকে আছে এমন এক অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত করে দেওয়ার সামর্থ্য যা আমাদের বর্তমানতাকে বিচার করা ও যাপন করার প্রেক্ষাপটস্বরূপ সাংস্কৃতিক দিগন্তগুলোকেই বদলে দেয়। কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারলাম না যে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে 'সত্য নির্ণায়ক' সম্বন্ধে যে কথা হচ্ছিল তার কী সম্পর্ক। অর্থাৎ, যে রূপান্তরগুলোর কথা আপনি বলছেন, তাদের সঙ্গে সত্যের কী সম্পর্ক, বা তারা কীভাবে সত্যের প্রভাব উৎপন্ন করে?

ফুকো: এখনও অবধি আমি যা লিখেছি এবং যে প্রভাব তারা উৎপন্ন করেছে, তাদের মধ্যে সম্পর্কটা বেশ অদ্ভুত। 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা'-র ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল সে কথাই ধরা যাক। মরিস ব্লাশোঁ, রোলাঁ বার্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছে বইটি সমাদর পেয়েছিল, মনোরোগ চিকিৎসকরা প্রথমে কিছুটা কৌতূহল ও কিছুটা সহানুভূতি নিয়ে তা পাঠ করেছিল আর ইতিহাসবিদদের এ ব্যাপারে কোনও আগ্রহই না থাকায় তাঁরা বইটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে গিয়েছিলেন। এরপর দ্রুতই যে মাত্রায় বইটি মনোরোগের অধুনা চিকিৎসারীতির উপর একটি আক্রমণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে মনোরোগ-চিকিৎসা-বিরোধিতার একটি ইস্তাহার রূপে গণ্য হতে শুরু করল, বইটির প্রতি মনোরোগ চিকিৎসকদের বৈরিতার মনোভাব সে মাত্রাতেই বাড়তে থাকল। কিন্তু তা যে আমার অভীষ্ট ছিল না তার পিছনে অন্তত দুটি কারণ দেখানো যায়। ১৯৫৮ সালে পোল্যান্ডে বসে আমি যখন বইটি লিখি, তখন ইউরোপে মনোরোগ-চিকিৎসা-বিরোধিতার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। আর

বইটিকে কোনওভাবেই মনোরোগ চিকিৎসার উপর আক্রমণ বলা যায় না নেহাত এই কারণেই যে বইটিতে আলোচনার সময়কাল উনিশ শতকের ঠিক শুরুতে এসেই থেমে গেছে— এমনকি এতিয়েন এসকুইরোলের কাজও আমি পুরোপুরি আলোচনার পরিসরের মধ্যে আনিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বইটি আজও গণমনে সমসাময়িক মনোরোগ-চিকিৎসার উপর একটি আক্রমণ হিসেবেই জায়গা করে নিয়ে আছে। কেন? আমার মনে হয় যে তা এই কারণে যে বইটি আমার জন্য এবং যারা বইটি পড়েছে ও ব্যবহার করেছে তাদের জন্য একটা রূপান্তরসাধনের প্রক্রিয়াকে সূচিত করে। তা হল এক সম্পর্কের রূপান্তর— উন্মত্ততা, মনোরোগী, মনোরোগ চিকিৎসার প্রতিষ্ঠান এবং মনোরোগ বিষয়ক প্রতর্কে নির্ধারিত সত্যতার সঙ্গে আমাদের যে ঐতিহাসিক, তাত্ত্বিক এবং নীতিগত বা নৈতিক সম্পর্ক বর্তমান, সেই সম্পর্কের রূপান্তর। সুতরাং একটি বই যত না একটি ঐতিহাসিক সত্যের প্রতিষ্ঠাসাধন হিসেবে কাজ করে, তার থেকে অনেক বেশি লেখক ও পাঠক উভয়ের জন্যই একটি রূপান্তরকারী অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজ করে। তেমন একটি অবিজ্ঞতা হয়ে ওঠার জন্য আমার বইটির মধ্যে বিধৃত কথাকে ঐতিহাসিকভাবে যাচাইযোগ্য বিদ্যায়তনিক সত্য হতেই হবে এমন নয়। আমার বই ঠিক উপন্যাস নয়। কিন্তু তবুও তার নির্যাসটি ঐতিহাসিকভাবে যাচাইযোগ্য বা সত্য অনুসন্ধান-ফলগুলোর মধ্যে নেই, বরং বইটি যে অভিজ্ঞতাকে সম্ভবপর করে তোলে তার মধ্যেই তার নির্যাস রয়েছে। এখন কথা হল, এই অভিজ্ঞতা সত্যও নয়, আবার মিথ্যাও নয়। অভিজ্ঞতা সবসময়েই একধরনের কাহিনী-নির্মাণ: তা এমনকিছু যা কেউ নিজে গড়ে তোলে, যার অস্তিত্ব তার আগে ছিল না, আবার তার পরেও থাকবে না। সত্যের সঙ্গে কঠিন সম্পর্কটা এমনই, এভাবেই সত্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাঁধা, যে অভিজ্ঞতা আবার সত্যের সঙ্গে বাঁধা নেই ও সত্যকে কিছুটা মাত্রায় ধ্বংস করাই যার কাজ।

ত্রোমবাদোরি: সত্যের সঙ্গে এই কঠিন সম্পর্কটা কি একটি ধ্রুবক হিসেবে আপনার গবেষণাকাজের সঙ্গী হয়েছে এবং 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা'-র পরবর্তী কাজগুলোতেও কি একে চিহ্নিত করা যায়?

ফুকো: 'শৃঙ্খলা ও শাস্তিদান' সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। এখানে অনুসন্ধানের সময়কাল শেষ হয়েছে ১৮৩০-য়ের দশকে এসে। তবু এই

ক্ষেত্রেও পাঠকরা— যারা সমালোচনার চোখ নিয়ে পড়েছেন বা যারা তা নয়, উভয় পক্ষই— বইটিকে নিয়েছেন বন্দিত্বের সমাজ হিসেবে সমসাময়িক সমাজের একটি বর্ণনা হিসেবে। বইটিতে কোথাও আমি তা লিখিনি, যদিও এটা সত্য যে এর লিখনপ্রক্রিয়া আমাদের আধুনিকতা সম্পর্কে এক রকম অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত। বইটি আসল নথিপত্রই ব্যবহার করেছে, কিন্তু সেই ব্যবহারের ধরন এমন যে সেগুলো কেবলমাত্র সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে না, বরং এমনকিছু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যায় যা জগতের সঙ্গে ও স্বয়ং নিজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কগুলোর বদল বা রূপান্তর ঘটিয়ে দিতে পারে। জগতের সঙ্গে বা স্বয়ং নিজের সঙ্গে যে সম্পর্কগুলোকে আমরা সমস্যাহীন বলে মনে করে আসছিলাম, সেগুলোর সমস্যাগুলোকে উন্মুক্ত করে বদল বা রূপান্তরের সূচনা করতে পারে। সংক্ষেপে বললে, আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের রূপান্তরসাধন করতে পারে।

তাই সত্য ও কাহিনীর এই খেলা, বা বলা যায়, সত্য যাচাই ও কাহিনী নির্মাণের এই খেলা কখনও বা সম্পূর্ণ অসচেতনভাবে হলেও আধুনিকতার সঙ্গে আমাদের কোনও না কোনও গ্রন্থির উপর আলো ফেলে এবং একইসঙ্গে পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বন্দিত্ব, শাস্তি ইতাদির মতো কলকৌশলগুলোর বোধগ্রাহ্যতাকে আমরা আয়ত্ত করি এবং যে উপায়ে তাদের ভিন্নতর দৃষ্টিতে দেখার মধ্য দিয়ে তাদের থেকে নিজেদের বিযুক্ত করতে পারি— এই দুটি যদি এক ও অভিন্ন হয়, তাহলেই সবচেয়ে ভালো। আমি যা করি তার প্রকৃত নির্যাসটা এটাই। এর ফলশ্রুতি বা লক্ষণাগুলো কী? প্রথমত, আমি কোনও ধারাবাহিক বা প্রণালীবদ্ধ উপাত্ত দিয়ে তৈরি প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করি না। দ্বিতীয়ত, এমন কোনও বই আমি লিখি নি যার পিছনে অন্তত আংশিকভাবে হলেও আমার প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোনও অনুপ্রেরণা নেই। উন্মত্ততার সঙ্গে ও মনোরোগ চিকিৎসার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার এক জটিল ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। অসুস্থতা ও মৃত্যুর সঙ্গেও আমার এক ধরনের সম্পর্ক ছিল। চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্ভব এবং চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানে মৃত্যুর প্রবর্তন নিয়ে আমি তখনই লিখেছি যখন ওই বিষয়গুলো আমার নিজের কাছে নির্দিষ্টভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অন্যভাবে বা অন্য কারণে হলেও, বন্দিশালা ও যৌনতার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে ।

তৃতীয় লক্ষণা: ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসমূহকে জ্ঞানে বহন করে নিয়ে যাওয়ার কোনও বিষয় এটা নয়। বইয়ের মধ্যে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটি রূপান্তর— একটি ভিন্নতর রূপ গ্রহণ— সম্ভবপর হয়ে উঠতে হবে যা শুধুমাত্র আমার নয়, বরং অন্যদের জন্যও যার নির্দিষ্ট মূল্য আছে, অভিগম্যতা আছে এবং অন্যরাও সেই অভিজ্ঞতার শরিক হতে পারে।

চতুর্থ এবং শেষ লক্ষণা: এই অভিজ্ঞতাকে কোনও এক ভাবে, কোনও এক মাত্রায় সমষ্টিগত চর্চার সঙ্গে, চিন্তার প্রকারের সঙ্গে যুক্ত হতে সমর্থ হতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ফ্রান্সের মনোরোগ-চিকিৎসা-বিরোধী আন্দোলন বা বন্দিদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে তেমনটাই ঘটেছিল।

ত্রোমবাদোরি: আপনি যে এই 'সমষ্টিগত চর্চা'-র সঙ্গে সংযুক্ত হতে সক্ষম 'রূপান্তর'-য়ের পথ দেখানো বা খুলে দেওয়ার কথা বললেন, তখনই আমি এক বিশেষ ধরনের শিক্ষাদানের বা বিশেষ এক প্রণালীশাস্ত্রের রূপরেখার আভাস দেখতে পেলাম। ব্যাপারটা কি তেমনই নয়? আর যদি তা হয়, তাহলে আপনার কি মনে হয় না যে তা আপনারই গুরুত্ব দেওয়া আরেকটি বিষয়, অর্থাৎ, উপদেশমূলক প্রতর্ক এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়ের বিপরীতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে?

ফুকো: 'শিক্ষাদান' শব্দটি মেনে নিতে আমি রাজি নই। কোনও বই যদি প্রণালীবদ্ধ হয়, সাধারণিকরণযোগ্য পদ্ধতি নিয়োগ করে বা কোনও তত্ত্বের উপস্থাপনাই তার বিষয় হয়, তবে তা শিক্ষাদান করে। আমার বইগুলো তেমন চরিত্রের নয়। তাদের চরিত্র অনেকটা কোনও আমন্ত্রণের মতো বা সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত ভঙ্গিমার মতো।

ত্রোমবাদোরি: কিন্তু যে কোনও সমষ্টিগত চর্চাই কি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিসরকে ছাপিয়ে যায় এমন মূল্যবোধ, বিচারনীতি ও আচরণের সঙ্গে যুক্ত হয় না?

ফুকো: অভিজ্ঞতা হল এমন যা কেউ সম্পূর্ণত একা লাভ করে, কিন্তু তা সেই মাত্রাতেই সম্পূর্ণভাবে লাভ করা যায় যে মাত্রায় তা নিখাদ আত্মবিষয়কতাকে পাশ কাটিয়ে অন্যদের জন্যও অভিগম্য হয়ে ওঠে— অন্যদের ক্ষেত্রে সে অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হবে এমনটা আমি বলছি না, কিন্তু

অন্যরাও সেই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে পারবে। ক্ষণেকের জন্য বন্দিশালা নিয়ে বইটির প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। একদিক থেকে দেখলে এটি একটি নিখাদ ইতিহাসের বই। কিন্তু মানুষ বইটিকে পছন্দ করেছে বা ঘৃণা করেছে এই কারণেই যে তাদের মনে হয়েছে বইটি তাদের নিজেদের কথা বলছে, তাদের সমসাময়িক জগতের কথা বলছে বা সবার কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠা রূপগুলোর মধ্যে ধৃত সমসাময়িক জগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্কগুলোর কথা বলছে। তারা আঁচ করতে পারছিল যে বর্তমান বাস্তবতার মধ্যের কোনও একটা কিছুকে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে। আর ঘটনাও এটাই যে দণ্ডআরোপকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ভাবনা-চিন্তা-সংগ্রামে রত বিভিন্ন কর্মীগোষ্ঠীর মধ্যে বহু বছর ধরে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার পরই আমি এই বইটি লিখতে শুরু করেছিলাম। বন্দি, বন্দিদের পরিবার, বন্দিশালার কর্মী, শাসক-বিচারক ইত্যাদিদের সংযোগে এসে দণ্ডআরোপকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে সেই ভাবনা-চিন্তা-সংগ্রামের কাজ ছিল জটিল ও কঠিন।

বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর, বিভিন্ন পাঠকরা— বিশেষ করে জেল-আধিকারিক, সমাজকর্মী, ইত্যাদির মতো লোকেরা— এই অদ্ভূত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল: 'বইটি পক্ষাঘাত ধরিয়ে দেয়। এর মধ্যে কিছু সঠিক পর্যবেক্ষণ থাকতে পারে, কিন্তু তা হলেও এর সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট, কারণ তা আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের বাধা দেয়, পথ আটকে দাঁড়ায়।' আমার উত্তর হল যে এই প্রতিক্রিয়াই প্রমাণ করে যে আমার কাজ সফল হয়েছে, বইটি আমার অভিপ্রায় মতোই কাজ করেছে। দেখা যাচ্ছে যে মানুষ বইটিকে পাঠ করেছে এমন এক অভিজ্ঞতা হিসেবে যা তাদের বদলে দিয়েছে, যা তাদের চিরদিন একই রকম থাকার পরিপন্থী হয়েছে, বইটি পড়ার আগে অন্যদের সঙ্গে বা বস্তুর সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক ছিল তা অপরিবর্তিত থাকার পরিপন্থী হয়েছে। এটা দেখায় যে বইটিতে এমন এক অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে যা কেবল আমার একার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। পাঠকরা ঘটমান একটি প্রক্রিয়ায় নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছেন, সে প্রক্রিয়াকে সমসাময়িক মানুষের নিজের সম্পর্কে ধারণার সাপেক্ষে রূপান্তরের প্রক্রিয়া বলা যায়। আর বইটি এই রূপান্তরের পথে তাকে ঠেলে দিয়েছে। একটা ছোট মাত্রায় হলেও বইটি এমনকি এই রূপান্তরের নিযুক্তক হিসেবেও কাজ করেছে। সত্যোচ্চারণকারী বই বা শিক্ষাদানকারী/প্রদর্শনকারী বইয়ের বিপরীতে একটি অভিজ্ঞতার বই বলতে আমি এমনটাই বোঝাতে চাইছি।

ত্রোমবাদোরি: আমাদের বিশ্লেষণের এই জায়গায় আমার একটা পর্যবেক্ষণকে আমি নিয়ে আসতে চাই। নিজের সম্পর্কে এবং নিজের গবেষণা সম্পর্কে আপনি এমনভাবে আলোচনা করছেন যেনবা যে পরিপ্রেক্ষিতে তা পরিপক্কতা লাভ করেছে সেই ঐতিহাসিক ও সর্বোপরি সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের উপর তা নির্ভরশীলই নয়। আপনি নিৎশে, বাতাই ও ব্লাঁশো-র কথা উল্লেখ করেছেন। আপনি কীভাবে এই লেখকদের সংস্পর্শে এলেন? আপনার গড়ে ওঠার পর্যায়ে বা প্রস্তুতিপর্বে ফ্রান্সে একজন বুদ্ধিজীবী হওয়ার মানে কী ছিল এবং সেই সময়ের তাত্ত্বিক বিতর্কগুলোই বা কী ছিল? কীভাবে সেই পর্যায়ে পৌঁছলেন যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিগত পরিণত পছন্দের মধ্য দিয়ে আপনার চিন্তার মূল অভিমুখটা আপনি বেছে নিলেন?

ফুকো: ১৯৫০ দশকের প্রথম দিকে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের সময় আধিপত্যকারী প্রভাব হিসেবে হেগেল ও প্রতীতিবাদ বিরাজ করছিল। এই আধিপত্যকারী প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করার কাজে আমার সহায় হয়েছিল নিৎশে, ব্লাঁশো এবং বাতাই। সেই সময়ে— এবং আজও তার খুব অন্যথা হয়নি— দর্শনচর্চা করার মানে ছিল দর্শনের ইতিহাস চর্চা করা, আর সেই দর্শনের ইতিহাসের একদিকের সীমা ছিল হেগেলের তন্ত্রের তত্ত্ব আর অন্যদিকের সীমা ছিল প্রতীতিবাদ বা অস্তিত্ববাদের চেহারায় হাজির বিষয়ীর দর্শন। মূলগতভাবে, হেগেলই ছিল অধিপত্যকারী। ফ্রান্সের ক্ষেত্রে এক অর্থে তা নতুনও ছিল, যা জাঁ ওয়াহল-য়ের কাজ ও জাঁ হিপোলিট-য়ের শিক্ষকতার হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে অসুখী চেতনার ভাবনাকে কেন্দ্রে রেখে হেগেলবাদের সঙ্গে প্রতীতিবাদ ও অস্তিত্ববাদকে এফোঁড় ওফোঁড় করে বুনে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিয়োগান্তক বিষাদপর্ব সদ্য কাটিয়ে আসা, তার পূর্ববর্তী রুশ বিপ্লব, নাজিবাদ ইত্যাদির মতো বিরাট ওলোটপালোটগুলোর রেশবাহী সেই সময়কার বিশ্বকে বোঝার সবচেয়ে বিস্তৃত উপায় হিসেবে ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে এর থেকে ভালো কিছু দেওয়ার মতো ছিল না। আমাদের ঠিক আগের প্রজন্ম যে বিয়োগান্তক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং আমাদের প্রজন্মের সামনেও যা বিপদের মতো দাঁড়িয়ে আছে, সেই অভিজ্ঞতার যুক্তিবদ্ধ সারসংকলনের বা উপলব্ধি অর্জনের উপায় হিসেবে হেগেলবাদকে এগিয়ে দেওয়া হতো

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সার্ত্র তাঁর বিষয়ীর দর্শন নিয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলেন। অস্তিত্ববাদী প্রতর্ককে নির্দিষ্ট চিন্তাক্ষেত্রে বিস্তৃত করে জগতের বোধগম্যতার প্রশ্নের— যেমন ধরা যাক, বাস্তবতার বোধগম্যতার প্রশ্নের— উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়ে বিদ্যায়তনিক দর্শনচর্চার ধারা এবং প্রতীতিবাদের মধ্যে একটি মিলনবিন্দু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মরিস মের্লো-পন্টি। বুদ্ধিবৃত্তিগত এই বহুবর্ণ পরিদৃশ্যের মধ্যে থেকেই আমার নিজের বাছাই ও পছন্দগুলো পরিপক্কতা লাভ করেছিল। একদিকে আমি আমার অধ্যাপকদের মতো দর্শনের ইতিহাসকার হব না বলে ঠিক করি। আর অন্যদিকে, অস্তিত্ববাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কিছুর সন্ধান করতে হবে বলে মনস্থ করি। তা আমি খুঁজে পেয়েছিলাম বাতাই ও ব্লাঁশো পড়তে গিয়ে, এবং তাঁদের সূত্রেই নিৎশেকে পড়া শুরু করে। তাঁরা আমার কাছে কী নিয়ে এসেছিলেন? প্রথমত, তাঁরা আমায় 'বিষয়ী'-র ধারণাটিকে প্রশ্ন করতে আহ্বান করেন। বিষয়ীর ধারণাটিকে প্রশ্ন করা মানে বিষয়ীর প্রাধান্যকে প্রশ্ন করা, বিষয়ীর ভিত্তিমূলক ভূমিকাকে প্রশ্ন করা। দ্বিতীয়ত, তাঁরা আমাকে এই দৃঢ়বিশ্বাসে পৌঁছে দেন যে সেই প্রশ্ন করার কাজ যদি কেবলমাত্র চিন্তাচর্চার মধ্যেই আটকে থাকে, তবে তা অর্থহীনতায় পর্যবসিত হবে। যে বিষয়ীকে প্রশ্ন করবে, তাকে এমন কোনও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে যা বিষয়ীকে বাস্তবত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, বিষয়ীর পচন ঘটায়, বিষয়ীকে বিস্ফোরিত করে, অন্যতর কিছুতে তাকে রূপান্তরিত করে।

ত্রোমবাদোরি: এমন একটা অভিমুখ নেওয়া কি কেবল সেই সময়কার আধিপত্যকারী দার্শনিক পরিবেশ সম্পর্কে এক ধরনের সমালোচনাত্মক মনোভাব নেওয়া দ্বারাই চালিত হয়েছিল, নাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফরাসী বাস্তবতার বিভিন্ন মাত্রা সম্পর্কে অনুধ্যানও তার পিছনে কাজ করেছিল? আমি আসলে রাজনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যের সম্পর্কের কথা ভাবছি, বুদ্ধিজীবীদের নতুন প্রজন্ম যেভাবে রাজনীতির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল ও রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করেছিল, তার কথা ভাবছি।

ফুকো: আমার কাছে রাজনীতি ছিল নিৎশে বা বাতাই-য়ের মতো করে অভিজ্ঞতা লাভের একটি সুযোগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার অল্প পরেই যে মানুষটি কুড়ি বছর বয়সে উপনীত, যুদ্ধের নৈতিকতার মধ্যে যে প্রবিষ্ট হয়নি, তার কাছে রাজনীতি আসলে কী হতে পারে? ট্রুমানের আমেরিকা বা

স্তালিনের রাশিয়ার মধ্যে কোনও একটাকে বেছে নেওয়া? পুরানো এস এফ আই ও (ফ্রেঞ্চ সেকশন অফ দি ওয়ার্কার্স ইন্টারন্যাশনাল) ও খ্রিস্টান গণতন্ত্রীদের মধ্যে একটাকে বেছে নেওয়া? বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক, সাংবাদিক, লেখক বা সেই গোত্রেরই কিছু একটা হওয়া আমার কাছে অতি বিতৃষ্ণার বিষয়। যে সমাজে আমরা বাস করছিলাম, যে সমাজ নাজিবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে, নাজিবাদের পায়ে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছে আর তারপর দল বেঁধে দি গল-য়ের শরণ নিয়েছে, তার থেকে আমূল আলাদা কোনও সমাজের অতি জরুরী প্রয়োজনীয়তা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল। সমাজের এই সমস্তকিছুর প্রতি ফরাসী যুবদের একটা বড় অংশের তীব্র বিরাগ জন্মেছিল। আমরা এমন এক সমাজ ও জগৎ চাইতাম যে কেবলমাত্র আলাদাই হবে না, যেখানে আমরা নিজেরাও হব অন্যরকম: সম্পূর্ণ আলাদা এক জগতে সম্পূর্ণ অন্যতর কিছু হয়ে উঠতে চাইতাম। তার উপর, বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের হাতে যে হেগেলবাদকে ধরিয়ে দিয়েছিল, ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন বোধগম্যতার ধাঁচায় বাঁধা সেই হেগেলবাদ আমাদের সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিল না। বিষয়ীর প্রাধান্য ও বিষয়ীর মৌল গুরুত্বকে আঁকড়ে থাকা প্রতীতিবাদ ও অস্তিত্ববাদও আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারছিল না। অন্যদিকে নিৎশের ছেদের ধারণা, মানুষের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে এমন 'মানবোত্তীর্ণ'(overman)-য়ের ধারণা এবং বাতাইয়ের সেই সীমান্তবর্তী অভিজ্ঞতার ধারণা যার মধ্য দিয়ে বিষয়ী নিজেকে উৎক্রমণ করে যেতে পারে— এইগুলো আমাদের কাছে মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠছিল। অন্তত আমার ক্ষেত্রে এগুলো হেগেলবাদ এবং বিষয়ীর দার্শনিক পরিচয়ের গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসার উপায়ের যোগান দিয়েছিল।

ত্রোমবাদোরি: আপনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 'বিয়োগান্তক অভিজ্ঞতা'-র কথা বলছিলেন, আর বলছিলেন সেই অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে দার্শনিক পরম্পরার চিন্তাকাঠামোগুলোর মৌলিক অপারগতার কথা। কিন্তু জাঁ-পল সার্ত্রের ভাবনাকে আপনি সেই অপারগতার সীমার মধ্যে রাখতে চাইছেন কেন? তিনি কি অস্তিত্ববাদের প্রতিনিধিত্ব করেন না, আর, বিশেষ করে ফ্রান্সে, তিনি কি তাত্ত্বিক পরম্পরার বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহের প্রতিনিধি নন, স্বসময়ের সাপেক্ষে বুদ্ধিজীবীর অবস্থানের পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা কি তিনি করেননি?

ফুকো: সার্ত্রের মতো কোনও দর্শনে, বিষয়ীই জগতের অর্থ প্রদান করে। এই বিষয়টিকে প্রশ্নের ঊর্ধ্বে রাখা হয়। বিষয়ীই দ্যোতনা প্রদান করে। কিন্তু প্রশ্নটা হল: এমনটা কি বলা যায় যে বিষয়ীই হল অস্তিত্বের একমাত্র রূপ? এমন অভিজ্ঞতা কি হতে পারে না যে অভিজ্ঞতার পর্বে বিষয়ীকে তার স্বয়ংয়ের সঙ্গে অভিন্ন করে রাখা বিধিগত গঠনসম্পর্ক হিসেবে আর বিষয়ী হাজির হয় না? এমন অভিজ্ঞতা কি হতে পারে না যেখানে বিষয়ী তার স্বয়ং থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে, তার স্বয়ংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে, নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলতে পারে? নিৎশের চিরায়ত পুনরাবৃত্তির অভিজ্ঞতার নির্যাসটাই কি তাই নয়?

ত্রোমবাদোরি: যে লেখকদের কথা আপনি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছেন, তাছাড়া আরও কারা সেই সময় নিৎশের কাজ নিয়ে লিখছিলেন বা ভাবছিলেন?

ফুকো: নিৎশেকে আবিষ্কার ঘটেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার বাইরে। নাজিরা যেভাবে নিৎশেকে ব্যবহার করেছিল, তার জন্য বিদ্যায়তনিক পাঠক্রম থেকে নিৎশেকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলা হয়েছিল। অন্যদিকে, দার্শনিক চিন্তাধারার একধরনের অবিচ্ছিন্ন পাঠ, আর ইতিহাসের দর্শন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে হেগেলবাদ ও অস্তিত্ববাদের এক ধরনের মিশ্রণ ছিল দস্তুর। আর, সত্যি বলতে গেলে, মার্কসবাদী সংস্কৃতিও এই ইতিহাসের দর্শনই গ্রহণ করেছিল।

ত্রোমবাদোরি: এতক্ষণ পর আপনি অবশেষে মার্কসবাদ ও মার্বসবাদী সংস্কৃতির উল্লেখ করলেন, যেনবা তা সেসময় বড় মাত্রায় হাজির ছিল না—কিন্তু তা বলা যায় বলে তো আমার মনে হয় না।

ফুকো: আমি মার্কসবাদী সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা আরও কিছুটা পরে করতে চাইব। এখনকার জন্য শুধু একটি কৌতূহলী বিষয় উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। আমাদের ক্ষেত্রে নিৎশে বা বাতাই নিয়ে উৎসাহের মানে মার্কসবাদ বা কম্যুনিজম থেকে দূরে সরে যাওয়া ছিল না, বরং, কম্যুনিজম বলতে আমাদের প্রত্যাশায় যা ছিল, তার দিকে যাওয়ার একমাত্র পথ হিসেবেই আমরা তাকে নিয়েছিলাম। যে জগতে আমরা বাস করছিলাম তাকে যেভাবে আমরা প্রত্যাখ্যান করছিলাম তা হেগেলিয় দর্শনে সন্তুষ্ট হতে পারছিল না।

আমরা অন্য পথ খুঁজছিলাম। কম্যুনিজমের মধ্যে সম্পূর্ণত অন্যতর যে বাস্তবতা নিহিত আছে বলে আমরা মনে করতাম তাতে পৌঁছানোর অন্য কোনও পথ আমরা খুঁজছিলাম। সেইজন্যই ১৯৫০ সালে, মার্কস খুব ভালোভাবে না পড়েই হেগেলবাদকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে অস্বস্তি নিয়ে আমি ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে পেরেছিলাম। 'নিৎশেবাদী কম্যুনিস্ট' হওয়া সত্যিই অসঙ্গতিপূর্ণ ও হয়তবা উদ্ভটও বটে— সে সম্পর্কে আমি ভালোই সচেতন ছিলাম।

ত্রোমবাদোরি: আপনি পি সি এফ (ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টি)-য়ে নাম লেখালেন। একটি অপ্রচলিত যাত্রাপথ ধরে আপনি কম্যুনিস্ট পার্টিতে এসে পৌঁছলেন। এই অভিজ্ঞতা আপনার উপর এবং আপনার তাত্ত্বিক গবেষণা-কাজের উপর কী প্রভাব ফেলেছিল? একজন কম্যুনিস্ট যোদ্ধা হিসেবে আপনার কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল? কীভাবেই বা আপনি তারপর পার্টি ত্যাগ করার সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন?

ফুকো: ফ্রান্সে তরুণ বয়স্কদের ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে ঢোকা ও তার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনাগুলো ঘটেছিল খুব দ্রুতলয়ে— এতটাই দ্রুতলয়ে যে এই ঢোকা ও বেরনোর ঘটনাগুলো কোনও গুরুত্বপূর্ণ ছেদের মুহূর্ত হিসেবেও অভিজ্ঞতায় ধরা দেয়নি। আমি পার্টি ছেড়েছিলাম ১৯৫২-র শীতকালে স্তালিনের বিরুদ্ধে চিকিৎসকদের ষড়যন্ত্রের কুখ্যাত প্রচারটি শুরু হওয়ার পর। এক নাছোড় অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ ছিল এই পার্টি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ। স্তালিনের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে এই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে ইহুদি চিকিৎসকদের একটা গোষ্ঠী স্তালিনকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র কার্যকরী করার চেষ্টা করেছে। পার্টির মধ্যে আমাদের ছাত্র-সেল-য়ের বৈঠকে আন্দ্রে উর্মসের ব্যাখ্যা করলেন কীভাবে ওই ষড়যন্ত্র নাকি চালানো হয়েছিল। আমাদের মন অবিশ্বাসে খচখচ করলেও আমরা সেই গল্প বিশ্বাস করার জন্য খুব চেষ্টা করেছিলাম।

পার্টির মধ্যে থাকার বিপর্যয়জনক রীতিনীতির এও একটা দিক। যা তোমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য, তার সম্পূর্ণ বিপরীত কিছুকে সত্য বলে ধরে নেওয়ার এই চর্চা এক বৃহত্তর চর্চার অঙ্গ। সেই বৃহত্তর চর্চা হল স্বয়ং বা নিজত্বকে ধ্বংস করে সম্পূর্ণ অপর কিছুর সন্ধান করা, যার কথা আমি আগে বলেছি। তারপর স্তালিন মারা গেলেন। তার তিন মাস পর আমাদের

জানানো হল যে চিকিৎসকদের ষড়যন্ত্র জাতীয় কিছুর অস্তিত্বই ছিল না। আমরা উর্মসেরকে চিঠি লিখে দাবি করলাম যে তিনি আমাদের বৈঠকে পুনর্বার এসে ব্যাখ্যা করে বলুন যে গোটা ব্যাপারটা কী। আমাদের চিঠির কোনও জবাব এল না। আপনি হয়ত বলবেন যে এ তো একটা সাধারণ ব্যাপার, এমন তুচ্ছ ঘটনা যেতে যেতে কতই না ঘটে থাকে... কিন্তু, ঘটনা হল, তখনই আমি পার্টি ছেড়েছিলাম।

ব্রোমবাদোরি: আমার মনে হয়, আপনি যে ঘটনার কথা বললেন তা মূলগতভাবে অতীত চিত্রনাট্য থেকে একটি অধ্যায়কে তুলে আনছে, ঘটনাটি বিয়োগান্তক কিন্তু তার একটা প্রেক্ষাপট আছে: শীতল যুদ্ধ, স্তালিনবাদের বাড়াবাড়ি, মতবাদ ও রাজনীতির মধ্যে এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক, পার্টি ও তার যোদ্ধাদের মধ্যেও এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক। এমনই নানা পরিস্থিতিতে, হয়ত বা আরো খারাপ পরিস্থিতিতেও, অন্য ব্যক্তিরা এসবকিছু সত্ত্বেও পার্টি ছেড়ে যায়নি, পার্টির ভিতরে থেকেই সংগ্রাম ও সমালোচনা চালিয়ে যাওয়ার পথ বেছে নিয়েছেন। আমার মনে হয় না যে আপনার নেওয়া পথটাই সবচেয়ে ভালো ছিল।

ফুকো: আমি বুঝতে পারছি যে সব কম্যুনিস্টদের হাতে আমি এমন রসদ তুলে দিচ্ছি যা ব্যবহার করে তারা দেখাতে চাইবে যে আমি অতি নিকৃষ্ট ধরনের কম্যুনিস্ট ছিলাম, কম্যুনিজমের প্রতি আমি অতি ভুলভাল বাজে কারণে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, দূষিত পাতি-বুর্জোয়াদের এমনই হয়! কিন্তু তবু আমি একথাগুলোই বলছি কারণ এটাই সত্য ছিল এবং আমি নিশ্চিত যে এমন পরিস্থিতিতে পড়া এবং এমন অভিজ্ঞতা কেবল আমার একার হয়নি। বাজে কারণে পার্টিতে যোগ দেওয়া, রূপান্তরের জন্য নিজেকে সঁপে দেওয়া, কঠোর কৃচ্ছসাধন, নিজেকে নিজে চাবুক মারা— আজও এগুলো কম্যুনিস্ট পার্টির কাজে অংশ নেওয়া বহু ছাত্রছাত্রীর অভিজ্ঞতার গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে আছে। এমন বুদ্ধিজীবীদের আমি দেখেছি যারা টিটো-কাণ্ডের (স্তালিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্দেশিত পথের বাইরে বিকল্প পথ তৈরির জন্য যুগোশ্লাভ কম্যুনিস্ট নেতা টিটোর উদ্যোগ ও তজ্জনিত সংঘাত— অনুবাদক।) সময়ে পার্টি ছেড়েছেন। আবার এমন অনেককেও জানি যারা ঠিক ওই সময়ে এবং ঠিক ওই কারণেই পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। আর, তাছাড়াও মোহভঙ্গ হয়ে পার্টির সদস্য-কার্ড ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের

জবাব দেওয়ার একটা উপায় হিসেবেও কাউকে কাউকে আমি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে দেখেছি।

ত্রোমবাদোরি: কমুনিস্ট পার্টির ভিতরে থাকার এই স্বল্পস্থায়ী অভিজ্ঞতার পর আপনি কি আর কোনও রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নেননি?

ফুকো: না, আমি আমার পড়াশোনা শেষ করেছিলাম। সেই পর্যায়ে, আমি লুই আলথুজারের সঙ্গে অনেক মেলামেশা করেছিলাম। লুই আলথুজার তখনও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে সক্রিয় ছিলেন। বলা যায় একপ্রকার তাঁর প্রভাবেই আমি পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম। আমি যখন পার্টি ছেড়ে দিলাম, তিনি আমার প্রতি কোনও বিরূপ মনোভাব পোষণ করেননি। পার্টি ছাড়ার জন্য তিনি কখনই আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাননি।

ত্রোমবাদোরি: আলথুজারের সঙ্গে আপনার বন্ধন, বা অন্তত এক ধরনের বৌদ্ধিক আত্মীয়তার উৎস সাধারণভাবে যা ভাবা হয় তার চেয়ে অনেক গভীর। যা নিয়ে আমি বিশেষ করে আলোচনা করতে চাই তা হল এই যে ১৯৬০-য়ের দশকের ফ্রান্সের তত্ত্বজগতে প্রাধান্য বিস্তার করা অবয়ববাদ (structuralism) সংক্রান্ত বিতর্কে আলথুজারের সঙ্গে সংযুক্ত করে আপনার নাম বহুবার উচ্চারিত হয়েছিল। আলথুজার মার্কসবাদী ছিলেন, আপনি তা ছিলেন না, ক্লদ লেভি-স্ত্রস ও অন্যান্যরাও তা ছিলেন না, কিন্তু সমালোচনায় আপনাদের সবাইকেই কমবেশি 'অবয়ববাদী' অভিধার মধ্যে ফেলা হতো। আপনি কীভাবে এর ব্যাখ্যা করবেন? আর আপনাদের গবেষণার যদি কোনও সাধারণ ভিত্তি থেকে থাকে, তাহলে সেটাই বা কী?

ফুকো: লেভি-স্ত্রস ছাড়া বাকি আর যাদেরকে 'অবয়ববাদী' তকমা দিয়ে আসা হয়েছে, যদিও তাঁরা তা নন, তাঁরা হলেন আলথুজার, জাক লাকাঁ আর আমি নিজে। আমাদের মধ্যে একটা সাধারণ দিক ছিল। সেই সাধারণ দিকটা বাস্তবে কী? সেই সাধারণ দিকটা হল বিষয়ীর প্রশ্নটিকে ভিন্নতর ভাবে তোলার এক নাছোড় তাগিদ— সেই দেকার্তের সময় থেকে ফরাসী দর্শন যে মৌল স্বীকার্যকে আর কখনওই ত্যাগ করেনি, এমনকি প্রতীতিবাদও যাকে আরও প্রোথিত করেছে, সেই মৌল স্বীকার্যের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করার তাগিদ। মনোসমীক্ষণের পরিপ্রেক্ষিত থেকে লাকাঁ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে অবচেতনার তত্ত্বের সঙ্গে বিষয়ীর তত্ত্ব (সে দেকার্তিয় রূপেই ধরা হোক বা

প্রতীতিবাদের দেওয়া রূপে ধরা হোক) খাপ খায় না। সার্ত্র আর জর্জ পোলিতজার মনোসমীক্ষণকে বরখাস্ত করেছিলেন ঠিক এই জায়গাটার জন্যই, তাঁরা অবচেতনার তত্ত্বকে সমালোচনা করেছিলেন এই বিচার থেকে যে তা বিষয়ীর তত্ত্বের সঙ্গে বেমানান। উল্টোদিকে লাকাঁ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে বিষয়ীর দর্শনকে পরিত্যাগ করে অচেতনার কলকৌশলের বিশ্লেষণ থেকে আবার শুরু করা উচিত। ভাষাতত্ত্ব— ভাষাকে বিশ্লেষণ করার সম্ভাব্য উপায় সকল— আর লেভি-স্ত্রস-য়ের কাজ অনুসন্ধানের এই নতুন ধারাকে যৌক্তিক হাতিয়ার যুগিয়েছিল, আর তা ব্লাঁসো আর বাতাইয়ের মতো সাহিত্যিক বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার চেয়ে ভিন্নতর কিছুর উপর ভিত গড়েছিল। আলথুজার বিষয়ীর দর্শন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কারণ প্রতীতিবাদ ও মানবতাবাদের উপাদানের সঙ্গে ফরাসী মার্কসবাদ আষ্টেপৃষ্ঠে বোনা ছিল, আর অনন্বয়ের তত্ত্ব (theory of alienation) মনুষ্য বিষয়ীকে সেই তাত্ত্বিক দৃষ্টান্তের রূপ দিয়েছিল যে মার্কসীয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে দার্শনিক অভিব্যক্তিতে ব্যক্ত করতে পারে। আলথুজারের কাজ ছিল মার্কসের বিশ্লেষণকে পুনর্বিচার করা, মনুষ্য প্রকৃতি, বিষয়ী ও পরকীকৃত মানুষ সম্পর্কে যে ধারণাগুলোর উপর রজার গারাউদি-র মতো কিছু কিছু মার্কসবাদী তাত্ত্বিক তাঁদের সূত্রায়নের ভিত্তি দাঁড় করিয়েছিল তা মার্কসীয় বিশ্লেষণের অনুগত কি না তা বিচার করা। আমরা জানি যে এই শেষ প্রশ্নের উত্তর হল: 'সম্পূর্ণভাবেই না'।

এই সমস্ত কিছুকেই 'অবয়ববাদ' বলা হয়েছিল। কিন্তু সঠিক অর্থে ধরলে, অবয়ববাদ বা অবয়ববাদী পদ্ধতি আসলে আরও বৈপ্লবিক একটি প্রকল্পের অংশ মাত্র, সেই বৈপ্লবিক প্রকল্প হল বিষয়ীর তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন।

ত্রোমবাদোরি: আপনি অবয়ববাদের সংজ্ঞাকে অপর্যাপ্ত অভিধা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেন। আপনি 'বিষয়ীকে কেন্দ্রচ্যুত করা'-কে বিষয় করে বলতে পছন্দ করেন। এর মধ্য দিয়ে আপনি নিৎশে থেকে জর্জ বাতাই অবধি প্রসারিত পরম্পরার উল্লেখ করে এক ধরনের সীমান্তবর্তী অভিজ্ঞতার কথা বিশেষ করে বলে থাকেন। কিন্তু তবু তো এটা অস্বীকার করা যায় না যে আপনার চিন্তা এবং আপনার তাত্ত্বিক প্রতর্কের পরিণত রূপ নেওয়ার পর্বের একটা বড় অংশ জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) এবং বিজ্ঞানের দর্শনের সমস্যার বিশ্লেষণ ও বিচারের মধ্য দিয়ে যাত্রায় অতিবাহিত হয়েছে।

ফুকো: তা সত্যি। বিজ্ঞানসমূহের ইতিহাস নিয়ে যে পাঠচর্চায় আমি নিজেকে নিয়োজিত করতে শুরু করি তার থেকে বাতাই, ব্লাঁশো ও নিৎশে-র মধ্যে আমি যা দেখেছিলাম তার দূরত্ব অনেক। কিন্তু ঠিক কতটা এই দূরত্ব? আমার ছাত্রাবস্থায় সকল তাত্ত্বিক বিতর্ক সহ বিজ্ঞানসমূহের ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিল।

প্রতীতিবাদের একটা গোটা ধারাই বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের ভিত্তি, বিজ্ঞানের যুক্তিসংগতি ও বিজ্ঞানের ইতিহাসকে প্রশ্ন করে গড়ে উঠেছিল। প্রতীতিবাদের অপর দিক গড়ে উঠেছিল এডমুন্ড হুসেরল, আলেকজাঁদ্রে কোয়রি-দের গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলোকে ঘিরে এবং এই দিকটি যাপিত অভিজ্ঞতার তুলনায় বেশি অস্তিত্ববাদী প্রতীতিবাদের বিপরীতে অবস্থান করছিল। নানা দিক থেকেই, মার্লো-পন্টির কাজ ছিল প্রতীতিবাদের এই দুটো দিককে আবার একই সঙ্গে ধরার প্রচেষ্টা।

আবার, যে মাত্রায় ফ্রান্সের উপর নাজি দখল সরে যাওয়ার পর থেকে মার্কসবাদ কেবলমাত্র একটি তাত্ত্বিক পরিসরের বস্তু হিসেবে নয়, বরং ছাত্রছাত্রী ও বুদ্ধিজীবীদের দৈনিক জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করেছিল, সেই মাত্রাতেই সমগোত্রীয় এক প্রতীতি মার্কসবাদী মহল থেকেও উঠে আসছিল। বস্তুত মার্কসবাদ নিজেকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে হাজির করেছিল, বা অন্তত বিজ্ঞানসমূহের বৈজ্ঞানিক চরিত্র সম্পর্কে এমন এক সাধারণ তত্ত্ব হিসেবে নিজেকে হাজির করেছিল যা একপ্রকার যুক্তির বিচারশালা হিসেবে কাজ করবে, কোনটা বিজ্ঞান ও কোনটা মতবাদ তার পার্থক্যীকরণ বা বিচার করবে। সংক্ষেপে বললে, যে কোনও রূপের জ্ঞানের যুক্তিসংগতি বিচারের সাধারণ বিচারনীতি হিসেবে মার্কসবাদ নিজেকে হাজির করেছিল।

সমস্যা ও বিচারকাজের এই খিচুড়ি মানুষকে বিজ্ঞান ও তার ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন তোলার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কতটা দূর অবধি বিজ্ঞানের ইতিহাসকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো যায়, বা, এটা কতটা ঠিক যে বিজ্ঞান পুরোমাত্রায় যুক্তিসংগতির উপর ভিত্তিস্থাপন করেই দাঁড়িয়ে আছে? এই প্রশ্নটিই বিজ্ঞানসমূহের ইতিহাসচর্চা প্রতীতিবাদের সামনে উত্থাপন করেছিল। আর মার্কসবাদ নিজেকে এই প্রশ্ন করেছিল: সমাজের ইতিহাসের জন্য একটা নতুন কাঠামো তৈরি করার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ কতটা মাত্রায় বিজ্ঞানসমূহের ইতিহাস সম্পর্কেও বলে দিতে পারে, গণিত বা তাত্ত্বিক

পদার্থবিদ্যা বা তেমনই কোনও বিজ্ঞানশাখার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বলতে পারে?

বিজ্ঞানসমূহের ইতিহাস, প্রতীতিবাদ ও মার্কসবাদের মুখোমুখি দাঁড়ানোর জায়গা হয়ে ওঠা সমস্যাসমূহের এই ঘননিবদ্ধ যে অঞ্চলের একটা রূপরেখা মাত্র আমি হাজির করলাম, তা তখন কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল, এমন এক আতসকাচ হয়ে উঠেছিল যার মধ্য দিয়ে সেই সময়পর্বের বিভিন্ন সমস্যার প্রতিসরণ ঘটত। এই জায়গাতেই আমার চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় এবং আমার অধ্যাপক লুই আলথুজার এবং জাঁ-তুস্যাঁ দেসান্তি-র মতো মানুষরা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন।

ত্রোমবাদোরি: বিজ্ঞানসমূহের ইতিহাসকে ঘিরে চলা সমস্যাবিচার আপনার বিকাশে কী ভূমিকা নিয়েছিল?

ফুকো: শুনতে হয়তো কূটাভাসের মতো মনে হবে, কিন্তু সত্য এটাই যে নিৎশে, ব্লাঁশো ও বাতাই যে ভূমিকা নিয়েছিল, বিজ্ঞানসমূহের ইতিহাসকে ঘিরে সমস্যাবিচারও কমবেশি সেই ভূমিকাই নিয়েছিল। একটা পক্ষ প্রশ্ন করছিল যে কোনও বিজ্ঞানের ইতিহাস কতটা দূর অবধি তার যুক্তিসংগতিকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে, তার সীমা নির্দেশ করতে পারে বা বহিঃস্থ উপাদানের সঙ্গে তার গ্রন্থিগুলোকে দেখাতে পারে। বিজ্ঞানের একটি ইতিহাস আছে ও বিজ্ঞান ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত একটি সমাজে বিকশিত হয় বলে যদি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে অনির্ধারিত বা শর্তসাপেক্ষ প্রভাব এমন কী হতে পারে যা বিজ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করে? এর পিছু পিছু অন্যান্য প্রশ্নও হাজির হয়। বিজ্ঞানের কি কোনও যুক্তিসংগতিপূর্ণ ইতিহাস হতে পারে? এমন কোনও বোধগম্যতার নীতি কি খুঁজে বের করা যায় যা বিজ্ঞানের বিভিন্ন পথ-বদলকে ব্যাখ্যা করতে পারে আর বিজ্ঞানসমূহের ইতিহাসের মধ্যে কখনও কখনও নিঃসাড়ে জায়গা করে নেওয়া যুক্তিরহিত উপাদানগুলোরও ব্যাখ্যা হাজির করতে পারে?

মোটাদাগে বললে, মার্কসবাদ ও প্রতীতিবাদ উভয়ক্ষেত্রেই এই প্রশ্নগুলোই তোলা হয়েছিল। আমার নিজের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রশ্নগুলো কিছুটা ভিন্ন পথ ধরে হাজির হয়েছিল। এখানেই নিৎশে-পাঠ আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যুক্তিসংগতির ইতিহাস রচনাই যথেষ্ট মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল যে স্বয়ং সত্যেরই ইতিহাস রচনা করতে হবে। অর্থাৎ, কী

মাত্রায় একটি বিজ্ঞানের ইতিহাস তাকে সত্যের আরো কাছে নিয়ে এসেছে (বা অন্যথায়, সত্যের কাছে পৌঁছানোর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে) সেই প্রশ্ন একটি বিজ্ঞানের কাছে করার চেয়ে বরং নিজেকে এই কথাটি বলা কি জরুরী নয় যে জ্ঞান তার নিজের সঙ্গে যে প্রতর্ক জারি রাখে সেই প্রতর্কের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যেই সত্য গঠিত হয়? আর সেই সম্পর্কটি নিজেই কোনও ইতিহাস কিনা বা সেই সম্পর্কের নিজের কোনও ইতিহাস আছে কিনা, প্রশ্নটা কি এখানেই করা উচিত নয়?

খুবই উল্লেখযোগ্য বলে আমার মনে হয়েছিল যে নিৎশের মতে, কোনও বিজ্ঞান, কোনও চর্চা বা কোনও প্রতর্কের যুক্তিসংগতি সেই বিজ্ঞান বা চর্চা বা প্রতর্ক কী সত্য উৎপাদন করতে পারে তার দ্বারা মাপা যায় না। সত্য নিজেই প্রতর্কের ইতিহাসের একটি অংশ মাত্র। সত্য হল কোনও প্রতর্ক বা কোনও চর্চার আভ্যন্তরীণ একটি প্রভাবের মতো।

ব্রোমবাদোরি: সত্যের ইতিহাস এবং মনুষ্যসৃষ্ট তত্ত্বের সীমা বিষয়ে নিৎশের প্রতর্ক সন্দেহাতীতভাবেই প্রথামাফিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় পরিপ্রেক্ষিত ও দৃষ্টিকোণের একটি পরিবর্তনের কথা বলে, বিশেষত যদি আমরা খেয়াল করি যে 'জানার অসত্যতা' সম্পর্কে তাঁর মৌল ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি প্রথামাফিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির চারণভূমিটিকেই নাকচ করেছেন। কিন্তু আমি চাই যে আপনি আমাকে বলুন কীভাবে আপনি বিজ্ঞানের উদ্ভব সম্পর্কে বিশ্লেষণকে সীমান্তবর্তী অভিজ্ঞতা বা রূপান্তরসাধন হিসেবে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করলেন।

ফুকো: বিজ্ঞানকে কি মূলগতভাবে একটা অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ, এমন একটা সম্পর্ক যেখানে বিষয়ী তার সেই অভিজ্ঞতার দ্বারা রূপান্তরিত হয়, সেই হিসেবে ভাবা বা বিশ্লেষণ করা যায় না? অন্যভাবে বললে, বৈজ্ঞানিক চর্চা উভয়তই ভূমিকা নেবে— তা ভূমিকা নেবে বিজ্ঞানের আদর্শ বিষয়ী হিসেবে, আবার ভূমিকা নেবে জ্ঞানের বিষয় হিসেবে। আর জ্ঞানের বিষয়ী ও বিষয়ের সেই পারস্পরিক উদ্ভবের মধ্যেই কি বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক শিকড় সেঁধিয়ে নেই? সত্যের কী প্রভাব সেই উপায়ের মধ্য দিয়ে উৎপাদিত হয়? এর মানে হল যে সত্য এক এবং একমেবাদ্বিতীয়ম নয়। তার মানে আবার এমনটা নয় যে ইতিহাস হল যুক্তিরহিত আর বিজ্ঞান হল ভ্রমাচ্ছন্ন। বরং, তা একটি বাস্তব ও বোধগম্য ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠা করে। তা এমন এক সারি

যুক্তিসংগত যৌথ অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠা করে যারা একগুচ্ছ যথাযথ ও সনাক্তকরণযোগ্য বিধির অনুসারী হয় এবং যাদের ফলস্বরূপ জ্ঞানআহরণকারী বিষয়ী ও জ্ঞাতব্য বিষয় উভয়ের নির্মাণ সম্পন্ন হয়।

আমার মনে হয়েছিল যে এই প্রক্রিয়াকে বোঝার সবচেয়ে ভালো উপায় হল সেই সমস্ত নতুন, অবিধিবদ্ধ বিজ্ঞানগুলোকে নিরীক্ষণ করা যেগুলো তুলনায় সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখনও তাদের উদ্ভাবস্থা ও আশু জরুরী প্রয়োজনীয়তার বেশি কাছাকাছি রয়েছে। এই নতুন, অবিধিবদ্ধ বিজ্ঞানগুলোর বৈজ্ঞানিক চরিত্র সবচেয়ে বেশি অনিশ্চয়তাপূর্ণ হয়ে প্রতিভাত হয় এবং যুক্তিসংগতির পরিসরে ঠাঁই পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম উপযুক্ত বিষয়গুলোকে তারা বুঝতে চায়। যেমনটা ছিল উন্মত্ততার ক্ষেত্রে। এখানে বোঝার ছিল যে পাশ্চাত্য জগতে মাত্র আঠারো শতক থেকে উন্মত্ততা কীভাবে বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার একটি যথাযথ বিষয় হয়ে উঠতে পেরেছে, যখন তার আগের কালে চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত নিবন্ধ ঢুঁড়ে 'মনের রোগ' নিয়ে গুটিকয় নাতিদীর্ঘ অধ্যায়ের বেশি কিছু পাওয়া যায় না। এখানে দেখানো সম্ভব যে উন্মত্ততা নামক এই বিষয়টি যখন রূপ পরিগ্রহ করছিল, ঠিক তখনই উন্মত্ততাকে বুঝতে সক্ষম বিষয়ীকেও নির্মাণ করা হচ্ছিল। উন্মত্ততাকে একটা বিষয় হিসেবে নির্মাণের অনুরূপভাবেই একইসঙ্গে নির্মাণ করা হচ্ছিল একটি যুক্তিচালিত বিষয়ীকে যে উন্মত্ততা সম্পর্কে জ্ঞাত এবং যে উন্মত্ততাকে বোঝে। 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' বইয়ে আমি এই ধরনের যৌথ অনেকান্ত অভিজ্ঞতাকেই বোঝার চেষ্টা করেছিলাম যা ষোল শতক থেকে উনিশ শতকের মাঝে আকার নিয়েছিল এবং যার মধ্যে দুটি উদ্ভবের প্রক্রিয়ার পারস্পরিক ক্রিয়া সংগঠিত হয়েছিল। এই দুটি উদ্ভবের প্রক্রিয়ার একটি হল উন্মত্ততাকে চিনতে ও বুঝতে সক্ষম এক যুক্তিচালিত মানুষের উদ্ভবের প্রক্রিয়া, আর অন্যটি হল জ্ঞাতব্য ও নির্ধারণযোগ্য একটি বস্তু হিসেবে স্বয়ং উন্মত্ততার উদ্ভবের প্রক্রিয়া।

ত্রোমবাদোরি: যুক্তি এবং অযুক্তির মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিরোধ চিহ্নিতকারী যে প্রতিষ্ঠাকাজ, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নিয়তির উপর যার প্রভাব আপনি নিজে বিশ্লেষণ করেছেন, তা যেন ঐতিহাসিক বিকাশের, বা ইতিহাসের বিকাশের, আধুনিক যুক্তির বিকাশের একটি আবশ্যকীয় প্রাথমিক শর্ত বলে মনে হয়। ইতিহাসের সম্ভাব্যতাকে উন্মুক্ত করে দেওয়া এই সীমান্তবর্তী অভিজ্ঞতা কি

সময়-নির্বিশেষ মাত্রা গ্রহণ করে ইতিহাসেরই বাইরে হিসেবে নিজেকে হাজির করে না?

ফুকো: বলার অবকাশ রাখে না যে আমার কাজের মধ্যে উন্মত্ততাকে নিয়ে কোনও রকম উদযাপন ছিল না। আর তা অযুক্তিবাদী বা যুক্তিরহিতবাদী ইতিহাসও ছিল না। বরং, আমি দেখাতে চেয়েছিলাম কীভাবে এই অভিজ্ঞতাকে (উন্মত্ততাকে বিষয় হিসেবে নির্মাণ করেছে এবং একইসঙ্গে সেই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত বিষয়ীকেও নির্মাণ করেছে যে অভিজ্ঞতা) সুপরিচিত কিছু বিশেষ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে না দেখলে পুরোপুরি বোঝা যাবে না। সেই সুপরিচিত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলো হল: এক ধরনের স্বাভাবিকীকরণকারী (normalizing) সমাজের জন্ম, তার সঙ্গে যুক্তভাবে বন্দি করে রাখার প্রচলন, নগরায়নের পর্বের বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট, পুঁজিবাদের জন্ম, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ভেসে বেড়ানো জনসমষ্টির উপস্থিতি যা আবার অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের নয়া প্রয়োজনীয়তার পক্ষে অসহ।

সুতরাং আমি একটা ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছিলাম, এমন একটা ইতিহাস যা যথাসম্ভব যুক্তিসংগত হবে। আর যা সম্পর্কে সেই ইতিহাস তা হল: একটি জ্ঞান (savoir)-য়ের নির্মাণ, বস্তুতান্ত্রিকতার এক নতুন সম্পর্কের নির্মাণ, এমনকিছুর নির্মাণ যাকে 'উন্মত্ততা সংক্রান্ত সত্য' বলা যেতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই, এর মানে এমন নয় যে এই নতুন ধরনের জ্ঞান ব্যবহার করে প্রকৃতই মানুষ উন্মত্ততাকে তার সত্যতায় উন্মোচিত করার মতো বিচারনীতি বা নির্ণায়ক হাজির করতে পেরেছিল। না, তা পারেনি। বরং তারা যা করেছিল তা হল কার্যকরী জ্ঞানের সম্ভাব্যতার সঙ্গে যুক্ত করে উন্মত্ততার সত্যতা সম্পর্কিত একটা অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত করা, জ্ঞানকে জানতে পারে এমন বিষয়ীর আদল দেওয়া এবং জানার চর্চা করা।

ত্রোমবাদোরি: এই মুহূর্তে একটু পিছনে ফিরে যাওয়া যাক। আপনার নিজের বৌদ্ধিক গঠনপর্বের আলোচনায়, বিশেষ করে তখনকার জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যাবলীর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার সময় আপনি গাস্তঁ বাখেলার্ড-য়ের নাম একবারও উল্লেখ করেননি। কিন্তু অন্য অনেকে বলেছেন এবং আমার মনে হয় সঠিকভাবেই বলেছেন, যে নিজ বিশ্লেষণের বস্তুটিকে নির্মাণে সক্ষম একটি বৈজ্ঞানিক প্রয়োগচর্চার শ্রেষ্ঠত্বের উপর ভিত্তি করা বাখেলার্ডের

যুক্তিসংগত বস্তুবাদ আপনার গবেষণার বিকাশপথের এক ধরনের পশ্চাদপট তৈরি করেছে। আপনি কি তা মনে করেন না?

ফুকো: আমি কখনও প্রত্যক্ষভাবে বাখেলার্ডের ছাত্র ছিলাম না, তবে আমি তাঁর বইগুলো পড়েছি। বিজ্ঞানসমূহের ইতিহাসে ছেদ বা অসন্ততা সম্পর্কে তাঁর ভাবনার মধ্যে এবং নিজ বিশ্লেষণের বস্তুদের গঠন করার মুহূর্তে নিজের উপর যুক্তির শ্রমকার্যের ধারণার মধ্যে গোটা এক সারি এমন উপাদান ছিল যা আমি সেখান থেকে নিয়ে নিজের মতো করে আদল দিয়েছি।

কিন্তু বিজ্ঞানের দর্শনের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আমার উপর সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন, তিনি হলেন জর্জ ক্যাঙ্গুয়িলহেম, যদিও তা বেশ কিছুটা পরবর্তী পর্বে ঘটেছিল। আর সবকিছুর থেকে বেশি করে তিনি জীবনবিজ্ঞানের সমস্যাগুলোকে আরো গভীরতা প্রদান করেছিলেন। জীবিত প্রাণী হিসেবে মানুষ কীভাবে সেই অভিজ্ঞতায় নিজেকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় তা দেখানোর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ক্যাঙ্গুয়িলহেম তা করেছিলেন।

জীবন সম্পর্কে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা এবং একইসঙ্গে এক ধরনের আত্মজ্ঞান তৈরি করার মধ্য দিয়ে মানুষ প্রাণী হিসেবে নিজেকে বদলে ফেলেছিল। এই বদল ঘটেছিল এমন এক যুক্তিচালিত বিষয়ীর চরিত্র গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে যে বিষয়ী নিজে নিজের উপর ক্রিয়া করার, নিজের জীবনশর্তগুলোকে বদলে দেওয়ার ও নিজের জীবনকেও বদলে দেওয়ার ক্ষমতা ধরে। মানুষ এমন এক জীববিদ্যা নির্মাণ করল যা আসলে মনুষ্য প্রজাতির সাধারণ ইতিহাসে জীবনবিজ্ঞানসমূহের অন্তর্ভুক্তির ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়ে। এইটি ক্যাঙ্গুয়িলহেমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। আমার বিশ্বাস যে ক্যাঙ্গুয়িলহেম নিৎশের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা স্বীকার করেন। আর কূটাভাস বলে মনে বলেও এভাবেই আবশ্যিকভাবে নিৎশেকে ঘিরে এক ধরনের সঙ্গমবিন্দু পাওয়া যায় যেখানে দুটি প্রতর্ক আত্মীয়তার সম্পর্কে স্থিত। এই দুটি প্রতর্কের একটি হল বিষয়ীর নিজে নিজেকে রূপান্তরিত করার বিষয়সূচক সীমান্তবর্তী অভিজ্ঞতার প্রতর্ক, আর অন্যটি হল জ্ঞান নির্মাণের মধ্য দিয়ে বিষয়ীর নিজে নিজেকে রূপান্তরিত করার প্রতর্ক।

ত্রোমবাদোরি: একভাবে ধরলে, যুক্তির গঠিত হওয়ার পূর্ববর্তী হল সীমান্তবর্তী অভিজ্ঞতা। আর উল্টোদিকে জ্ঞান ('savoir') সাংস্কৃতিক

দিগন্তের ঐতিহাসিক সীমাকে সংজ্ঞাত করে বলে বলা যায়। এই দুইয়ের মধ্যে কীভাবে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হল বলে আপনার মনে হল?

ফুকো: 'savoir' শব্দটি (আক্ষরিক অর্থ: জ্ঞান) আমি ব্যবহার করি যখন 'connaissance' শব্দটি (এরও আক্ষরিক অর্থ: জ্ঞান) থেকে তার পার্থক্য টানতে চাই। 'savoir'-কে আমি একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখি যে প্রক্রিয়ার দ্বারা যা সে জানছে তার মধ্য দিয়ে বিষয়ী রূপান্তরিত হচ্ছে, বা বলা ভালো, জানার জন্য যা সে করছে সেই কাজের মধ্য দিয়ে বিষয়ী রূপান্তরিত হচ্ছে। বিষয়ীকে রূপান্তরিত করা এবং বিষয়কে নির্মাণ করা এই উভয়ই সম্ভব করে তোলে এই প্রক্রিয়া। অন্যদিকে, 'connaissance' হল সন্ধানকারী বিষয়ীর অপরিবর্তনীয়তা বজায় রেখে জ্ঞাতব্য বস্তুর সংখ্যাবৃদ্ধি করা, তাদের বোধগম্যতাকে প্রতিভাত করা, তাদের যুক্তিসংগতিকে বোঝার কাজ।

প্রত্নশাস্ত্রের ধারণার আসল ব্যাপারটা হল এহেন এক 'connaissance'-র নির্মাণপথকে পুনরাবিষ্কার করা, অর্থাৎ, একটি স্থিরীকৃত বিষয়ীর এবং বিষয়াবলীর একটি পরিসরের মধ্যে সম্পর্ককে তার ঐতিহাসিক শিকড় সমেত পুনরাবিষ্কার করা, 'savoir'-য়ের গতিপথকে ফিরে দেখাই সেই নির্মাণকে সম্ভবপর করে তুলেছিল । এখনও অবধি যে যে বিষয় নিয়ে আমি কাজ করেছি, তার সবগুলোই মূলগতভাবে সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত যার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য সমাজের মানুষরা বস্তু-পরিসর সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করার ও একইসঙ্গে স্থিরীকৃত ও সুনির্দিষ্ট বিষয়ী হিসেবে নিজেদের নির্মাণ করার এইসব মৌল অভিজ্ঞতাগুলো নির্মাণ করেছে। যেমন ধরা যাক, নিজেকে একজন যুক্তিচালিত বিষয়ী হিসেবে নির্মাণ করে উন্মত্ততা সম্পর্কে জানা, নিজেকে একজন জীবিত বিষয়ী হিসেবে নির্মাণ করে রোগব্যাধি সম্পর্কে জানা, নিজেকে একজন শ্রমশীল বিষয়ী হিসেবে নির্মাণ করে অর্থনীতি সম্পর্কে জানা, বা, আইনের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্কে স্থিত হিসেবে নিজেকে জানা...। সুতরাং, নিজের 'savoir'-য়ের ভিতরে সর্বদাই নিজের সঙ্গে এই সংলিপ্ততা থাকে। উন্মত্ততা, মৃত্যু, অপরাধ— এই সীমান্তবর্তী অভিজ্ঞতাগুলোকে মানুষ কীভাবে জ্ঞানের বিষয়ে রূপান্তরিত করেছিল তা বোঝার জন্যই আমি বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলাম। এই ক্ষেত্রেই আবার জর্জ বাতাইয়ের কিছু কিছু ভাবনার মুখোমুখি হতে হয় যদি তাদের আমরা পাশ্চাত্য ও তার 'savoir'-য়ের সমষ্টিগত ইতিহাসে প্রযুক্ত

রূপে দেখি। সবসময়েই প্রশ্নটা ছিল সীমান্তবর্তী অভিজ্ঞতা ও সত্যের ইতিহাসকে নিয়ে। এইসব সমস্যার জটাজালই আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে, বন্দি করেছে। আমি যা বলছি তার কোনও বস্তুগত মূল্য না থাকতে পারে, তবে তা আমার তুলে ধরতে চাওয়া সমস্যাগুলোকে এবং আমার অভিজ্ঞতার ক্রমকে হয়ত কিছুটা আলোকিত করতে পারে।

ত্রোমবাদোরি: আপনার বৌদ্ধিক গঠনপর্বের সাংস্কৃতিক উপাদান সম্পর্কে আরেকটা পর্যবেক্ষণ আমি করতে চাইব। প্রতীতিবাদী নৃতত্ত্ব এবং মনোসমীক্ষণের সঙ্গে প্রতীতিবাদকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা নিয়ে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। আপনার সর্বপ্রথম লেখালেখিগুলোর মধ্যে অন্যতম হল ১৯৫৪ সালে লেখা একটি ভূমিকা। লুডভিগ বিনসোয়ানজার-য়ের বই 'ট্রম উন্ড এগজিসটেনজ' বইয়ের একটা ভূমিকা আপনি লিখেছিলেন। সেই ভূমিকায় আপনি মানুষকে গঠন করতে সাহায্যকারী সর্বপ্রথম পরিসর হিসেবে স্বপ্ন দেখা বা কল্পনাকে ধরে নিয়ে সেই ধারণাকে আরও বিস্তৃত করেছিলেন...

ফুকো: সেই সময়ে আমি যখন মানসিক হাসপাতালগুলোয় কাজ করছিলাম এবং কাজ করতে করতে মনোরোগ চিকিৎসাবিধির প্রচলিত ধাঁচার বাইরে তাদের বিকল্প হিসেবে ভিন্নতর কিছুর খোঁজ করছিলাম, তখন তথাকথিত 'অস্তিত্ববাদী বিশ্লেষণ' বা 'প্রতীতিবাদী মনোরোগ-চিকিৎসা' পাঠ করা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অনুপম ও অতুলনীয় মৌল অভিজ্ঞতা হিসেবে উন্মত্ততার সেই চমৎকার বর্ণনাগুলো যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর আমার বিশ্বাস যে রোলাঁ ল্যাইঙ-ও সেইসব দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন, দীর্ঘকাল ধরে তিনি অস্তিত্ববাদী বিশ্লেষণকেই তাঁর অক্ষ করেছিলেন (তবে তাঁর ভাবনাধারা ছিল অনেক বেশি সার্ত্র-র কাছাকাছি, আর আমারটা হেইডেগারের কাছাকাছি)। কিন্তু আমরা ক্রমে অন্য বিষয়ে সরে আসি। ল্যাইঙ চিকিৎসক হিসেবে তাঁর কাজের সঙ্গে যুক্তভাবে এক বিপুল প্রকল্প গড়ে তুলেছিলেন, ডেভিড কুপার-য়ের সঙ্গে যৌথভাবে তিনিই ছিলেন মনোরোগচিকিৎসা-বিরোধী আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। আর আমি কেবল সমালোচনাত্মক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করছিলাম। কিন্তু অস্তিত্ববাদী বিশ্লেষণ আমাদের গণ্ডি ভেঙে বেরোতে সাহায্য করেছিল এবং প্রাতিষ্ঠানিক বা বিদ্যায়তনিক

মনোরোগ-চিকিৎসাক্ষেত্রের দৃষ্টি ও জ্ঞানব্যবস্থার মধ্যে নিহিত ভারী ও নিপীড়ক উপাদানগুলোকে আরো ভালোভাবে চিনতে সাহায্য করেছিল।

ত্রোমবাদোরি: অন্যদিকে লাকাঁর দেওয়া পাঠকে আপনি কতটা দূর অবধি গ্রহণ ও আত্মস্থ করেছিলেন?

ফুকো: লাকাঁর কাজ থেকে যতটা আমি নিজের জন্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম, তা যে আমায় প্রভাবিত করেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর দেওয়া পাঠে নিমজ্জিত হওয়ার মতো অতটা ঘনিষ্ঠভাবে আমি তাঁকে অনুসরণ করিনি। আমি তাঁর কিছু বই পড়েছিলাম। কিন্তু সবাই জানে যে লাকাঁকে ভালোভাবে বুঝতে হলে কেবলমাত্র তাঁর বই পড়লেই হয় না, বরং তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্য ভাষণগুলো শুনতে হয়, তাঁর আলোচনাসভাগুলোয় অংশ নিতে হয়, হয়তো বা তাঁর কাছে মনোসমীক্ষণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও যেতে হয়। ১৯৫৫ সাল থেকে লাকাঁ যখন তাঁর দেওয়া পাঠের গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যক অংশ প্রকাশ্য ভাষণ বা আলোচনাসভার মধ্য দিয়ে হাজির করতে শুরু করলেন, ততদিনে আমি দেশের বাইরে চলে গেছি।

ত্রোমবাদোরি: আপনি কি বহুদিন ফ্রান্সের বাইরে কাটিয়েছেন?

ফুকো: হ্যাঁ, বহু বছর কাটিয়েছি। একজন সহায়ক, একজন উপাধ্যায় হিসেবে বিদেশে উপসালা, ওয়ারশ এবং হামবুর্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কাজ করেছি। সেটা ছিল আলজেরিয় যুদ্ধের সময়, সেই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমি একরকম বিদেশি হিসেবে পেয়েছিলাম। আর একজন বিদেশির অবস্থান থেকে দেখেছিলাম বলেই, সেই ঘটনাবলীর অসংগতিকে ধরা আমার পক্ষে সহজতর হয়েছিল, সেই যুদ্ধের অনিবার্য পরিণতিকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়াও সম্ভব হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই আমি সেই যুদ্ধের বিরোধী ছিলাম। কিন্তু বিদেশে থাকার ফলে এবং আমার দেশে যা ঘটে চলেছে প্রত্যক্ষভাবে সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত না থাকার ফলে দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্টতা সহজে এলেও আমায় খুব বেশি সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয়নি। আধুনিক ফ্রান্সের অন্যতম নির্ণায়ক এই অভিজ্ঞতায় আমি ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করিনি।

যখন আমি ফিরে এলাম, সবে আমি 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' লেখা শেষ করেছি। সেইসব বছরগুলোয় হওয়া আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা একভাবে ওই বইতে প্রতিফলিত হয়েছিল। সুইডেনের সমাজ সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে ওই সমাজ অতিরিক্ত মাত্রায় চিকিৎসাবদ্ধ ও রক্ষাকবচে মোড়া ছিল, তা ছিল এমন এক সমাজ যেখানে সূক্ষ্ম ও ধূর্ত কলকৌশলের দ্বারা সব সামাজিক বিপদকে এক অর্থে প্রশমিত করা হয়েছিল। আবার পোল্যান্ডের সমাজে বন্দিত্বের কলকৌশলগুলো ছিল সম্পূর্ণ আলাদা রকম। পরবর্তী বছরগুলোয় এই দুই ধরনের সমাজ পাশ্চাত্য সমাজের কাছে এক ধরনের বাতিক বা বদ্ধসংস্কার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যুদ্ধ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ও ঔপনিবেশিকতার অবসানের যুগের সমস্যা নিয়ে আচ্ছন্ন ফ্রান্সের কাছে তখনও সেসব বিষয় বিমূর্ততার স্তরেই ছিল। ফ্রান্সের বাস্তবতার সঙ্গে এই অদ্ভূত বিচ্ছিন্নতার ফল 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা'-কে ব্লাঁশো, ক্লোসোওসকি ও বার্ত তখনই অনুকূলভাবে গ্রহণ করেছিলেন। চিকিৎসক ও মনোবিশ্লেষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল: লুসিয়েন বোনাফি-র মতো উদারতাবাদী বা মার্কসবাদী মনোভাবের কেউ কেউ উৎসাহের সঙ্গে বইটিকে নিয়েছিলেন, আর তুলনায় বেশি রক্ষণশীল মনোভাবাপন্নরা বইটিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু সব মিলিয়ে ধরলে, আগেই যেমন বলেছি, আমার কাজটিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল: বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে অনুৎসাহ ও নীরবতাই প্রাপ্য হয়েছিল।

ত্রোমবাদোরি: এই মনোভাবে আপনার প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল? অল্প কিছু দিন পরেই এমনকি যারা বইটির বক্তব্যের সঙ্গে একমত নয় তারাও 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' বইটিকে একটি প্রথম সারির কাজের স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাহলে এই প্রথম পর্বের প্রায়-উদাসীনতাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

ফুকো: স্বীকার করছি যে আমি কিছুটা অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু তা হওয়া আমার ভুল হয়েছিল। ফরাসী বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল সদ্য সদ্য এক ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। সেই পরিমণ্ডলে তখন মার্কসবাদ, বিজ্ঞান ও মতবাদ নিয়ে বিতর্ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমার মনে হয় যে 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' নিয়ে আগ্রহের অভাবকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমত, তা ছিল একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের কাজ, আর তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক

বিতর্কের দিকেই তখন সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল। দ্বিতীয়ত, চলমান বিতর্কগুলোর তুলনায় মানসিক চিকিৎসাবিধি, মনোরোগের চিকিৎসাবিধির মতো বিষয়গুলোকে প্রান্তীয় বলে মনে করা হতো। আর সবকিছুর পরেও উন্মত্ততা ও উন্মাদরা সমাজের কিনারায় অবস্থিত বলেই কি মনে করা হয় না ? তাদের দিয়ে কি একভাবে সমাজের বহিঃসীমাকেই চিহ্নিত করা হয় না? আমার মনে হয় যে কমবেশি এইসব কারণেই রাজনৈতিক বিষয়ে প্রখরভাবে উৎসাহী ব্যক্তিরা বইটির বিষয়ে অনুৎসাহ দেখিয়েছিলেন। আমি অবাক হয়েছিলাম, আমি ভেবেছিলাম যে যেহেতু বইটির মধ্যে আমি দেখার চেষ্টা করেছি কীভাবে মনোরোগচিকিৎসার মতো বৈজ্ঞানিকতার দাবি করা একটি প্রতর্ক আসলে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি থেকে নির্মিত হয়েছিল, তাই হয়ত বইটিতে আগ্রহের নানা বিষয় খুঁজে পাওয়া যাবে। উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তরের উপর ভিত্তি করে আমি মনোরোগ চিকিৎসার একটা ইতিহাস নির্মাণ করার চেষ্টা করেছিলাম। উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তর জনসমষ্টির উপর যে প্রভাব ফেলেছিল, তার মধ্য দিয়ে যেমন নিঃস্বকরণের সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছিল, তেমনই গরিব, রেগগ্রস্ত, উন্মাদের মতো বিভিন্ন উপভাগের মধ্যেও পার্থক্যীকরণও সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছিল। সুতরাং আমি নিশ্চিত ছিলাম যে অন্য সবকিছু সত্ত্বেও মার্কসবাদীরা এর মধ্যে আগ্রহের বিষয় খুঁজে পাবে। আর বইটি বেরনোর পর সর্বাত্মক নীরবতা পাওয়া গেল।

ত্রোমবাদোরি: পরবর্তী সময়ে আপনার বইটি নিয়ে যে আগ্রহ-উৎসাহের বৃদ্ধি দেখা গেল এবং তার সঙ্গী হয়ে তীব্র সমালোচনা-প্রতিসমালোচনার ঢেউ উঠল, তার পিছনে কারণ কী?

ফুকো: আজ পিছন ফিরে দেখলে হয়ত কীভাবে সেসব ঘটল তা সাজিয়ে নিয়ে বোঝা সম্ভব। ১৯৬৮ সালের ঘটনাবলী যখন প্রথম আকার নিতে শুরু করল ও তারপর ফেটে পড়ল, তখন মনোভাব ও প্রতিক্রয়ার বদল বা আমূল বদল ঘটতে লাগল। উন্মত্ততা, বন্দিত্ব, সমাজের স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়াসমূহ ভাবনা-আলোচনা-প্রতিবাদের জনপ্রিয় বিষয় হয়ে উঠল, বিশেষ করে চরম-বাম-দের মহলে। ঘটনাবলী যেভাবে পেকে উঠছে তার থেকে যারা দূরত্ব তৈরি করতে চাইছিল, তারা আমার বইটিকে নিশানা করল, আঙুল তুলে দেখাতে লাগল যে বইটির বিশ্লেষণ কতই না ভাববাদী, সমস্যার শিকড় অবধি পৌঁছতে বইটি কী নিদারুণ ভাবেই না ব্যর্থ! এই তাড়না

থেকেই বইটি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় আট বছর পর 'ইভোলুশন সাইকিয়াট্রিক' নামক ফরাসী মনোরোগ-চিকিৎসকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী তুলোঁ শহরে অনুষ্ঠিত তাঁদের সম্মেলনের গোটাটা নিয়োজিত করেছিলেন 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' বইটিকে 'সমাজচ্যুত' করার জন্য! এমনকি মার্কসবাদী মনোরোগ-চিকিৎসক বোনাফি, যিনি বইটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর আগ্রহের সঙ্গে তাকে গ্রহণ করেছিলেন ও সমাদর করেছিলেন, তিনিও এই ১৯৬৮ সালে বইটিকে একটি 'মতবাদিক গ্রন্থ' বলে নিন্দা করলেন। এভাবেই উন্মত্ততা, বন্দিত্ব, সমাজের স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়াসমূহ ইত্যাদির মতো কিছু বিশেষ বিষয় নতুন করে উৎসাহের কেন্দ্রে চলে আসা এবং তার সঙ্গে সমালোচনা-প্রতিসমালোচনার অভিসৃতি 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' বইটিকে একধরনের প্রাসঙ্গিকতা এনে দিয়েছিল।

ত্রোমবাদোরি: আপনার কাজকে ঘিরে এই তাজা উৎসাহের সঞ্চার মনোরোগ-চিকিৎসকদের মহলে কী প্রভাব ফেলেছিল? সেই বছরগুলোয় তো প্রথাগত মনোরোগ-চিকিৎসাবিধি সমেত ব্যাপ্ততর প্রচলিত সাংস্কৃতিক বিন্যাসকে প্রশ্ন করে একটা আন্দোলন ছড়াতে শুরু করে।

ফুকো: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই কিছুটা মাত্রায় এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মনোরোগ-চিকিৎসা চর্চার পুনর্মূল্যায়ন করার একটা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তা শুরু হয়েছিল মনোরোগ-চিকিৎসকদের মধ্যে থেকেই। ১৯৪৫-য়ের পরে সেই তরুণ মনোরোগ-চিকিৎসকরা এমনকিছু বিশ্লেষণ, ভাবনাচিন্তা ও প্রকল্প প্রবর্তন করেন যা হয়ত ১৯৫০-য়ের দশকের প্রথমভাগেই ক্রমশ 'মনোরোগ-চিকিৎসা-বিরোধী' আন্দোলন রূপে দানা বাঁধতে পারত। তা যে হয়নি, তার কারণগুলো এইরকম বলে আমার মনে হয়। প্রথমত, সেই মনোরোগ-চিকিৎসকদের মধ্যে বহুজনই হয় মার্কসবাদী, নয়তো মার্কসবাদের ঘনিষ্ঠ, আর তাই তাদের সোভিয়েত রাশিয়ায় কী ঘটছে তার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য করা হয়েছিল, আর সেই সুবাদেই তাঁরা পাভলভ, প্রতিবর্ততত্ত্ব, বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞান সহ এমন এক গুচ্ছ তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন যা তাঁদের বেশি দূর যেতে দেয়নি। তাঁদের মধ্যে অন্তত একজন ১৯৫৪-১৯৫৫ সালে পাঠ-প্রশিক্ষণের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় পাড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু ফিরে আসার পর তাঁর সেখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি কিছু লিখেছেন

বলে আমার অন্তত জানা নেই। সুতরাং আমার মনে হয়— আর আমি এটা নেহাত আক্রমণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বলছি না— মার্কসবাদী পরিবেশ-পরিস্থিতি ধীরে ধীরে তাঁদের কানাগলির মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বেশির ভাগ মনোরোগ-চিকিৎসকরাই যেহেতু সরকারি চাকুরে ছিল, তাদের সেই অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যই খুব দ্রুত তাদের মনোরোগ-চিকিৎসাবিধিকে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে ট্রেড-ইউনিয়ন-ঘরানার রক্ষণাত্মক দৃষ্টিকোণের মধ্যে আটকে ফেলেছিল। এভাবেই সেই সমস্ত ব্যক্তিরা, যারা তাঁদের দক্ষতা, উৎসাহ এবং বিবিধ বিষয়ের প্রতি খোলা মন দিয়ে মনোরোগ-চিকিৎসার সমস্যাগুলোর প্রতিবিধান করতে পারতেন, তাঁরা কানাগলির মধ্যে আটকে পড়লেন। ১৯৬০-য়ের দশকে এসে মনোরোগ-চিকিৎসা-বিরোধিতা যখন ফেটে পড়ল, তার মুখোমুখি হয়ে তাঁরা ঢালাও প্রত্যাখ্যানের মনোভাব নিলেন, এমনকি এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মকও হয়ে উঠলেন। এই সময়েই আমার বইটিকে কালো-তালিকা-ভুক্ত করা হল এমনভাবে যেন তার মধ্য দিয়ে শয়তানের কণ্ঠস্বর কথা বলছে। আমি জানি যে এখনও কিছু কিছু মহলে 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' বইটির কথা উঠলেই চরম ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ পায়।

ত্রোমবাদোরি: আপনার লেখাপত্র যে সমালোচনা-প্রতিসমালোচনার ঢেউ তুলেছিল তার কথা ফিরে ভাবতে গিয়ে আমি এখন ১৯৬০-য়ের দশকে অবয়ববাদকে ঘিরে ফেনিয়ে ওঠা তপ্ত বিতর্কের কথা স্মরণ করতে চাইব। ওই সময়পর্বে কড়া মেজাজের বেশ কিছু আলোচনায় আপনাকে লক্ষ্য করে বেশ কিছু কটু মন্তব্য করা হয়েছিল, সার্ত্রের করা মন্তব্য যার একটা উদাহরণ। কিন্তু আমি আপনার সম্পর্কে আরও কয়েকজনের সেই সময়কার বিচার মনে করিয়ে দিতে চাইব: রজার গারাউদি বলেছিলেন 'বিমূর্ত অবয়ববাদ', জাঁ পিয়াজেত বলেছিলেন 'অবয়বহীন অবয়ববাদ', মিকেল দুফরেননে বলেছিলেন 'নয়া দৃষ্টবাদ', অঁরি লেফেভরে বলেছিলেন 'নয়া এলিয়াটবাদ', সিলভি লে বন বলেছিলেন 'বেপরোয়া দৃষ্টবাদ', মিশেল আমিয়ত বলেছিলেন 'সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ' বা 'সন্দেহবাতিকগ্রস্ততাকে ইতিহাসের মোড়কে হাজির করা', ইত্যাদি, ইত্যাদি। এগুলো হল আপনার লেখা 'বস্তুদের বিন্যাস' (The Order of Things) বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর পর প্রকাশিত মন্তব্যের মধ্যে থেকে বাছাই করা কিছু মন্তব্য, যার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন,

এমনকি বিপরীতার্থক সব পরিভাষা আপনার বক্তব্যের সমালোচনায় হাজির হয়েছে। কিন্তু ফরাসী সংস্কৃতির এই অতিরিক্ত তপ্ত পরিবেশ বোধহয় অবয়ববাদকে ঘিরে চলা ব্যাপ্ততর তর্ক-বিতর্কের জন্যই তৈরি হয়েছিল। এইসব সমালোচনা বা বিচারগুলোকে আজ আপনি কীভাবে দেখেন? আর সাধারণভাবে ধরলে, এই সমালোচনা-প্রতিসমালোচনাগুলোর মূলে আসলে কী ছিল?

ফুকো: অবয়ববাদের বিষয়টির জট ছাড়ানো কঠিন, তবু সেই চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে বেশ চিত্তাকর্ষকই হবে। এই মুহূর্তের জন্য পাশে সরিয়ে রাখা যাক সেই গোটা এক সারি তর্ক-বিতর্ক-জাত বিস্ফোরণগুলোকে যেগুলোর সূত্রায়ণে নাটকীয়তার— এমনকি সময়বিশেষে হাস্যকর উদ্ভটত্বের— গুণই বেশি। এই ধরনের উদ্ভট সূত্রায়ণগুলোর তালিকার প্রথমেই রাখব সার্ত্রের সেই সুবিখ্যাত উক্তিকে, যেখানে তিনি আমাকে 'বুর্জোয়াদের শেষতম মতবাদিক দুর্গপ্রাচীর' বলে দেগে দিয়েছিলেন। শুধু এটুকুই বলব যে সত্যিই যদি তা হতো, তাহলে বুর্জোয়ারা কতটাই না অভাগা হতো! শুধু আমিই যদি তাদের অবশিষ্ট দুর্গপ্রাচীর হতাম, তাহলে অনেক দিন আগেই ক্ষমতা তাদের মুঠো থেকে বেরিয়ে যেত!

তবু এই প্রশ্ন আমাদের করতে হবে যে অবয়ববাদের মধ্যে এত বেসামাল করে দেওয়ার মতো কী এমন ছিল? মানুষকে আমি মোটের উপর যুক্তিচালিত বলেই মনে করি, তাই যখন তারা কী বলছে তার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে, তখন নিশ্চয়ই গুরুতর কোনও বিষয় সেখানে কাজ করে। এ নিয়ে আমার কিছু অনুমান আমি বলতে পারি। প্রথমে একটা পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু করা যাক। ১৯৬০-য়ের দশকের মধ্যভাগে 'অবয়ববাদী' অভিধাটি এমন বহু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর আরোপ করা হয়েছিল যারা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা পাঠ-অনুসন্ধান করলেও একটা বিষয়েই তাঁদের মধ্যে মিল ছিল, তা হল: বিষয়ীর আদ্যতার উপর ভরকেন্দ্র করা দর্শন, চিন্তন ও বিশ্লেষণের রূপের অবসান করার বা তা এড়িয়ে বিকল্প রূপ তৈরির চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। একই কথা বলা যায় মার্কসবাদের ক্ষেত্রে যা সেইসময় অনন্বয়ের ধারণা, প্রতীতিবাদী অস্তিত্ববাদ দ্বারা আবিষ্ট হয়ে যাপিত অভিজ্ঞতার উপর জোর দিচ্ছিল, আর মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যা অচেতনাকে পরিহার করে নির্ভেজাল মানব অভিজ্ঞতার উপর, বা বলা

যায়, আত্মের অভিজ্ঞতার উপর জোর ফেলছিল। এই সাধারণ জায়গাটি ছিল এবং তার থেকেই হয়তো বেসামাল অবস্থাটা তৈরি হয়েছিল।

কিন্তু আমার মনে হয় যে যাই হোক না কেন এই ঝগড়াঝাটির পিছনে গভীরতর কারণ হিসেবে কাজ করছিল একটি ইতিহাস যা নিয়ে তখন হয়ত আমরা খুব একটা ভাবিনি। আপনি নিশ্চয়ই একমত হবেন যে তথাকথিত অবয়ববাদ ১৯৬০-য়ের দশকের অবয়ববাদীদের কোনও আবিষ্কার নয়, আর আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, তা কোনও ফরাসী আবিষ্কারও নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মধ্য ইউরোপে ১৯২০-র দশকের আশেপাশে হওয়া এক সারি পাঠ-অনুসন্ধানের মধ্যে এর উৎস খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ভাষাতত্ত্ব, পুরাণচর্চা, লোককথা ইত্যাদি বিষয়ক্ষেত্রে যে বিপুল সাংস্কৃতিক বিস্তার ওই সব দেশে ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের ঠিক আগে ও কিছুটা তার সঙ্গে সমসাময়িকভাবে ঘটেছিল, তাদের ধাক্কা মেরে পাশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এমনকি মহান স্তালিনীয় স্টিমরোলারের তলায় ফেলে চূর্ণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, কমবেশি আত্মগোপন করে থাকা বা স্বল্প-পরিচিত যোগাযোগের মাধ্যমে ফ্রান্সে অবয়ববাদী সংস্কৃতির সঞ্চরণ ঘটতে থাকে: যেমন ধরুন, এভগেনি ক্রুবেতস্কোয়-য়ের ধ্বনিতত্ত্ব, জর্জ দুমেজিল ও ক্লদ লেভি-স্ত্রস-য়ের উপর ভ্লাদিমির প্রপ-য়ের প্রভাব, ইত্যাদি। তাই আমার মনে হয় যে আমাদের কাছে এই জ্ঞান ছিল কিছুটা অনভ্যাসের, অর্থাৎ, অভ্যাসের বাইরের, কিছু ফরাসী মার্কসবাদী যেভাবে ১৯৬০-য়ের দশকের অবয়ববাদীদের ঘোর বিরোধিতা ও আক্রমণ করেছিল তার মধ্যে এই অনভ্যাসের বিষয়টিও কারণ হিসেবে কাজ করেছিল বলে মনে হয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্তালিনবাদের একটা বড় শিকার হল অবয়ববাদ। অবয়ববাদ ছিল এমন একটা সম্ভাবনা মার্কসবাদ যার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেনি।

ত্রোমবাদোরি: আমি বলব যে একটা নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ধারাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য আপনি তাকে শিকার হিসেবে দেখাতে চাইছেন। আপনি যাকে 'স্তালিনীয় স্টিমরোলার' বললেন তা কেবল অবয়ববাদকেই ঠেলে সরিয়ে দেয়নি, তা একই কাজ করেছে অক্টোবর বিপ্লব থেকে প্রেরণা পাওয়া আরও একগুচ্ছ সাংস্কৃতিক ও মতবাদিক অভিব্যক্তি ও প্রবণতার ক্ষেত্রেও। সেই সমস্তগুলোর অভিজ্ঞতার ব্যাপারে খুব স্পষ্ট পার্থক্য টানা

যায় বলে মনে হয় না। এমনকি, ধরা যাক, মার্কসবাদের ক্ষেত্রেও তার নমনীয়তা ও বিকাশ-সম্ভাবনাগুলোর ক্ষতি করে তাকে একটা মতান্ধ জড়বস্তুতে পরিণত করেছিল...

ফুকো: কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এই কৌতূহলী প্রশ্নের ব্যাখ্যা হয় না যে অবয়ববাদের মতো একটি নির্দিষ্ট প্রতীতি কীভাবে ১৯৬০-য়ের দশকে এত তাপ-উত্তাপের উদ্রেক ঘটাল? আর কেনই বা এমন এক দল বুদ্ধিজীবীকে অবয়ববাদী বলে চিহ্নিত করার উপর জোর দেওয়া হল যারা আদৌ অবয়ববাদী ছিল না , বা, অন্তত অবয়ববাদীর পরিচয় প্রত্যাখ্যান করত? আমি নিশ্চিত যে যতক্ষণ না আমরা আমাদের বিশ্লেষণের ভরকেন্দ্র অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, ততক্ষণ আমরা কোনও সন্তোষজনক উত্তরে পৌঁছতে পারব না। পুবের দেশগুলোয় যে প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো উঠে এসেছিল, পশ্চিম ইউরোপের অবয়ববাদের সমস্যা তারই পরবর্তী প্রভাব ছাড়া মূলত আর কিছু ছিল না। সবার উপরে বিচার করতে হবে নিস্তালিনিকরণের পর্যায়ে সোভিয়েত, চেক, ইত্যাদি বহু বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টার কথা যাঁরা একটা মাত্রায় রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জন করতে চেয়েছিলেন ও সরকারি মতবাদের বাঁধন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁরা খনিক আগে আমার বলা ১৯২০ দশকের 'চেপে রাখা পরম্পরা'-র শরণ নিয়েছিলেন, যার দ্বিবিধ মূল্য ছিল: প্রথমত, তার মধ্যে ছিল আঙ্গিকবাদ, অবয়ববাদ ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ নতুন প্রবর্তনাসমূহ যা পুবের কাছ থেকে পশ্চিমা সংস্কৃতি উপহার পেয়েছিল, আর, দ্বিতীয়ত, এই সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ ভাবে হোক, বা পরোক্ষভাবেই হোক, অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং তাদের মূল উপাদানগুলি সেই যোগে পুষ্ট ছিল। ছবিটা এখন স্পষ্টতর হয়ে ওঠে: নিস্তালিনিকরণ ঘটতে শুরু করার পর এই বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের স্বাধিকার ফিরে পেতে চেষ্টা করলেন সেই সাংস্কৃতিকভাবে মর্যাদাশালী পরম্পরার সঙ্গে পুনরায় যোগ তৈরি করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে যে পরম্পরাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল বা পশ্চিমী বলে গাল পাড়া যাবে না। বরং তা বিপ্লবী এবং পুবাগত। এখান থেকেই এই প্রবণতাগুলোকে বৌদ্ধিক ও শিল্পকলার চর্চায় পুনপ্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ জন্ম নিয়েছিল। আমার মনে হয় যে সোভিয়েত কর্তাব্যক্তিরা এই বিপদ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন আর মুখোমুখি সংঘাতের ঝুঁকি

এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন, অথচ বহু বুদ্ধিজীবী মহলই এমন মুখোমুখি সংঘাতের উপর বাজি ধরে বসেছিল।

ফ্রান্সে যা ঘটেছিল তা কিছুটা মাত্রায় এই গোটা প্রক্রিয়ারই অসাবধানী হিসেব-বহির্ভূত ফল বলে আমার মনে হয়। কমবেশি সব মার্কসবাদী মহলেই— সে তারা কম্যুনিস্টই হোক, বা মার্কসবাদ দ্বারা প্রভাবিতই হোক— এমন একটা অনুভূতি বা ধারণা জন্ম নিয়েছিল যে অবয়ববাদের চর্চা যেভাবে ফ্রান্সে শুরু হয়েছে তা প্রথামাফিক মার্কসবাদী সংস্কৃতির মৃত্যুঘন্টার মতো শুনতে লাগছে। বামপন্থীদের একটা অ-মার্কসবাদী সংস্কৃতি যেনবা জন্ম নিতে চলেছে। এই কারণেই তাঁরা এ ধরনের সমস্ত চর্চা-অনুসন্ধানকে কৌশলসর্বস্ব ও ভাববাদী বলে নিন্দা করেছিলেন। আঙ্গিকবাদ ও অবয়ববাদ সম্পর্কে সমালোচনাত্মক বিচারে 'লা তেম্পস মডের্নেস'-য়ের (১৯৬০ ও ১৯৭০-য়ের দশকে ফ্রান্সে মার্কসবাদী ও বামপন্থীদের প্রতিনিধিস্থানীয় পত্রিকা।— অনুবাদক) স্বরের সঙ্গে দুর্মর স্তালিনবাদী বা ক্রুশ্চেভ-জমানার সোভিয়েত কর্তাদের স্বরের কোনও পার্থক্য ছিল না।

ত্রোমবাদোরি: আমার মনে হচ্ছে আপনি আবার কিছুটা বাড়তি বলে ফেলছেন, কারণ বিচারের ক্ষেত্রে একই অবস্থানে পৌঁছানো তো রাজনৈতিক, এমনকি সাংস্কৃতিক সমমনস্কতা দেখায় না...

ফুকো: আমি আপনাকে দুটো পুরানো ঘটনার কথা বলব। প্রথম ঘটনাটির সত্যতা নিয়ে আমি আপনাকে কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারব না, ঘটনাটি আমাকে ১৯৭৪ বা ১৯৭৫ সালে একজন চেক শরণার্থী বলেছিলেন। ১৯৬৬ সালের শেষদিকে বা ১৯৬৭ সালের গোড়ায় সবচেয়ে বড় পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে একজনকে একটা ভাষণ দেওয়ার জন্য প্রাগ শহরে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। প্রাগ বসন্ত প্রস্ফুটিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বের সেই তীব্র সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উত্তেজনাময় সময়ে তিনিই ছিলেন প্রথম বড়সড় অকম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবী যিনি তেমন আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। চেকরা অধীর আগ্রহে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা প্রত্যাশা করেছিল যে তিনি পশ্চিম ইউরোপের প্রগতিশীল ভাবনাচিন্তা কীভাবে প্রথাবদ্ধ মার্কসবাদী সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না সেই বিষয়ে বলবেন। কিন্তু তিনি তাঁর ভাষণের শুরু থেকেই অবয়ববাদী নামক সেই বুদ্ধিজীবীর দলকে আক্রমণ করা শুরু করলেন এই বলে যে সন্দেহাতীতভাবেই তারা পুঁজির

দাসত্ব করে মহান মার্কসীয় মতবাদিক ধারার বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি সম্ভবত মার্কসবাদের এক সর্বায়তনিক ধাঁচা হাজির করে তাঁর চেক শ্রোতাদের খুশি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে সেই সময়ে চেক বুদ্ধিজীবীরা যা করার চেষ্টা করছিল, এর মধ্য দিয়ে তার বিরুদ্ধে গিয়ে তাকে দুর্বল করার কাজই তিনি করলেন। আর একই সঙ্গে, তিনি চেক প্রতিষ্ঠান-কর্তাদের হাতে একটি অসাধারণ অস্ত্র তুলে দিলেন যা ব্যবহার করে তারা অবয়ববাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে পারে এই বলে যে এমনকি অ-কম্যুনিস্ট একজন দার্শনিকের বিচারেও অবয়ববাদ হল একটি প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া মতবাদ। বুঝতেই পারছেন চেকরা কেমন নিরাশ হয়েছিল!

এখন দ্বিতীয় ঘটনাটির কথায় আসি, আর এই ঘটনাটিতে ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে জড়িত ছিলাম। তখন ১৯৬৭ সাল, হাঙ্গেরিতে আমাকে একগুচ্ছ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বক্তৃতামালার বিষয় হিসেবে আমি অবয়ববাদকে ঘিরে পাশ্চাত্য মহলে চলমান বিতর্কের কিছু বিষয়কে প্রস্তাব করেছিলাম। আমার প্রস্তাবিত সবকটা বিষয়ই গৃহীত হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে বক্তৃতাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যখন আমার অবয়ববাদ সংক্রান্ত বক্তৃতা দেওয়ার সময় এল, আমাকে জানানো হল যে বক্তৃতাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে নয়, রেক্টরের দফতরের ঘরে অনুষ্ঠিত হবে। কারণ হিসেবে আমাকে বলা হল যে বিষয়টি এতই সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিষয় যে বেশিজন শ্রোতা তা শোনায় আগ্রহী হবে না। আমি জানতাম যে এটা মিথ্যা বলা হচ্ছে। যে তরুণটি আমার দোভাষীর কাজ করছিল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, 'এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বিষয় নিয়ে কোনওরকম আলোচনা করা আমাদের জন্য নিষেধ, বিষয়গুলি হল: নাজিবাদ, হর্টির আমল, আর অবয়ববাদ।' আমি অত্যন্ত অবাক হয়েছিলাম। এর থেকে আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে অবয়ববাদের সমস্যা আসলে পুবেরই সমস্যা— পুবের দেশগুলোয় একে ঘিরে যে গুরুতর ও কর্কশ সংগ্রাম জারি আছে, কেবলমাত্র তার একটা প্রতিধ্বনিই ফ্রান্সের উত্তপ্ত এলোমেলো বিতর্কগুলোর মধ্য দিয়ে শোনা যাচ্ছে, আর এ বিষয়ে ফ্রান্সে বোঝাবুঝিও স্পষ্ট নয়।

ত্রোমবাদোরি: আপনি কেবল প্রতিধ্বনি বলছেন কেন? ফ্রান্সের তাত্ত্বিক বিতর্কগুলোর কি নিজস্ব স্বকীয়তা নেই, যা অবয়ববাদের গণ্ডি ছাপিয়ে যায়?

ফুকো: আমি প্রতিধ্বনি হিসেবে বলছি কারণ অবয়ববাদকে ঘিরে পশ্চিমে তৈরি হওয়া বিতর্কের চরিত্র ও তীব্রতাকে আরও ভালোভাবে বুঝতে তা সহায়ক হয়। বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে উঠে এসেছিল, যেমন: তাত্ত্বিক সমস্যা খাড়া করার এমন কিছু উপায় যা বিষয়ীর উপর কেন্দ্রীভূত নয়, আর এমন বিশ্লেষণ যা মার্কসবাদী না হয়েও সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। তা ছিল মার্কসবাদের বশবর্তী থাকার কড়া অভ্যাস ভেঙে বেরিয়ে এক ধরনের তাত্ত্বিক ভাবনাচিন্তা করার উপায়ের জন্মমুহূর্ত। যে সমস্ত মূল্যবোধ ও সংগ্রাম পুবে গড়ে উঠেছিল তা স্থানান্তরিত হয়ে পশ্চিমের ঘটনাবলীর উপর এসে পড়েছিল।

ত্রোমবাদোরি: আপনি যে স্থানান্তরের কথা বলছেন, তার মানে আমি ঠিক ধরতে পারলাম না। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোয় অবয়ববাদী পদ্ধতিতে ও পরম্পরায় উৎসাহের পুনর্জাগরণের সঙ্গে ফরাসী অবয়ববাদীদের মধ্যে প্রকাশিত মানববাদ-বিরোধী (antihumanist) তত্ত্বধারার মিল বা যোগাযোগ খুব কিছু তো ছিল না...

ফুকো: পুবে এবং পশ্চিমে যা ঘটেছিল তার চরিত্র ছিল একই রকম। মূল প্রশ্নটা ছিল: এমন ভাবনাচিন্তা ও বিশ্লেষণের রূপ কতটা গড়ে তোলা যায় যা মার্কসবাদী মতবাদিক গোঁড়ামির মধ্যে আবদ্ধ হবে না আবার যুক্তিকে উপেক্ষাকারী বা ডানপন্থীও হবে না? এই প্রশ্নকে ঘিরে প্রয়াস-অনুসন্ধানকে যারা ভয় পেয়েছিলেন, তারাই তাকে 'অবয়ববাদ'-য়ের মতো একটা সবকিছুকে একদলে ফেলা গোলনঘ্যাঁটমূলক শব্দ দিয়ে দেগে দিয়ে নিন্দামন্দ করতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। আর ওই 'অবয়ববাদ' শব্দটিই বা এল কোথা থেকে? তা এল কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোয় অবয়ববাদকে ঘিরে বিতর্কই কেন্দ্রীয় স্থান নিয়ে নিয়েছিল। সেখানেও প্রশ্নটা ছিল যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নিয়মাবলী ও মতবাদিক গোঁড়ামির বাইরে বেরিয়ে যুক্তিশীল, বৈজ্ঞানিক, তাত্ত্বিক গবেষণা কতটা দূর অবধি চালানো যায় তার খোঁজ করা।

এখানেই পুব এবং পশ্চিমের ঘটনাবলীর মধ্যে সাযুজ্য। কিন্তু পার্থক্যও ছিল। পার্থক্য ছিল এইখানে যে পশ্চিমে যা ঘটছিল তা যথার্থ অর্থে অবয়ববাদের ব্যাপার নয়, আর পুবের দেশগুলোয় যথার্থ অর্থে

অবয়ববাদকেই চেপে রাখা হয়েছিল এবং এখনও চেপে রাখা আছে। কিছুকিছু নিন্দামন্দের ব্যাখ্যা এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে...

ত্রোমবাদোরি: কিন্তু কৌতূহলপ্রদভাবে লুই আলথুজারকেও তো এই নিন্দামন্দের ভাগী হতে হয়েছিল, যদিও তাঁর গবেষণার কাজ সম্পূর্ণভাবেই মার্কসবাদের সঙ্গে নিজেকে অন্বিত করেছিল, এমনকি মার্কসবাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যাখ্যা হিসেবে নিজেকে দাবি করেছিল। সেই আলথুজারকেও তো অবয়ববাদীদের দলভুক্ত করা হয়েছিল। আলথুজারের 'পুঁজি পাঠ' (Reading Capital)-য়ের মতো একটি আদ্যন্ত মার্কসবাদী কাজ এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিমুখ সম্পন্ন আপনার কাজ 'বস্তুদের বিন্যাস' (The Order of Things), দুটোই ১৯৬০-য়ের দশকের মাঝামাঝি প্রকাশিত হওয়ার পর একইভাবে যে অবয়ববাদ-বিরোধী সমালোচনা-প্রতিসমালোচনার নিশানা হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা আপনি কীভাবে করবেন?

ফুকো: আলথুজারের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে উত্তর দিতে পারব না। আমার নিজের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে 'বস্তুদের বিন্যাস' বইটিকে আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে সমালোচকরা আসলে 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' বইটির জন্য হিসেব চুকোতে চাইছিল। 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' বইটি আসলে এক ধরনের রোগের প্রবর্তন ঘটিয়েছিল: অভিজাত গুরুতর বিষয়ক্ষেত্র থেকে তা তুচ্ছ বিষয়ক্ষেত্রে মনোযোগ সরিয়ে দিয়েছিল। মার্কসকে নিয়ে আলোচনা করার বদলে তা উন্মাদ আশ্রমের রীতিনীতির মতো তুচ্ছ সব ঘটনাকে বিশ্লেষণ করেছিল। এই নিয়ে কলঙ্কারোপ ও অপবাদলেপনের ঘনঘটা হয়ত আরো আগেই শুরু হওয়া বিধেয় ছিল, তা শুরু হল ১৯৬৬ সালে 'বস্তুদের বিন্যাস' বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর। বইটি সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে তা একটি নিখাদ আঙ্গিকসর্বস্ব বিমূর্ত পাঠবস্তু— যা উন্মত্ততা বিষয়ে পূর্ববর্তী বইটি সম্পর্কে বলা সম্ভব হয়নি। সমালোচকরা যদি 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' এবং 'চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্ভব' বইদুটোর প্রতি প্রকৃতই মনোযোগ দিয়ে থাকতেন, তাঁরা এটা খেয়াল করতে পারতেন যে 'বস্তুদের বিন্যাস' বইটি আদৌ আমার কাছে কোনও সর্বসিদ্ধান্তমূলক বই ছিল না। নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অভিপ্রায় পূরণের জন্য একটা নির্দিষ্ট মাত্রা ওই বইটি ধারণ করছিল। আমি আমার পদ্ধতির সবকিছু বা আমার চিন্তার সমস্ত বিষয় ওই বইটির মধ্যে ঢেলে দিইনি। তাছাড়াও বইটির

শেষে আমি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছিলাম যে savoir এবং connaissance-র রূপান্তরের স্তরেই গোটা বিশ্লেষণটি পরিচালনা করা হয়েছে, আর কারণ-অনুসন্ধান ও গভীরে গিয়ে ব্যাখ্যার জন্য প্রযোজনীয় অনুসন্ধান-কাজ এখনও করা হয়নি বা এখনও করা বাকি আছে। সমালোচকরা যদি আমার আগের কাজগুলো পড়ে থাকতেন, বা পড়েও ভুলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নিতেন, তাঁদের এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হতো যে ওই সমস্ত বইয়ে আমি ইতিমধ্যেই আমার কিছু কিছু ব্যাখ্যা হাজির করেছিলাম। একটা বইকে পড়া হয় যেন তার আগেপিছে আর কিছু নেই, যেনবা তা একক ও স্বয়ম্ভূ— এই অভ্যাসটির শিকড় খুব গভীরে সেঁধিয়ে আছে, অন্তত ফ্রান্সের ক্ষেত্রে তো বটেই। অথচ আমি আমার বইগুলোকে লিখি একটি ধারাবাহিকতার মধ্যে: প্রথম বইটি কিছু সমস্যাকে খুলে দিয়ে যায়, যার উপর ভর করে দ্বিতীয় বইটি দাঁড়ায়, আবার তৃতীয় একটি বইয়ের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে দেয়— যদিও কোনও সরলরৈখিক সন্ততা বা অবিচ্ছিন্নতা সেগুলোকে বেঁধে রাখে না, তারা একে অপরের মধ্যে ঢুকে থাকে, একে অপরের সঙ্গে অন্তর্বুননে বোনা থাকে।

ত্রোমবাদোরি: তাহলে আপনি 'বস্তুদের বিন্যাস'-য়ের মতো একটি পদ্ধতির বইয়ের সঙ্গে উন্মত্ততা বা প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসার উপর বইয়ের মতো অনুসন্ধানমূলক বইকে যুক্ত করছেন? আরও বেশি প্রণালীবদ্ধ সমীক্ষার দিকে সরে যাওয়া ও তা থেকে একটি প্রদত্ত সংস্কৃতি বা ঐতিহাসিক পর্বের মধ্যে প্রতর্কমূলক চর্চাকে পরিচালিত করে যেসব নিয়মবিধি, সেই 'তত্ত্বকাঠামো' (episteme)-র ধারণানির্যাস আহরণ করার দিকে যাওয়ার জন্য আপনি কী দ্বারা চালিত হয়েছিলেন?

ফুকো: 'বস্তুদের বিন্যাস'-য়ের মধ্য দিয়ে আমি অভিজ্ঞতানির্ভর জ্ঞানের বিন্যাসে বর্গীকরণ, সারণীকরণ ও সহযোজন প্রক্রিয়ার ভূমিকার একটি বিশ্লেষণ গড়ে তুলেছিলাম। এর আগে প্রথম যখন আমি এই প্রশ্নের মুখোমুখি হই, তখনই আমি প্রশ্নটিকে চিহ্নিত করেছিলাম। 'চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্ভব'-য়ের উপর কাজ করার সময় যখন আমি জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধানরত, তখন আমি এই প্রশ্নের মুখে পড়েছিলাম। কিন্তু তারও আগে 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' নিয়ে কাজ করার সময় চিকিৎসাশাস্ত্রীয় বর্গীকরণের সমস্যা আমার সামনে এসেছিল, যখন খেয়াল করেছিলাম যে একই ধরনের প্রণালীবিদ্যা

মনোরোগের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে শুরু করেছে। দাবার ছকের উপর বোড়ের মতো প্রশ্নটি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এক খোপ থেকে আরেক খোপে ঠেলা খেয়ে সরতে সরতে, কখনও আঁকাবাঁকা পথে, কখনও লাফ দিয়ে, কিন্তু সবসময় সেই একই দাবার ছকের মধ্যে। সেইজন্যই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এইসব অনুসন্ধান-কাজের মধ্য দিয়ে যে জটিল নকশাটা আমার সামনে ফুটে উঠছে, তাকে একটা প্রণালীবদ্ধ রূপে প্রকাশ করতে হবে। এর থেকেই 'বস্তুদের বিন্যাস' বইটির জন্ম। বইটি ছিল একটি অতি প্রায়োগিক চরিত্রের বই, যা সর্বোপরি বিজ্ঞানের ইতিহাসের কলাকুশলীদের উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছিল। জর্জ ক্যাঙ্গুইলহেম-য়ের সঙ্গে বেশ কিছু আলোচনার পর আমি বইটা লিখেছিলাম, মূলত গবেষকরাই আমার উদ্দিষ্ট পাঠক ছিলেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে হলে, এখানে আলোচিত সমস্যাগুলো নিয়েই যে আমার উৎসাহ সবচেয়ে তীব্র ছিল তা নয়। আমি ইতিমধ্যেই আপনাকে সীমান্তবর্তী অভিজ্ঞতার কথা বলেছি, সেই বিষয়টিই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করছিল— আমার কাছে উন্মত্ততা, যৌনতা এবং অপরাধ ছিল আরো বেশি আকর্ষণীয় ও প্রগাঢ় বিষয়। সেই তুলনায় আমার কাছে 'বস্তুদের বিন্যাস' ছিল এক ধরনের বিধিবৎ চর্চা মাত্র।

ত্রোমবাদোরি: তবু নিশ্চয় আপনি আমাকে এমনটা বিশ্বাস করতে বলবেন না যে 'বস্তুদের বিন্যাস' বইটির কোনও গুরুত্বই আপনার কাছে ছিল না! ওই বইয়ের মধ্য দিয়ে আপনার চিন্তার পথে সামনে এগোনোর একটা বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। অনুসন্ধানের ক্ষেত্র আর উন্মত্ততার ভিত্তিমূলক অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সংগঠনের বিচারনীতির উপরও প্রসারিত হয়েছিল...

ফুকো: আমি যা বললাম তার মানে এই নয় যে আমি কোনওভাবে আমার ওই কাজটিতে পৌঁছানো সিদ্ধান্তগুলো থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নিতে চাইছি। কিন্তু 'বস্তুদের বিন্যাস' এমন একটা বই নয় যা প্রকৃত অর্থেই আমার আপন: আমার অন্যান্য বইগুলোর মধ্য দিয়ে যে ধরনের ভাবাবেগ প্রবাহিত থাকে, তার সাপেক্ষে এই বইটির অবস্থান প্রান্তীয়। কিন্তু যথেষ্ট বিস্ময়কর হল যে এই বইটিই সাধারণ পাঠকমহলে সবচেয়ে বেশি সাফল্য পেয়েছিল। গুটিকয় বাদ দিলে, সমস্ত সমালোচনাই ছিল অবিশ্বাস্যরকমের তীব্র বিরোধিতামূলক, আর আমার বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হওয়া সত্ত্বেও

এই বইটিই মানুষ সবচেয়ে বেশি কিনেছিল। ফরাসী বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার পত্রিকায় কোনও তাত্ত্বিক বইয়ের সমালোচনা এবং সাধারণের কাছে সেই বইয়ের গ্রহণীয়তার মধ্যে যে অস্বাস্থ্যকর সম্পর্ক ১৯৬০-য়ের দশকের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল, তা দেখাতেই আমি কথাটা বললাম।

ওই বইয়ে আমি তিনটি বৈজ্ঞানিক চর্চার মধ্যে তুলনা করতে চেয়েছিলাম। বৈজ্ঞানিক চর্চা বলতে আমি প্রতর্কসমূহ গঠন ও নিয়ন্ত্রণের এমন এক পদ্ধতিকে বোঝাচ্ছি যা যেমন একদিকে বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিসরকে সংজ্ঞাত করে, তেমনই অন্যদিকে একই সঙ্গে সেই আদর্শ বিষয়ীর অবস্থান নির্ধারণ করে দেয় যে বিষয়ী ওইসব বস্তুদের জানতে পারে ও সেমত জানাই যার আবশ্যকীয় কাজ। এটা দেখে আমার বেশ অদ্ভুত লেগেছিল যে প্রকৃতির ইতিহাস, ব্যাকরণ এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির মতো তিনটি পৃথক ক্ষেত্র যাদের মধ্যে কোনও পারস্পরিক বাস্তবিক সম্পর্ক নেই, তিনটিই তাদের নিজ বিধিনিয়মের নিরিখে কমবেশি একই সময়পর্যায়ে— সতেরো শতকের মাঝামাঝি— গঠিত হয়েছিল এবং আঠারো শতকের শেষে এসে একই ধরনের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। যেহেতু কাজটি এহেন অসদৃশ চর্চাক্ষেত্রের মধ্যে তুলনার কাজ ছিল, তাই সম্পদের বিশ্লেষণচর্চার উদ্ভবের সঙ্গে পুঁজিবাদের বিকাশের কোনও সম্পর্ক থেকে থাকলে তা কী— এইরূপ বৈশিষ্ট্য-নির্ধারণের দরকার সেখানে ছিল না। কীভাবে রাজনৈতিক অর্থনীতির জন্ম হল তা নির্ধারণ করা কাজ ছিল না, বরং কাজটা ছিল বিবিধ প্রতর্কমূলক চর্চার মধ্যে সাধারণ মিলের জায়গাগুলো খুঁজে বের করা, অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক প্রতর্কের আভ্যন্তরীণ পদ্ধতিগুলোর একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা। এই যে সমস্যাকে ঘিরে কাজটা ছিল, তা সেইসময় গুটিকয় বিজ্ঞানের ইতিহাসকারদের বাদ দিলে আর কারও খুব আগ্রহের বিষয় ছিল না। যে প্রশ্নটি প্রধান ছিল এবং এখনও প্রধান হয়ে আছে, তাকে মোটের উপর এভাবে বলা যায়: বাস্তব কোনও চর্চা থেকে বৈজ্ঞানিক চরিত্রের একটি জ্ঞান কীভাবে উঠে আসতে পারে? এখনও এটিই সমস্যা, অন্য সবকিছু অপ্রধান বলে মনে হয়।

ত্রোমবাদোরি: তবু তো 'বস্তুদের বিন্যাস' বইয়ে সামাজিক চর্চা থেকে জ্ঞান (savoir) তৈরি হওয়ার এই প্রধান প্রশ্নটি ছায়াঢাকা হয়ে আড়ালেই রয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয় যে বইটির বিরুদ্ধে ওঠা সমালোচনাগুলোর মধ্যে

সবচেয়ে ধারালো ছিল অবয়ববাদী আঙ্গিকসর্বস্বতার দোষারোপ, বা অন্যভাবে বললে এই দোষারোপ যে ইতিহাস ও সমাজের সমস্যাকে এখানে জ্ঞান-আহরণের (du connaitre) কাঠামোর মধ্যে এক সারি অসন্ততা বা ছেদে পর্যবসিত করা হয়েছে।

ফুকো: ওই প্রশ্ন এড়িয়ে গেছি বলে যারা আমার সমালোচনা করেন, তাদের জবাবে আমি বলব যে 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' বইটি লেখার সময়েই আমি দেখিয়েছিলাম যে প্রশ্নটিকে আমি দৃষ্টির বাইরে রাখছি না। 'বস্তুদের বিন্যাস' বইয়ে যদি আমি তা নিয়ে কথা না বলে থাকি, তা এই কারণেই যে এখানে আমি অন্যতর কিছু বিষয়কে আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছিলাম। বিভিন্ন প্রতর্কমূলক চর্চার মধ্যে যে তুলনা টানার কাজ আমি করেছিলাম, সেই তুলনার বৈধতা নিয়ে কেউ বিতর্ক করতেই পারে, কিন্তু সেই বিতর্ক এ কথা মাথায় রেখে করতে হবে যে নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু সমস্যাকে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি কাজটা করেছিলাম।

ত্রোমবাদোরি: 'বস্তুদের বিন্যাস' বইয়ে আপনি শেষাবধি মার্কসবাদকে উনিশ শতকের তত্ত্বকাঠামোর অন্তর্গত একটি অধ্যায়ে পর্যবসিত করেছিলেন। আপনার বক্তব্য অনুযায়ী মার্কসের যাত্রাপথে তখনকার গোটা সাংস্কৃতিক দিগন্তের সঙ্গে কোনও জ্ঞানতাত্ত্বিক ছেদ ঘটেনি। মার্কসের চিন্তা ও তার বিপ্লবী তাৎপর্য সম্পর্কে এমন নিচু মূল্যায়ন তীব্র বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল...

ফুকো: হ্যাঁ, এই নিয়ে সেই সময় উদগ্র বিতণ্ডা ঘনিয়ে উঠেছিল; একটা ক্ষতের মতো হয়ে উঠেছিল। আজ যখন 'গুলাগ'-গুলোর জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ভাগীদের মধ্যে মার্কস-য়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করা ফ্যাশন-দুরস্ত হয়ে উঠেছে, তখন তা সর্বপ্রথম বলা লোকেদের একজন হিসেবে আজ আমি নিজের কৃতিত্ব দাবি করতে পারি। কিন্তু তা করা সত্যচারণ হবে না। আমি মার্কসের অর্থনীতি সম্পর্কেই আমার বিশ্লেষণকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। আমি কখনই মার্কসবাদ নিয়ে আলোচনা করিনি। 'মার্কসবাদ' শব্দটা ব্যবহার করলেও তা কেবল অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাপেক্ষে ব্যবহার করেছিলাম। আর বস্তুতই আমি মনে করি না যে আমি গর্দভের মতো কোনও কথা বলেছিলাম এটা বলার মধ্য দিয়ে যে মার্কসবাদী অর্থনীতি তার মূলগত ধারণাসমূহের ও

প্রতর্কের সাধারণ বিধির বিচারে এমন এক প্রতর্ককাঠামোর অন্তর্গত যা রিকার্ডোর সময়কালে রূপ পেয়েছিল। আর তাছাড়া, মার্কস নিজেই তো বলেছিলেন যে তাঁর রাজনৈতিক অর্থনীতির মূলগত নীতিগুলো রিকার্ডোর থেকে ধার নেওয়া।

ত্রোমবাদোরি: যতই প্রান্তিক চরিত্রের হোক না কেন, মার্কসবাদ প্রসঙ্গে ওই উল্লেখের উদ্দেশ্য কী ছিল? খুব বেশি হলে বারো পাতার ওই পার্শ্ব-আলোচনায় মার্কসবাদ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন হাজির করা কি অযথা তাড়াহুড়ো ও অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট বলে আপনার মনে হয় না?

ফুকো: আমি একটি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে চেয়েছিলাম। রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে তার ঐতিহাসিক সৌভাগ্যের জন্য মার্কসবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতিকে ঘিরে যেভাবে একপ্রকার ধর্মীয় ভক্তিমূলক গৌরবারোপের চল হয়েছে. প্রতিক্রিয়াটা তার বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে মার্কসবাদের জন্ম উনিশ শতকে আর তার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে বিশ শতকে। কিন্তু মার্কসের অর্থনৈতিক প্রতর্ক উনিশ শতকের বৈশিষ্ট্যসূচক বৈজ্ঞানিক প্রতর্কনির্মাণ-বিধির অনুগত। এইটা বলা কোনও ভীষণ ভয়ানক কাজ নয়। অবাকের ব্যাপার এটাই যে লোকের তখন তা অসহ্য মনে হয়েছিল। মার্কসকে সর্বত্র সর্বোচ্চ আসনে না বসিয়ে কেউ কিছু বলতে পারে এটা প্রথাগত মার্কসবাদীরা মেনে নিতে একেবারেই তৈরি ছিল না। কিন্তু সেইসময় তাঁরাই যে আমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে আগ্রাসী হয়ে উঠেছিলেন এমনটা নয়; এমনকি আমার এমনটাও মনে হয় যে অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিষয়ে উৎসাহী মার্কসবাদীরা আমার বক্তব্যকে তেমন কোনও ভয়ানক অন্যায় হিসেবে দেখেননি। যারা সত্যিই তেমনভাবে দেখে ভয়ংকর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল তারা হল সেইসব নব্য-মার্কসবাদীরা যারা ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথাবদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে চাইছিল, অর্থাৎ, যারা ১৯৬৮ সালের পরের বছরগুলোয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বা এমনকি মাওবাদী হয়ে উঠবে। তাদের কাছে মার্কস একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সংগ্রামের বস্তু ছিল, যে সংগ্রাম একদিকে যেমন স্বাভাবিকভাবেই বুর্জোয়া মতবাদের বিরুদ্ধে চালিত, তেমনই অন্যদিকে সেই কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে চালিত যে কম্যুনিস্ট পার্টি তাত্ত্বিক জাড্যে আটকে পড়ে মতান্ধতা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না বলে তারা মনে করত।

সেই ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধী নব্য-মার্কসবাদীদের গোটা প্রজন্মটার মধ্যেকার লোকজনরাই আমাকে ক্ষমার অযোগ্য বিবেচনা করে অপমানকর চিঠিপত্র পাঠিয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাস বদলের ভিত্তি হিসেবে কাজ করা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চূড়ান্ত সীমা বা একেবারে শেষ কথা হল মার্কস— এমন মূল্যায়ন নিয়ে তারাও মার্কসের উপর গৌরবারোপের চালু ধারার যাত্রী ছিল এবং সেই অবস্থান থেকেই আমাকে আক্রমণ করেছিল।

ত্রোমবাদোরি: আপনি যখন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বা মাওবাদী বলছেন, তখন ঠিক কাদের কথা মাথায় রেখে বলছেন?

ফুকো: যারা মে ১৯৬৮-র পর অতি-মার্কসবাদী ভাষণ দিয়েছিলেন, মে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মার্কসের থেকে ধার করা এমন সব শব্দ ও বাচনভঙ্গিমা যারা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ফ্রান্সে আগে যেমনটা দেখা বা শোনা যায়নি, আর তারপর কয়েকবছর যেতে না যেতেই যারা সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে সরে গেলেন, আমি তাদের কথাই বলছি। অন্যভাবে বললে, মে ১৯৬৮-র অব্যবহিত আগের সময়টায় মার্কসের উপর অপরিমিত গৌরবারোপ ও অতি-মার্কসীয়করণের এমন এক সাধারণ ঢেউ উঠেছিল যার কাছে মার্কসের কাজ যে অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক থেকে রিকার্ডোর ধাঁচার কাজ, আমার এমন এক পরিমিত বক্তব্যও অসহ্য বোধ হয়েছিল।

ত্রোমবাদোরি: যাই হোক না কেন, আমরা এখানে একের পর এক যে প্রত্যাখ্যানগুলোর তালিকা করছি, এইটি হল তারমধ্যে সর্বশেষে জানান দেওয়া প্রত্যাখ্যান। তালিকাটি এমন: অবয়ববাদের প্রসঙ্গ, এক ধরনের মার্কসবাদী ধারার প্রতিরোধ, বিষয়ীর দর্শনের সাপেক্ষে বিকেন্দ্রীভবন...

ফুকো: আর আপনি চাইলে তার সঙ্গে এটাও যোগ করে দিতে পারেন: কেউ আসলে এমন একজন লোককে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে পারছিল না যে একদিকে উন্মত্ততা নিয়ে মাথা ঘামায়, আবার অন্যদিকে বিজ্ঞানের ইতিহাসকে গুরুত্বপূর্ণ ও বৈধ হিসেবে স্বীকৃত সমস্যাগুলোর সাপেক্ষে অদ্ভুত উদ্ভট ভাবে পুনর্নির্মাণ করে। এই সমস্ত কারণের সংযোগই সেই বিরাগের জন্ম দিয়েছিল, সর্বজনসঙ্গ থেকে 'বস্তুদের বিন্যাস'-কে বহিষ্কার করার ধুম উঠেছিল: লা তেম্পস মডার্নে, এসপ্রিট, লা ন্যুভো অবজারভেটুর, ডানপক্ষ, বামপক্ষ, মাঝের পক্ষ– সবাই খড়্গহস্ত হয়েছিল। বইটার ২০০

কপির বেশি বিক্রি হওয়া উচিত ছিল না, অথচ বেশ কয়েক হাজার কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

ত্রোমবাদোরি: ইউরোপীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে ১৯৬০-য়ের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ উথালপাতালের শঙ্কা জাগানো এক সংকটকাল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এখনও আমরা ওই সময়ের ঐতিহাসিক বোঝাবুঝিতে পৌঁছতে পারিনি। অতি-মার্কসবাদ কি সহযোজিত হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত ছিল নাকি তার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী প্রতর্কের প্রকৃত নবীকরণ ঘটেছিল? কী কী প্রক্রিয়া আসলে শুরু হচ্ছিল? নতুন কী মূল্যবোধ উঠে আসছিল? এই প্রশ্নগুলো এখনও খোলা পড়ে রয়েছে, সম্ভবত এই প্রশ্নগুলোকে এখনও প্রয়োজনীয় উপায়ে তুলে ধরা হয়নি।

ফুকো: ১৯৬৮ সালের আগে ও পরে কী ঘটেছিল তা আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করা দরকার, সেখানে আপনার প্রশ্নগুলোরও উত্তর খোঁজা দরকার। পিছন ফিরে সেই সময়পর্ব নিয়ে ভাবলে, আমি বলব যে তা ছিল এমনই এক পর্ব যা নিঃসন্দেহে তার নিজস্ব তত্ত্ব ও নিজস্ব পরিভাষার অভাব বোধ করছিল। মোটের উপর আমাদের এই বিশ শতকের প্রথম অর্ধের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল যে নির্দিষ্ট ধরনের দর্শন, এমনকি নির্দিষ্ট ধরনের সংস্কৃতি, তাতে পরিবর্তন আসছিল। সবকিছুর বাঁধন খুলে আসছিল আর সেই প্রক্রিয়াকে প্রকাশ করার মতো পরিভাষা তৈরি ছিল না। তাই, 'বস্তুদের বিন্যাস' বইয়ের মধ্যে মানুষ হয়ত এক ধরনের ফারাক লক্ষ্য করতে পেরেছিল, কিন্তু একইসঙ্গে তারা তার মধ্যে ঘটমানতার পরিভাষাকে চিনতে না পেরে বিতৃষ্ণ হয়েছিল। তখন কী ঘটছিল? প্রথমত, ফরাসীরা ঔপনিবেশিক যুগের অবসানের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল— আর ফ্রান্সের মতো একটা দেশ যার সংস্কৃতি জাতীয়তাবাদী অহংকারের অক্ষের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, বিশ্বসভায় তার অবস্থান যে এখন কেবল প্রাদেশিক গুরুত্বের স্থানে সীমায়িত হয়ে যাচ্ছে, তা হজম করা তার পক্ষে সহজ ছিল না। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নকে যা যা ছদ্মবেশে ঢেকে রাখার চেষ্টা হয়েছিল তা ক্রমশ আরও বেশি বেশি করে খুলে পড়ছিল: টিটো, নিস্তালিনীকরণ, বুদাপেস্ত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ক্রমশ আরও বেশি বেশি করে প্রতিষ্ঠিত ছক ও মূল্যবোধগুলো উলটে যাচ্ছিল, বিশেষ করে বামপন্থী মহলে তো বটেই। আর শেষত, আলজেরিয়ার যুদ্ধকে ভুলে গেলে চলবে না। ওই

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সবচেয়ে আপোষহীন লড়াই যারা লড়েছিল, তাদের অনেকেই ছিল ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য বা কাছের লোক। কিন্তু তাদের সেই লড়াইয়ে তারা কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থন পায়নি। আলজেরিয়া যুদ্ধ নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি একটি ধোঁয়াশাভরা অস্পষ্ট অবস্থান বজায় রেখেছিল। আর এর জন্য কম্যুনিস্ট পার্টিকে পরে কড়া মূল্য চুকোতে হয়েছিল— ধীরে ধীরে ছাত্র-যুবদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল, যার চূড়ান্ত রূপ শেষ পর্যন্ত ১৯৬৮-১৯৭০ সালে দেখা যায় যখন ছাত্র-যুব ও কম্যুনিস্ট পার্টি একদম খোলাখুলি মুখোমুখি বিরোধের অবস্থানে দাঁড়িয়ে যায়। কম্যুনিস্ট পার্টি, ন্যায্য লড়াই ও ন্যায্য উদ্দেশ্য— এই তিনটিকে সমার্থক ধরে নিয়ে বামমনস্কদের মধ্যে যে সরল বিশ্বাস দীর্ঘদিন খাড়া ছিল, সেই বিশ্বাসও আলজেরিয়ার যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভেঙে পড়ল। এর আগে যখন কেউ কম্যুনিস্ট পার্টির সমালোচনা করত, সে সমালোচনা সবসময় এই পূর্বনির্ধারিত সারসংকলন দিয়ে শেষ হতো যে সবকিছু সত্ত্বেও সাধারণভাবে পার্টি সঠিক দিকেই আছে। একই কথা সাধারণভাবে বলা যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে আগেকার সমালোচনা সম্পর্কেও। কিন্তু আলজেরিয়ার পর কম্যুনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি এই ধরনের শর্তনিরপেক্ষ আনুগত্যের বাঁধুনির সেলাই ছিঁড়ে খুলে পড়ছিল। নিঃসন্দেহে এই নতুন সমালোচনাত্মক অবস্থানকে সূত্রায়িত করে হাজির করা সহজ ছিল না কারণ তার যথাযথ পরিভাষা তখনও তৈরি হয়নি আর ডানপন্থীদের চালু পরিভাষাও এখানে গ্রহণীয় ছিল না।

এই সমস্যার সমাধান এখনও হয়নি। আর এটাই হল অন্যতম একটি কারণ যার জন্য অসংখ্য প্রশ্নের জট ছাড়ানো যায়নি এবং তাত্ত্বিক বিতর্কগুলো তিক্ত ও ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। এই কথাটাই আমি বলতে চাইছি: ডানপন্থীদের ভাষায় কথা না বলে স্তালিনবাদ, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন নীতি এবং ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক দোদুল্যমানতার বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা হাজির করা খুব সহজ কাজ ছিল না। আর তা কি আজও সত্য নয়?

ত্রোমবাদোরি: হ্যাঁ, তা আজও সত্য বলে আমার মনে হয়। কিন্তু পরিভাষার কথা উঠলে বলতে হয় যে আপনি যখন 'জ্ঞানের প্রত্নশাস্ত্র' (The Archaeology of Knowledge) লিখলেন, তখন তত্ত্বকাঠামোসমূহ

(epistemes) ও প্রতর্কমূলক সূত্রায়ণসমূহের ধারণা প্রতিষ্ঠা করার পর বৈজ্ঞানিক প্রতর্কের একটি বস্তুগত বা প্রতিষ্ঠানগত শর্ত হিসেবে বিবৃতির (the enonce) ধারণার মধ্য দিয়ে একটি অবস্থান-বদল ঘটালেন। দিশামুখের এই স্পষ্ট পরিবর্তন যা আপনার এখনকার গবেষণার ক্ষেত্র সংজ্ঞায়নেও কাজ করছে বলে মনে হয়, তা কি কোনও এক ভাবে ১৯৬৮-১৯৭০ বছরগুলোর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উথালপাতালগুলোর জন্যই ঘটেনি?

ফুকো: না। 'জ্ঞানের প্রত্নশাস্ত্র' আমি ১৯৬৮ সালের আগেই লিখেছিলাম, যদিও তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। ওই কাজটি আসলে বৌদ্ধিক মহলে প্রচুর আলোড়ন ও অস্পষ্টতা তৈরি করা অবয়ববাদ সম্পর্কে চলা বিতর্ক-আলোচনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে রূপ পেয়েছিল। এর আগে আপনি আমার সম্পর্কে পিয়াজেত-য়ের সমালোচনার উল্লেখ করেছিলেন। আমার মনে পড়ে যাচ্ছে যে ওই সময় পিয়াজেত-য়ের একজন ছাত্র স্বলিখিত একটি প্রবন্ধ আমার কাছে পাঠিয়েছিল। সেই প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যে আমি আসলে এক ধরনের অবয়ববাদী বিশ্লেষণ করলেও আমার কাজে অবয়ববাদ সম্পর্কে কোনও তত্ত্বের হদিস মেলে না। তার কয়েক মাস পরে পিয়াজেত স্বয়ং একটি বই প্রকাশ করলেন যেখানে আমাকে খাড়া করা হল অবয়ববাদের এমন এক তাত্ত্বিক হিসেবে যে অবয়বসমূহের কোনও বিশ্লেষণ করে না— অর্থাৎ, তাঁর ছাত্রের ভাবনার ঠিক উলটো। সুতরাং আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে একজন শিক্ষক ও তাঁর ছাত্রও যখন অবয়ববাদ ও অবয়বের মানে নিয়ে একমত হতে পারে না, তখন সমস্ত আলাপ-আলোচনাটাই কেমন বিকৃত বিপথগামী হয়ে পড়ে! এমনকি আমার কাজের সমালোচকরাও প্রকৃত জানত না যে কী নিয়ে তারা সমালোচনা করছে। তাই আমি আমার নিজের দিক থেকে স্পষ্ট করার প্রয়াস গ্রহণ করলাম যে কীভাবে আমার কাজগুলো একই ধরনের কিছু সমস্যাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে, যা হল: নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ বিধিনিয়ম এবং প্রতিভাসিত হওয়ার শর্ত সম্পন্ন প্রতর্কমূলক চর্চাগুলোর দ্বারা নির্মিত কোনও নির্দিষ্ট বস্তুকে কীভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব? আমার সেই প্রয়াস থেকেই 'জ্ঞানের প্রত্নশাস্ত্র' বইটির জন্ম।

ত্রোমবাদোরি: ১৯৬৮ সালে এসে আরেকটি তাত্ত্বিক ধারা নতুনভাবে সম্মান আদায় করে নিয়েছিল এবং যুব মহলে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখনীয় বিষয়

হয়ে উঠেছিল। আমি ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের কথা বলছি এবং এখন তাই নিয়ে কথা বলতে চাইব। থিওডোর অ্যাডোর্নো, ম্যাক্স হোর্কহেইমার, এবং বিশেষ করে হারবার্ট মারকুস তাঁদের কাজ নিয়ে ছাত্রদের মতবাদিক বিতর্কের কেন্দ্রে চলে এসেছিলেন। অবদমনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা, সভ্যতার নাগালের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া, ব্যবস্থার বিপ্লবী নেতিকরণ: তরুণরা বিভিন্ন মাত্রায় বুঝে বা না বুঝে এই বিষয়গুলি নিরন্তর লোফালুফি করত। এই তাত্ত্বিক ধারার সাপেক্ষে আপনার ভাবনাচিন্তার অবস্থান কী তা শুনতে চাইব, বিশেষত যেহেতু এই নিয়ে কখনও সরাসরি আপনি কিছু লেখেননি।

ফুকো: জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে নাজিবাদের দ্বারা বিতাড়িত হওয়ার পর ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রতিনিধিদের অনেকজন পারি-তে এসে নিজেদের কাজকর্ম করা সত্ত্বেও কীভাবে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল এত দীর্ঘদিন ধরে ফ্রান্সে অজানা থেকে গিয়েছিল, তা আরও স্পষ্ট করে বোঝা জরুরী।

মারকুস-য়ের চিন্তাভাবনা, বিশেষ করে তাঁর 'ফ্রয়েডীয়-মার্কসবাদ'-য়ের সূত্র ধরে লোকজন কিছুটা উত্তেজনা নিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের কথা বলতে শুরু করে। আমার নিজের কথা বলতে হলে, আমি ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতাম না। আমার কাছেতার বিষয় খুব স্পষ্ট হয়নি এমন কিছু আলাপআলোচনার অংশ হিসেবে হোর্কহেইমারের অল্প কিছু লেখা আমি পড়েছিলাম। সেই লেখাগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক ধরনের আলগা মনোভাবের ছাপ রয়ে গেছে। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল নিয়ে আমি আগ্রহী হয়ে উঠি দণ্ডদানের কলকৌশল নিয়ে লেখা একটি অসাধারণ বই পড়ার পর। বইটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লেখা হয়েছিল, লিখেছিলেন কিরস্চহেইমার।

বইটা পড়ার পর আমার উপলব্ধি হয়েছিল যে বছরের পর বছর ধরে আমি যা বলার চেষ্টা করছি, আমার আগে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রতিনিধিরাও তা বলার চেষ্টা করেছিলেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল যা করেছিল, ফ্রান্সেও লোকে তার সঙ্গে একদম এক না হলেও সমগোত্রীয় কাজ করছে দেখে কেউ কেউ যে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, তার ব্যাখ্যাও এখানেই। সঠিকতা ও তাত্ত্বিক উৎপাদনশীলতার তাগিদে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের কাজ আরও অনেক আন্তরিকতার সঙ্গে পাঠ করা দরকার ছিল। আমার নিজের মনে হয় যে

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের দার্শনিকরা এমনসব সমস্যা উত্থাপন করেছিলেন যেগুলোর সঙ্গে আজও আমাদের মোকাবিলা করে যেতে হচ্ছে। তাদের মধ্যে একটি সমস্যার কথা বিশেষ করে বলতে হয়। তা হল: ষোল শতক সময়কাল থেকে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক বিচারে পাশ্চাত্যে রূপধারণ করা যুক্তিসংগতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে ক্ষমতার ফলাফল বিশ্লেষণ। সেই বিশেষ রূপের যুক্তিসংগতির চর্চা ছাড়া পাশ্চাত্য তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফলগুলো অর্জন করতে পারত না। আর কার্যত কীভাবেই বা সেই যুক্তিসংগতির সঙ্গে ক্ষমতার সেইসব কলকৌশল, পদ্ধতি, প্রকৌশল ও প্রভাবকে পৃথক করা যায়, যেগুলো ওই যুক্তিসংগতিরই সহগামী এবং যেগুলোকে পুঁজিবাদী সমাজের— আর হয়ত বা সমাজতান্ত্রিক সমাজেরও— বৈশিষ্ট্যসূচক নিপীড়নের রূপ বলে বর্ণনা করে সেগুলো সম্পর্কে আমাদের বিতৃষ্ণাই আমরা প্রকাশ করে থাকি? এমন সিদ্ধান্তে কি পৌঁছানো যায় না যে যুক্তির চর্চা করার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের যে আশ্বাস আলোকপ্রাপ্তির যুগ দিয়েছিল, তা পুরোপুরি উলটে গিয়ে স্বয়ং যুক্তির দ্বারাই এমন আধিপত্যের প্রসার ঘটছে, যা স্বাধীনতাকে ক্রমশ নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে? এইটি একটি মৌলিক সমস্যা যার মোকাবিলা আমাদের প্রত্যেককে করতে হচ্ছে— সে কম্যুনিস্ট হোক বা না হোক— এই সমস্যা তার ঘাড়ে চেপে আছে। আর আমরা জানি যে এই সমস্যাটিকে হোর্কহেইমারই সবার প্রথম আলাদা করে সামনে তুলে এনেছিলেন; আর ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলই এই প্রকল্পের সাপেক্ষে মার্কস-উল্লেখ-অভ্যাসকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছিল। মার্কসের লেখায় থাকা শ্রেণিহীন সমাজের ধারণা একটি বিপুলাকার কারখানার অনুরূপ— একথা কি হোর্কহেইমারই বলেননি?

ত্রোমবাদোরি: আপনি এই চিন্তাধারাকে বড় মাপের গুরুত্ব দিচ্ছেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের যে ভাবনা-অনুমানগুলোকে আপনি এভাবে সংক্ষেপে সারসংকলন করলেন, সেগুলোর উৎপত্তির কারণ কী ছিল বলে আপনার মনে হয়?

ফুকো: জার্মানি যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নের খুব কাছে অবস্থিত, তাই জার্মানিতে থাকার সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে কী ঘটে চলেছে তা জানার আরও ভালো সুযোগ ছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের দার্শনিকদের কাছে। আর তা ছিল চলমান এক তীব্র ও নাটকীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে যখন

নাজিবাদ ওয়েইমার প্রজাতন্ত্রের কবর খুঁড়ছিল এমন এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে যেখানে মার্কসবাদ ও মার্কস-চর্চার দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের পরম্পরা বর্তমান।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল দার্শনিকদের গুরুত্ব স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে আমি এই আত্মসমালোচনাও করতে চাই যে তাঁদের কাজ আরও বেশি করে আরও আগেই আমার পড়া উচিত ছিল, আরও অনেক আগেই তাঁদের কাজ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা উচিত ছিল। যদি তা করতাম, অনেক কিছুর পুনরুক্তি করা থেকে আমি রেহাই পেতাম, আর বেশ কিছু ভুলও হয়ত এড়াতে পারতাম। অবশ্য, তরুণ বয়সে যদি ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের দার্শনিকদের সঙ্গে আমি পরিচিত হতাম, হয়ত আমি তাঁদের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়তাম যে আর কিছু না করে আমি তাঁদের কাজের ব্যাখ্যা-বিশদীকরণই করে যেতাম। তাই তাঁদের সঙ্গে দেরিতে পরিচিত হওয়া বা পরিপক্ক বয়সে এসে কিছুটা তৈরি অবস্থায় তাঁদের আবিষ্কার করা মন্দ হয়েছে নাকি ভালো হয়েছে তা বলা অসম্ভব।

ব্রোমবাদোরি: ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের কী কী আপনাকে মুগ্ধ করে কেবল তাই নিয়েই এখনও অবধি আপনি বলেছেন, কিন্তু আমি জানতে চাইব যে আপনি কেন ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের থেকে পৃথক অবস্থান বজায় রাখেন। যেমন ধরা যাক, ফ্রাঙ্কফুর্ট দার্শনিকরা এবং তাঁদের স্কুলের পক্ষ থেকে ফরাসী অবয়ববাদের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করা হয়েছিল। স্মরণ করা যেতে পারে লেভি-স্ত্রস, আলথুজার এবং আপনাকে নিয়ে আলফ্রেড স্মিড-য়ের লেখা, যেখানে আপনাদের তিনজনকে তিনি 'ইতিহাসকে অস্বীকার করা'-র দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন।

ফুকো: হ্যাঁ, অতি অবশ্যই কিছু পার্থক্য আছে। কিছুটা সরল করে বলতে গেলে বলতে হয় যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল বিষয়ী সম্পর্কে যে ধারণাটি গ্রহণ করেছিল, তা ছিল মার্কসবাদী মানববাদে সিক্ত নেহাত প্রথাগত ও দার্শনিক চরিত্রের ধারণা। ফ্রয়েডীয় কিছু ধারণার সঙ্গে তার যোগসূত্রগুলো, যেমন, অনধ্বয় ও অবদমনের মধ্যে সম্পর্ক, মুক্তির সঙ্গে অনধ্বয়ের অবসান ও শোষণের অবসানের সম্পর্ক, এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। আমার মনে হয় না যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল এটা গ্রহণ করতে পারবে যে আমাদের যা করা দরকার তা আমাদের হারিয়ে যাওয়া পরিচয়কে পুনরুদ্ধার করা নয়, আমাদের

শিকলবাঁধা প্রকৃতি-প্রবৃত্তিকে মুক্ত করা নয়, বা এমনকি আমাদের মৌলিক সত্যকে আবিষ্কার করাও নয়, বরং যা দরকার তা হল সম্পূর্ণ আলাদা কিছুর দিকে যাত্রা করা।

মার্কসের একটি বাক্যাংশ এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে: 'মানুষ মানুষকে উৎপাদন করে'। এর মানে আমরা কীভাবে করব? আমার বিচারমতে, যা উৎপাদন করতে হবে তা মানুষের সেই প্রাকৃতিক রূপ নয় যা প্রকৃতি দ্বারা প্রদত্ত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, বা সেই মৌল রূপও নয় যা নাকি মানুষের অন্তর্নির্যাস দ্বারা নির্দিষ্ট, বরং এমনকিছু উৎপাদন করতে হবে যার অস্তিত্ব এখনও অবধি নেই, কী গড়ে তুলছি তার পূর্ণ রূপ আগে থেকে জানা অসম্ভব।

'উৎপাদন' কথাটা ধরলে, আমি তাদের সঙ্গে একমত নই যারা ধরে নেয় যে মানুষ দ্বারা মানুষের এই উৎপাদন মূল্য, সম্পদ বা অর্থনৈতিকভাবে দরকারী বস্তুর উৎপাদনের মতো করেই হয়। এটা হল আমরা এখন যা তার ধ্বংসসাধন ও একইসঙ্গে একটি সম্পূর্ণ আলাদা বস্তুর নির্মাণ, সম্পূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন কিছুতে পৌঁছানো। অন্যদিকে, ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রতিনিধিরা এই মানুষ দ্বারা মানুষের উৎপাদন সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন তা হল মূলগতভাবে মানুষকে সেই সমস্তকিছু থেকে মুক্ত করা যা তাকে তার মৌল অন্তর্নির্যাস থেকে অনন্বিত করে রেখেছে — যেমন, যুক্তিসংগতির সঙ্গে যুক্ত অবদমনের ব্যবস্থা, বা, শ্রেণিসমাজের সঙ্গে যুক্ত শোষণের ব্যবস্থা।

ত্রোমবাদোরি: পার্থক্যটা হয়ত দানা বেঁধে আছে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের দার্শনিকদের এই অস্বীকারের প্রবণতার মধ্যে যার ফলে তাঁরা ঐতিহাসিক-কুলজিশাস্ত্রীয় অর্থে মানুষের উৎপত্তিকে ভাবেন না, বরং আধিবিদ্যক অর্থে ভাবেন। মানুষের মৃত্যুর রূপক বা প্রসঙ্গটিই এখানে পার্থক্য গড়ে দিচ্ছে বলে মনে হয়।

ফুকো: আমি যখন 'মানুষের মৃত্যু'-র কথা বলি, তখন আমি মানুষ দ্বারা মানুষের উৎপাদনের নিয়ম বেঁধে দিতে পারে এমন সমস্ত কিছুর অবসানের কথা বোঝাই, এই উৎপাদনের কোনও আবশ্যিক লক্ষ্য নির্ধারিত করার অভ্যাসের অবসানের কথা বোঝাই। 'বস্তুদের বিন্যাস' বইয়ে এই মৃত্যুকে আমাদের যুগেই ঘটমান একটি ঘটনা হিসেবে দেখানোর ভুল আমি

করেছিলাম। দুটো দিককে আমি বাড়িয়ে দেখেছিলাম। প্রথমটি হল একটি ছোট মাপের প্রতীতি: তা হল এহেন পর্যবেক্ষণ যে বিকাশলাভ করা বিভিন্ন ধরনের মানববিজ্ঞানে— যে অভিজ্ঞতায় বিষয়ীভাবকে প্রযুক্ত করে এবং সেই সুবাদে তাকে রূপান্তরিতও করে— মানুষ কখনওই নিজেকে মানুষের গন্তব্যের শেষবিন্দুতে গিয়ে খুঁজে পায়নি।

মানববিজ্ঞানসমূহ যদি আমাদের মানুষকে আবিষ্কার করতে সফল করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই সেই প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করেনি। বরং, মানব-বিষয়ীকে জ্ঞানের একটি বিষয়ে পরিণত করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এক নতুন বিষয়ীভাব গঠন করেছে।

এর সঙ্গে আমি দ্বিতীয় যে বিষয়টি গুলিয়ে ফেলেছিলাম তা হল এই যে ইতিহাসের যাত্রাপথে মানুষ কখনওই নিজেকে নির্মাণ করার কাজ থামায়নি, অর্থাৎ, সবসময়েই মানুষ অনবরত তার বিষয়ীভাবকে স্থানচ্যুত করতে করতে গেছে, বিভিন্ন বিষয়ীভাবের এক অনন্ত বহুত্বপূর্ণ অনুক্রমে নিজেদের নির্মাণ করতে করতে গেছে, আর এই অনুক্রমের কোনও শেষ নেই, কখনওই এই অনুক্রম এমন কিছুর সান্নিধ্যে এনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেবে না যাকে অবিসংবাদিত 'মানুষ' বলে ধরে নেওয়া যায়। মানুষ প্রতিনিয়তই এমন একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে নিযুক্ত যা বিষয়কে নির্মাণ করার সময় একইসঙ্গে মানুষকে স্থানচ্যুত করছে, বিকৃত করছে, আকার বদলে দিচ্ছে এবং বিষয়ী হিসেবে তাকে রূপান্তরিত করছে। তখন হয়ত মনুষের মৃত্যু নিয়ে আমি কিছুটা এলোমেলো ভাবে ও কিছুটা সরলীকরণ করে কথা বলেছিলাম, কিন্তু সেই কথার মূল বক্তব্যে আমি অনড় আছি। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সঙ্গে আমার খাপ খায় না ঠিক এই জায়গাটাতেই।

ত্রোমবাদোরি: মানববাদ-বিরোধিতার মূলভাবের মধ্য দিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপনার এই যে পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট, তার প্রতিফলন ইতিহাসকে দেখার ও বিশ্লেষণ করার পদ্ধতির মধ্যে কীভাবে পড়েছে?

ফুকো: ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক হল একটি উপাদান যেদিক থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের দার্শনিকরা আমাকে হতাশ করেছিলেন। আমার মনে হয়েছিল যে তাঁরা পূর্ণ অর্থে ইতিহাস লেখার কাজে খুব হাত দেননি, সেই বিষয়ে তাঁরা অন্য গবেষকদের করা কাজকে উল্লেখ করতেন। তাঁরা

সাধারণত মার্কসবাদী ঝোঁকের বেশ কিছু ভালো ইতিহাসবিদদের লেখা ও প্রমাণীকৃত করা ইতিমধ্যেই লিখিত ইতিহাসকে তাঁদের লেখার ব্যাখ্যামূলক প্রেক্ষাপট হিসেবে হাজির করতেন। তাঁদের কেউ কেউ দাবি করেন যে আমি ইতিহাসকে অস্বীকার করি। আমার বিশ্বাস সার্ত্রেও এই একই কথা মনে করেন। তাঁদের সম্পর্কে বলা যায় যে তাঁরাই বরং অন্যের তৈরি করে দেওয়া ইতিহাসের খাদক। অন্যের তৈরি করে দেওয়া ইতিহাস নিজেরা আর কোনও পরিপাক না করেই তাঁরা ভক্ষণ করেন। আমি এমনটা বলতে চাইছি না যে প্রত্যেকে তার সুবিধামতো একটা ইতিহাস তৈরি করে নেবে, কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে ইতিহাসবিদদের কোনও কাজ কখনওই আমাকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারেনি। অসংখ্য ইতিহাসের পাঠকে আমার কাজে উল্লেখ বা ব্যবহার করলেও আমি সবসময় আমার আগ্রহের ক্ষেত্রগুলোয় নিজেহাতে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করার উপর জোর দিয়েছি।

অন্যদিকে, ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের দার্শনিকরা যখন ইতিহাসকে ব্যবহার করেন, তখন আমার মনে হয় তাঁদের যুক্তিটা হয় এইরকম: পেশাদার ইতিহাসবিদদের কাজ তাঁদের এক ধরনের বস্তুগত ভিত্তির যোগান দেয় বলে তাঁরা বিবেচনা করেন, যে বস্তুগত ভিত্তি অন্য ধরনের কিছু প্রতীতির— যেগুলোকে তাঁরা 'সমাজতত্ত্বগত' বা 'মনোবিদ্যাগত' প্রতীতি বলেছেন, সেইরকম কিছু প্রতীতির— ব্যাখ্যা হাজির করতে পারে। এই ধরনের মনোভাবের পিছনে দুটি স্বতঃসিদ্ধ কাজ করে। প্রথম স্বতঃসিদ্ধটি হল এই যে দার্শনিকরা যা নিয়ে কথা বলেন তা ঘটমান ইতিহাসের সঙ্গে একই স্তরে অবস্থিত নয় (অর্থাৎ, কারও মাথার মধ্যে যা ঘটে তা হল একটি সামাজিক প্রতীতি এবং তা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাপেক্ষে বাস্তবতার ভিন্নতর স্তরে অবস্থিত)। দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধটি হল এই যে ইতিহাস যদি সুনির্মিত বলে স্বীকৃত হয় এবং অথনীতি সম্পর্কে কথা বলে, তাহলে ব্যাখ্যাদায়ী গুণ তার মধ্যে নিহিত থাকে।

কিন্তু এই ধরনের যুক্তিবিস্তার যেমন অতিরিক্ত মাত্রায় পরিমিত, তেমনই অতিরিক্ত মাত্রায় বিশ্বাসপ্রবণ। তা অতিরিক্ত মাত্রায় পরিমিত কারণ সবকিছু বিচারের মধ্যে ধরলে, একজন ব্যক্তির মনে বা একসারি ব্যক্তির মনে যা ঘটছে তা আসলে ইতিহাসেরই অংশ: কিছু বলাও তো একটা ঘটনা। কোনও বৈজ্ঞানিক প্রতর্কের সূত্রায়ন ইতিহাসের ঊর্ধে বা ইতিহাসের পাশে পড়ে থাকা কোনও বস্তু নয়: তা ঠিক ততটাই ইতিহাসের অংশ যতটা

কোনও যুদ্ধবিগ্রহ বা বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কার বা কোনও মহামারীকে ইতিহাসের অংশ বলে মনে করা হয়। অবশ্যই এগুলো সব একই ধরনের ঘটনা নয়, কিন্তু ঘটনা তো এরা সবগুলোই। উন্মত্ততা সম্পর্কে গর্দভতুল্য কথা বলেছেন যে চিকিৎসক তিনিও ততটাই ইতিহাসের অংশ যতটা অংশ হল ওয়াটারলুর যুদ্ধ।

তাছাড়া, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের যা-ই গুরুত্ব থাকুক না কেন, এমনটা যদি ধরে নেওয়া হয় যে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করা যে কোনও বিশ্লেষণেরই ব্যাখ্যাদায়ী গুণ আছে, তাহলে তা এক আনাড়ির মতো কাজ হবে, বা আরেকটু যোগ করে বলা যায়, ইতিহাসচর্চায় অভ্যস্ত নয় এমন অপেশাদারের মতো কাজ হবে। আবশ্যিকভাবে তা কখনওই সত্য নয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কয়েক বছর আগে কিছু উৎসাহী মহল থেকে এই প্রশ্নটি উঠে এসেছিল যে আঠারো শতকে কেন বিশেষ করে শিশুদের যৌনতা ও স্বমেহনকে কেন্দ্র করে যৌন বিধিনিষেধের বাড়বাড়ন্ত দেখা গিয়েছিল? কিছু ইতিহাসবিদ এই প্রতীতির ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এটা দেখিয়ে যে সেই সময়পর্বে বিয়ের বয়স ঠেলে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তরুণ-তরুণীদের আরও দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। এখন এই জনসমীক্ষাগত সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যই অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু তা মোটেই যৌন বিধিনিষেধের ব্যাখ্যা হতে পারে না। প্রথমত, ঠিক বিবাহের আগের বছরগুলোতেই কেন কেউ স্বমেহন করতে শুরু করবে? দ্বিতীয়ত, বিয়ের বয়সকে ঠেলে পিছিয়ে দেওয়ার ফলে বছরের পর বছর বড় সংখ্যক তরুণ-তরুণীদের অবিবাহিত থাকতে হয়েছিল বলে যদি ধরেও নিই, তাহলেই বা তার ফল কেন অধিকতর যৌন অবদমন হিসেবে দেখা দেবে, কেন যৌন স্বাধীনতার বিস্তার রূপে দেখা দেবে না? এমনটা হতেই পারে যে বিয়ের বিলম্ব ও তার সঙ্গে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন যোগাযোগ এই প্রতীতি সম্পর্কে বোঝাবুঝিতে একটা আংশিক স্থান পেতে পারে। কিন্তু জ্ঞান(savoir)-য়ের উৎপাদনের মতো আরও জটিল প্রতীতির কথা ধরলে, বা, নিজস্ব কলকৌশল ও নিজস্ব আভ্যন্তরীণ বিধি সম্পন্ন কোনও প্রতীতির উৎপাদনের কথা ধরলে ব্যাখ্যা ও স্পষ্টীকরণের কাজ অনেক বেশি জটিল। শেষ অবধি কোনও একটা ব্যাখ্যায় পৌঁছানো যাবে বা আবশ্যিকতার শর্তে কোনও একটি ব্যাখ্যাকে খাড়া করা যাবে এমনটার সম্ভাবনা খুবই কম। যে প্রতীতির

বিশ্লেষণ করতে চাওয়া হচ্ছে, তার সঙ্গে সংযুক্ত এক গুচ্ছ প্রতীতির অন্তত কিছু যোগাযোগকেও যদি হাজির করা সম্ভব হয়, তা-ই অনেক হয়েছে বলে ধরতে হবে।

ত্রোমবাদোরি: তহলে আপনার মতে কি তাত্ত্বিক ভাবনাচিন্তা সবসময় ঐতিহাসিক উপাদানকে একটি বিশেষ ভাবে ব্যবহার করার সঙ্গে বাঁধা থাকে? ইতিহাস নির্মাণ করা বা ব্যাখ্যা করা ব্যতিরেকে ভাবনাচিন্তার কাজ আর কিছুই নয়?

ফুকো: ইতিহাসকে— ধরা যাক, সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসকে— একটি সাংস্কৃতিক প্রতীতির উপর এমনভাবে প্রক্ষেপ করা যাতে সেই ইতিহাসকে ওই প্রতীতির আবশ্যক বাহ্য ফলাফল হিসেবে দেখানো যায়— এভাবে আমি কাজ করি না। আমি যে ধরনের বোধগ্রাহ্যতা উৎপাদন করতে চাই তাকে ওই প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত করা যায় না। কোনও একরৈখিক আবশ্যকীয়তা হয় না: যে কোনও সাংস্কৃতিক ফলও ইতিহাসের বুনটের একটি অংশ। সেইজন্যই আমি অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করার বাধ্যবাধকতা অনুভব করি। তাতে কেউ যদি এমনটা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে আমি ইতিহাসকে অস্বীকার করি, তবে তার চেয়ে হাস্যকর আর কিছু হয় না। ইতিহাস ছাড়া অন্য আর কিছুই আমি করি না। সেইসব অভিযোগকারী যে ইতিহাসের শরণাগত, সেই অস্পষ্ট পবিত্র সর্বব্যাখ্যাকারী ইতিহাসকে কেউ ব্যবহার না করলেই তা তাঁদের চোখে ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়ে যায়। এতে কি কোনও সন্দেহ থাকতে পারে যে চাইলেই আমি অ্যালবার্ট মাথিয়েজ বা অন্য কোনও ইতিহাসবিদের লেখা পাতা থেকে এটা বা ওটা উদ্ধৃত করতে পারি। আমি তা করি না কারণ আমি ওই একই ধরনের বিশ্লেষণ চর্চা করি না। এর থেকে আর বেশি কিছু এর মধ্যে নেই। আমি ইতিহাসকে অস্বীকার করি এমন অভিযোগ যতটা না পেশাদার ইতিহাসবিদদের মহল থেকে উত্থাপিত হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি উত্থাপিত হয় দার্শনিকদের সেই মহল থেকে যারা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের জন্য যে ধরনের পাঠ-সম্পর্ক প্রয়োজন, সেই একাধারে বিযুক্ত ও সম্মানপূর্ণ সম্পর্কের ব্যাপারে সম্যক সচেতন নয়। ইতিহাসের সঙ্গে তেমন এক সম্পর্ক গ্রহণ করতে অপারগ হয়েই তারা এমন সিদ্ধান্ত টানে যে আমি ইতিহাসকে অস্বীকার করি।

ত্রোমবাদোরি: পারিতে মে ১৯৬৮-র সময় ও তার অব্যবহিত পরের সময়টাতে অনেক ফরাসী বুদ্ধিজীবী ছাত্রদের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল। সেই অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নতুন ভাবে নতুন ভাষায় পুরানো অনেক প্রশ্ন আবার উত্থাপিত হয়েছিল, যেমন: দায়বদ্ধতার প্রশ্ন, রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্ন, সাংস্কৃতিক স্বতক্রিয়ার সম্ভাবনা ও সীমার প্রশ্ন। সেই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আপনার নাম পাওয়া যায় না। অন্তত ১৯৭০ সাল অবধি আপনি ফরাসী বুদ্ধিজীবী মহলের অন্যান্য ব্যক্তিত্বদের জড়িয়ে নেওয়া এই বিতর্কে অনুপস্থিত ছিলেন। মে ১৯৬৮-র অভিজ্ঞতা আপনার কাছে কীভাবে এসেছিল এবং তার তাৎপর্য আপনার কাছে কীভাবে ধরা দিয়েছিল?

ফুকো: আলজেরিয়ার যুদ্ধের সময়ে যেমন, তেমন এই ১৯৬৮-র মে মাসেও আবার আমি ফ্রান্সে ছিলাম না, তাই কিছুটা ঘটনাবলীর গতির পিছনে পড়ে ছিলাম একজন বাইরের লোকের মতো। যখন ফ্রান্সে ফিরে এলাম, বাইরের একজনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ব্যাপারটা কিছুটা মাত্রায় রয়েই গিয়েছিল। তাছাড়া, আমি যা বলি আর মানুষ যা শুনতে চায় তা সবসময় এক হয় না। আমার মনে আছে যে মারকুস একদিন নিন্দাপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করেছিলেন যে মে-র ব্যরিকেডের দিনগুলোতে ফুকো কী করছিল? উত্তরটা হল, আমি তখন তুনিসিয়ায় ছিলাম। আর এটুকুও জুড়তে চাই যে সেই তুনিসিয়ার অভিজ্ঞতাও আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আমার সৌভাগ্য যে নিজ-অভিজ্ঞতায় আমি সুইডেনে একটি ভালোভাবে কাজ করা সমাজ-গণতান্ত্রিক দেশকে দেখেছি আর পোল্যান্ডে একটি খারাপ ভাবে কাজ করা জনগণতন্ত্রকে দেখেছি। ১৯৬০ দশকের গোড়ায় ফেডেরাল জার্মানির অর্থনৈতিক প্রসারণের পর্বে সেখানে থাকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছিল। আর শেষাবধি, তুনিসিয়ার মতো একটি তৃতীয় বিশ্বের দেশে আমি আড়াই বছর বাস করেছিলাম। এই শেষ অভিজ্ঞতাটি আমার উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। ফ্রান্সের মে ১৯৬৮-র অল্প কিছু দিন আগে তুনিসিয়ায় অতি তীব্র ছাত্র-বিদ্রোহ ঘটেছিল। তখন ১৯৬৮-র মার্চ মাস। ধর্মঘট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কাজকর্ম মুলতুবি হয়ে যাওয়া, গ্রেফতার আর একটি সাধারণ ছাত্র-ধর্মঘটে তুনিসিয়া উত্তাল হয়ে উঠেছিল। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢুকে প্রচুর ছাত্রদের লাঠিপেটা করেছিল, অনেককে

গুরুতর জখম করেছিল, আর তারপর তাদের জেলখানায় পুরে আটকে রেখেছিল। আমার ফরাসী হওয়ার কারণে এবং অধ্যাপক পদমর্যাদার কারণে আঞ্চলিক আধিকারিকদের কোপ থেকে এক ধরনের নিরাপত্তা আমার ছিল, যা ব্যবহার করে কিছু কিছু জিনিষ আমি করতে পেরেছিলাম আর পাশাপাশি এই সমস্তকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসী সরকারের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও যথাযথ ধারণা করতে পেরেছিলাম। গোটা বিশ্বের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কী ঘটে চলেছে তার একটা প্রত্যক্ষ ধারণা আমার হয়েছিল।

সেইসব তরুণ মেয়ে আর ছেলেরা যারা একটা লিফলেট লেখা, তা বিতরণ করা বা ধর্মঘটের ডাক দেওয়ার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ঝুঁকি হেলায় নিত, তারা আমার মনে গভীর ছাপ ফেলে গিয়েছিল। আমার কাছে তা ছিল একটি প্রকৃত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা।

ত্রোমবাদোরি: তাহলে আপনার প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

ফুকো: হ্যাঁ, হয়েছিল। ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টি পি সি এফ-য়ে যোগ দেওয়ার পর কী ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল তা তো আগেই বলেছি, সেই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কেবল একটি চিন্তাশীল তিক্ততা ও অবিশ্বাসের রেশ রেখে গেছে। আমি সে কথা কখনও লুকিয়ে রাখি না। আলজেরিয় যুদ্ধের পর্বেও আমি সরাসরি অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হইনি, তবে আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার চিন্তা তার কারণ ছিল না। অন্যদিকে, তুনিসিয়ায় আমি ছাত্রদের সমর্থনে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম, এমনকিছুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে উঠেছিল যা ইউরোপের হরেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রতর্কাদির একঘেয়ে গোঙানির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।

যেমন ধরা যাক মার্কসবাদের কথা। ১৯৫০-১৯৫২ সালে আমাদের ছাত্রাবস্থায় তা আমাদের কাছে যে ভূমিকায় হাজির হয়েছিল, পোল্যান্ডের মতো একটি দেশে যেখানে তা একটি ধর্মীয় নিয়মাবলীর আকারে পড়ানো হয় আর সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে বেশিরভাগ তরুণ-তরুণীদের কাছে তা পুরোপুরি একটি ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হয়েছে, ১৯৬০-য়ের দশকের গোড়ায় ফ্রান্সে মার্কসবাদ নিয়ে যেসব ঠান্ডা কেঠো পণ্ডিতসুলভ আলোচনায় অংশ নিয়েছিলাম, সেই সবের কথা আমি ভাবি। আর ঠিক তার বিপরীতে তুনিসিয়ায় প্রত্যেকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী আগ্রহের সঙ্গে, তীক্ষ্ণতার সঙ্গে এবং

বৈপ্লবিক প্রাবল্যের সঙ্গে মার্কসবাদ ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইত। সেই তরুণ-তরুণীদের কাছে মার্কসবাদ বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করার একটি অধিকতর ভালো উপায় ছাড়া আর অতিরিক্ত কিছু ছিল না। একইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মার্কসবাদ তাদের কাছে ছিল এক প্রকার নৈতিক শক্তির উৎস, এক প্রকার অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় ক্রিয়া। তুনিসিয়ার ছাত্রছাত্রীদের মার্কসবাদী হওয়ার ধরন এবং ইউরোপে (ফ্রান্স, পোল্যান্ড, বা সোভিয়েত ইউনিয়নে) মার্কসবাদের কাজ করার যে ধরনের কথা আমি জানতাম— এই দুইয়ের মধ্যের পার্থক্য নিয়ে ভাবতে গেলে আমার মধ্যে একটা তিক্ত হতাশার ঢেউ উঠে আসত।

এই ছিল আমার কাছে তুনিসিয়া: রাজনৈতিক বিতর্কে যোগ দিতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। না, ফ্রান্সে মে ১৯৬৮-তে নয়, বরং তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে, ১৯৬৮ সালের মার্চে।

ত্রোমবাদোরি: কিছু কিছু রাজনৈতিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় চরিত্রের উপর আপনি বড়মাপের গুরুত্ব আরোপ করেন। তার কারণ কী? আপনার কি মনে হয় যে তা-ই হল প্রামাণিকতার একমাত্র পরিচয়? তরুণ তুনিসিয়দের ক্ষেত্রে তাদের মতবাদিক পছন্দ এবং তাদের ক্রিয়ার দৃঢ়সংকল্পতার মধ্যে একটা যোগ ছিল বলে কি আপনি মনে করেন না?

ফুকো: আজকের পৃথিবীতে কী এমন আছে যা একজন ব্যক্তির মধ্যে চরম ত্যাগের আকাঙ্খা, সক্ষমতা ও সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে পারে, আবার একইসঙ্গে এমন কোনও সন্দেহেরও অবকাশ রাখে না যে তার ক্রিয়া ক্ষমতা ও মুনাফার আকাঙ্খা দ্বারা চালিত হচ্ছে? সেই বস্তুটিকেই আমি তুনিসিয়ায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম— অতিকথার প্রয়োজনীয়তা, আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তার সাক্ষী হয়েছিলাম; পুঁজিবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের তৈরি করা কিছু পরিস্থিতির অসহনীয়তার সাক্ষী হয়েছিলাম।

এই ধরনের সংগ্রামে প্রত্যক্ষ, অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয়, দৈহিক অংশগ্রহণের প্রশ্ন ছিল অনিবার্য। মার্কসবাদের প্রতি তাত্ত্বিক আনুগত্য অনিবার্য বা আবশ্যক ছিল বলে আমি মনে করি না। একটু ব্যাখ্যা করা যাক। তুনিসিয়ার ছাত্রছাত্রীদের মার্কসবাদ নিয়ে পড়াশোনা খুব গভীর ছিল না, আর তা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আরও গভীর হওয়ার কোনও প্রবণতাও দেখা যায়নি।

তাদের মধ্যে প্রকৃত বিতর্ক যা নিয়ে চলত তা ছিল সংগ্রামের কৌশল ও প্রণালী হিসেবে তারা কী বেছে নেবে সেই প্রসঙ্গে এবং সেই বিতর্ক মার্কসবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা থেকে উপজাত পরিভাষা ব্যবহার করে পরিচালিত হতো। কিন্তু সেই পরিভাষার বহিরাবরণের ভিতরে আসল বিষয়গুলো ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সংগ্রাম শুরু করার জন্য রাজনৈতিক মতবাদ বা পৃথিবী সম্পর্কে একটি রাজনৈতিক উপলব্ধি নিঃসন্দেহে অপরিহার্য ছিল, কিন্তু অপরদিকে, সেই তত্ত্বের যথার্থতা বা তার বৈজ্ঞানিক চরিত্র সম্পূর্ণ অপ্রধান প্রশ্ন ছিল, যে অপ্রধান প্রশ্নগুলো যথাযথ ও সঠিক আচরণের নীতি হওয়ার চেয়ে বরং এক ধরনের প্রলোভনের বস্তু হিসেবেই বেশি কাজ করত।

ত্রোমবাদোরি: সংগ্রামে প্রাণোচ্ছল ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের যে অভিজ্ঞতা আপনার তুনিসিয়ায় হয়েছিল, তার কোনও চিহ্ন কি ফ্রান্সেও আপনি দেখেননি? তুনিসিয়া ও ফ্রান্সের এই দুই অভিজ্ঞতার মধ্যে কী কী সম্পর্ক আপনি দেখতে পেয়েছিলেন? মে ১৯৬৮-র পর ছাত্রদের সংগ্রামগুলোর সংযোগে আসার সিদ্ধান্ত আপনি কীভাবে নিয়েছিলেন? কীভাবে এমন সংলাপের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন যা আপনাকে বিবিধ ঘটনায় নির্দিষ্ট অবস্থান নিতে প্রবৃত্ত করেছিল, বন্দিশালার দশা বিষয়ে 'জেলখানা সম্বন্ধে তথ্য উপস্থাপক গোষ্ঠী' (Groupe d'information sur les prisons বা জি আই পি)-র মতো আন্দোলনে সার্ত্রে, জাঁ-মারি দোমেনাখ, মরিস ক্লাভেল-দের মতো বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ অংশ নিতে প্রবৃত্ত করেছিল?

ফুকো: ১৯৬৮ সালের নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে আমি যখন ফ্রান্সে ফিরে এলাম, তখন তুনিসিয়ায় আমি যা দেখে এসেছি তার বিচারে ফ্রান্সের ঘটনাবলী আমাকে অবাক করেছিল, এমনকি হতাশ করেছিল বলেও বলা যায়। তার অহিংসা, আবেগ, লড়াই সত্ত্বেও ফ্রান্সের আন্দোলনকে তুনিসিয়ার মতো একই ত্যাগ বা একই মূল্য চুকোতে হয়নি। পারির লাতিন কোয়ার্টারের ব্যারিকেডে অংশ নেওয়া আর তুনিসিয়ায় পনেরো বছরের জন্য জেলে যাওয়ার বাস্তব ঝুঁকি নেওয়ার মধ্যে কোনও তুলনা হতে পারে না। ফ্রান্সে মানুষজনের মুখে ঘুরছিল অতি-মার্কসবাদের কথা, তত্ত্বের দ্রুত বংশবিস্তারের কথা, ছোট ছোট উপগোষ্ঠীতে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার কথা। এসবের ঠিক বিপরীত বা উলটোটাই তুনিসিয়ায় আমার কৌতূহল

জাগিয়েছিল। হয়ত সেই কারণেই তারপর থেকে আমি ওইসব অন্তহীন আলোচনা, ওই অতি-মার্কসবাদীকরণ, অপ্রাসঙ্গিকতায় বিচরণের ওই অদম্য অভ্যাস যা সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল ও বিশেষ করে ১৯৬৯-য়ের ভিনসেঁজ-কে ছেয়ে রেখেছিল, তার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে অন্যভাবে এগোনোর চেষ্টা করি। আমি এমনভাবে কিছু করার চেষ্টা করেছিলাম যার জন্য ব্যক্তিগত, দৈহিক ও প্রকৃত অংশগ্রহণ দরকার, যা সমস্যাগুলোকে তাদের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মূর্ত, যথাযথ ও স্পষ্ট রূপে মোকাবিলা করবে। কেবলমাত্র সেই মুহূর্ত থেকেই প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণের প্রস্তাব উঠে আসবে। জি আই পি-র সঙ্গে বন্দিদের সমস্যা নিয়ে কাজ করার সময় আমি একটি অভিজ্ঞতার সূচনা ও নির্বাহ করার চেষ্টা করেছিলাম। একই সঙ্গে তা আমার জন্য 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' এবং 'চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্ভব' বইগুলো লেখার সময় বিচার করা প্রশ্নগুলোকে আবার ফিরে বিচার করার এবং পাশাপাশি সদ্য-ঘটা তুনিসিয়ার অভিজ্ঞতা নিয়েও ভাবনাচিন্তা করার একটা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল।

ত্রোমবাদোরি: মে ১৯৬৮ নিয়ে কথা বলতে গেলেই আপনি এমন এক স্বরে কথা বলেন যা ওই ঘটনার তাৎপর্যকে ছোট করে দেখায়; আপনি যেন ওই ঘটনার বিদঘুটে মতবাদ-জপা দিকটিকেই কেবল দেখতে পান। তার সীমাবদ্ধতাগুলোকে, বিশেষ করে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে টুকরো টুকরো হওয়ার ব্যাপারটাকে, দেখানো অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মে ১৯৬৮-তে প্রায় গোটা ইউরোপ জুড়ে যে গণ-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার গুরুত্ব কোনওভাবেই খাটো করা উচিত নয় বলে আমার মনে হয়।

ফুকো: নিঃসন্দেহে মে ১৯৬৮ ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। মে ১৯৬৮ না ঘটলে নিশ্চিতভাবেই আমি তার পরে বন্দিশালা, অপরাধ ও যৌনতা প্রসঙ্গে যে সব কাজ করেছিলাম তা করতে পারতাম না। ১৯৬৮-র পূর্ববর্তী পরিস্থিতিতে সেসব করা সম্ভব ছিল না। আমি এমনটা বলতে চাইনি যে আমার কাছে মে ১৯৬৮-র কোনও গুরুত্ব নেই, বরং বলতে চেয়েছি যে ১৯৬৮-র শেষ এবং ১৯৬৯-য়ের গোড়ার দিকের সবচেয়ে দৃশ্যমান এবং অগভীর কিছু কিছু দিকের সঙ্গে আমি নিজেকে মেলাতে পারতাম না। প্রকৃত অর্থে যা নিয়ে লড়াই ছিল, যা প্রকৃতই বদল ডেকে এনেছিল, ফ্রান্স ও তুনিসিয়ার ক্ষেত্রে তা ছিল অভিন্ন। কেবলমাত্র ফ্রান্সে মে ১৯৬৮ নিজের

সম্পর্কে এক ধরনের যে ব্যাখ্যা-বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়েছিল, তার পরিণতি হয়েছিল বিভিন্ন টুকরো টুকরো ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যাওয়ায়, মার্কসবাদকে চূর্ণ করে বদ্ধ মতবাদের ছোট ছোট ডেলা তৈরি করে একে অপরের বিরুদ্ধে শাপ-শাপান্ত বর্ষণ করায়। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবে গভীরে গিয়ে দেখলে সবকিছু এমনভাবে বদলে গিয়েছিল যে ১৯৬২ বা ১৯৬৬ সালে ফ্রান্সে আমার পূর্ববর্তী বাসপর্বের তুলনায় আমি অনেক বেশি সহজ ও স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম। যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি ভাবনাচিন্তা করছিলাম তা গণপরিসরে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠছিল। মনোরোগচিকিৎসা-বিরোধিতা ছাড়া অন্য যে বিষয়গুলো আগে কোনও প্রতিধ্বনি তুলতে পারত না, সেগুলো জনমনে আশু গুরুত্ব পেতে লাগল। কিন্তু আমার কাজকে আরও দূরে, আরও গভীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য, প্রথমে আমাকে ওই উপরিতলের শক্ত অথচ বিভাজিত আবরণ ভেঙে ঢুকতে হয়েছিল, যে আবরণ ওই ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলো ও তাদের অন্তহীন আলোচনা তৈরি করে রেখেছিল। আমার মনে হয়েছিল যে বুদ্ধিজীবী এবং অ-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আগের যে কোনও সময়ের থেকে আলাদা নতুন এক ধরনের সম্পর্ক ও সহযোগিতা সম্ভবপর হয়ে উঠছে।

ত্রোমবাদোরি: কিন্তু সেই সম্পর্কের ভিত্তি, ভাবনা-বিনিময়ের বিষয়, কী ছিল— কারণ জ্ঞাপনের জন্য কোনও সাধারণ ভাষা তো ছিল না?

ফুকো: এটা ঠিক যে সবচেয়ে বেশি মান্যতা ও কদর ছিল যে পরিভাষার, সে পরিভাষায় আমি কথা বলতাম না। আমি ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছিলাম। আর তা সত্ত্বেও, এক অর্থে বললে, আমাদের মধ্যে সহমতের জায়গা ছিল: উদ্বেগজনক মূর্ত বিষয়, বাস্তব সমস্যার মুখে আমরা সহমত গড়ে তুলতে পারতাম। এমন প্রচুর মানুষ আছেন যাঁরা উন্মাদআশ্রম, উন্মত্ততা, বন্দিশালা, শহর, ওষুধ ও চিকিৎসা, জীবন ও মৃত্যুর মতো অস্তিত্বের এহেন অতি মূর্ত দিকগুলো নিয়ে গভীরভাবে উৎসাহী, আর এই দিকগুলোই কত না তাত্ত্বিক প্রশ্ন উত্থাপন করে!

ত্রোমবাদোরি: কলেজ দি ফ্রাঁস-তে আপনি প্রথম ভাষণ দেন ১৯৭০ সালে। সেই ভাষণ 'প্রতর্কের বিন্যাস' (L'Ordre du discours) নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যায়তনিক পরিসরের সেই উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে

আপনি আরও স্পষ্টতার সঙ্গে জ্ঞান ও ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্কটিকে তুলে ধরার কাজ শুরু করেন। সত্যের উপর ক্ষমতার আধিপত্য প্রয়োগ করার প্রশ্ন, সেই সূত্র ধরে সত্যের জন্য অভিপ্রায়ের প্রশ্ন আপনার ভাবনার জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন পর্বকে সূচিত করে। কীভাবে আপনি এই সমস্যাটিতে উপনীত হলেন, বা বলা ভালো, কীভাবে সমস্যাটিকে এই পরিভাষায় উপস্থাপিত করার জায়গায় পৌঁছলেন? আর, ক্ষমতার এই প্রসঙ্গকে আপনি যেভাবে বিস্তারিত করলেন, তা ১৯৬৮-র যুব আন্দোলন দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল?

ফুকো: আপনি কি আমায় প্রশ্ন করছেন যে সেই সময় অবধি আমার গোটা জীবনটা কী নিয়ে ছিল? সুইডেনের সমাজের কোন গভীর রোগের আঁচ আমি পেয়েছিলাম? পোল্যান্ডে কোন রোগের আঁচ পেয়েছিলাম? আর তবু বহু পোল মানুষই মনে করত যে অন্যান্য সময়ের তুলনায় তাদের জীবনযাত্রার বস্তুগত মান তখন বেশি ভালো। তুনিসিয়ার ছাত্রছাত্রীরা বৈপ্লবিক বিদ্রোহের জন্য যে আগ্রহ-উদ্দীপনা দেখিয়েছিল, তার মানেও তো আমি খুঁজে যাচ্ছি।

সর্বত্র প্রশ্নের মুখে কোন বিষয়টি? প্রশ্নের মুখে হল যে উপায়গুলোর মাধ্যমে ক্ষমতা চর্চা করা হয়েছে— কেবলমাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতাই নয়, বরং অন্য বিভিন্ন সেই সব প্রতিষ্ঠান ও বাধার রূপের দ্বারা চর্চিত ক্ষমতাও যা প্রতিদিনকার জীবনে এক প্রকার স্থায়ী নিপীড়নের চেহারা নিয়েছে। ক্ষমতা হল সেটাই যা ছিল দুর্বিসহ, যাকে সবসময় প্রশ্ন করা হয়েছে, যা ওই ধরনের রোগের বাসা বেঁধে দিয়েছে আর বারো বছর ধরে যা আলোচিত হয়নি। আর সেই ক্ষমতা কেবল রাষ্ট্রের ক্ষমতা নয়, বরং তা হল গোটা সমাজদেহ জুড়ে অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রণালী, রূপ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাজ করা ক্ষমতাও। শাসনপ্রণালীর ব্যাপ্ত অর্থ ধরে বললে, মানুষ আর শাসিত অবস্থায় থাকা মেনে নিতে পারছিল না। আমি এখানে কেবল রাষ্ট্রীয় আইনের ভাষায় যাকে সরকার বলে তার কথা বোঝাচ্ছি না, সেইসব জনেদের কথাও বোঝাচ্ছি যারা প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়েই হোক বা গণজ্ঞাপন মাধ্যমের প্রভাবের মতো বিভিন্ন প্রত্যক্ষ/অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের মধ্য দিয়ে হোক আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের গতিমুখ বেঁধে দেওয়ার কাজ করে। 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' এবং 'চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্ভব' লেখার মধ্য দিয়ে আমি জ্ঞানের একটি কুলজিশাস্ত্রীয় ইতিহাস নির্মাণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু

সেখানেও এই ক্ষমতার সমস্যাটিই প্রকৃত পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করেছিল। মূলগতভাবে আমি যা করছিলাম তা হল কীভাবে কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান যুক্তি ও স্বাভাবিকতার নামে কাজ করতে শুরু করে বিভিন্ন ব্যক্তিগোষ্ঠীদের আচরণ, অস্তিত্বের ধরন, কাজের ধরন বা কথা বলার ধরনের সুবাদে অস্বাভাবিকতা, উন্মত্ততা, অসুস্থতা ইত্যাদি বর্গ গঠনের মাধ্যমে সেই ব্যক্তিগোষ্ঠীদের উপর নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে শুরু করেছিল তা পুনরাবিষ্কার করার কাজ। সেই দিক থেকে দেখলে, আমি ক্ষমতার একটি ইতিহাস রচনা ছাড়া আর কিছুই করিনি। আর আজ নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবে না যে মে ১৯৬৮-র মধ্য দিয়ে আসলে কিছু নির্দিষ্ট বয়সগোষ্ঠীর মানুষদের উপর কিছু নির্দিষ্ট সামাজিক পরিমণ্ডলে যে একসারি ক্ষমতার রূপ বিশেষ তীব্রতা নিয়ে প্রযুক্ত হয়, সেই ক্ষমতার রূপগুলোর বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ উঠে এসেছিল? সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে, আমার অভিজ্ঞতাও যার অংশ, একটি শব্দ উঠে এসেছিল, কাগজের উপর অদৃশ্য কালিতে যেমন কোনও শব্দ লেখা থাকে আর সঠিক রাসায়নিক কাগজে দিলে যা ফুটে ওঠে— শব্দটি হল: 'ক্ষমতা'।

ত্রোমবাদোরি: ১৯৭০ দশকের গোড়া থেকে এখনও অবধি ক্ষমতা ও ক্ষমতাসম্পর্ক নিয়ে আপনার কাজ ক্রমশ বিশদিকৃত হয়েছে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সাক্ষাৎকার, তরুণ বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কথোপকথন, এক সারি ভাবনা-প্রতিফলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে, যা আপনি অবশেষে 'যৌনতার ইতিহাস: একটি ভূমিকা' (La Volonte de savoir) বইয়ের অল্প কয়েক পাতায় সারসংকলিত রূপে হাজির করেছেন। অনেকে বলছে যে এর মধ্য দিয়ে বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করার একটা নতুন নীতি হাজির করা হয়েছে— সত্যিই কি তাই, নাকি এর মধ্যে অন্য কিছু আছে?

ফুকো: এই নিয়ে বেশ কিছু গুরুতর ভুল-বোঝাবুঝির জন্ম হয়েছে, অথবা হয়ত আমি নিজের ভাবনাকে ব্যাখ্যা করার কাজটা খুব বাজে ভাবে করেছি। আমি কখনই এমন দাবি করিনি যে ক্ষমতা সবকিছুর ব্যাখ্যা হাজির করতে চলেছে। সবকিছুকে অর্থনীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে সবকিছুকে ক্ষমতা দিয়ে ব্যাখ্যা করার কোনও অভ্যাস প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। ক্ষমতা সম্পর্কে যে বিভিন্ন বিশ্লেষণগুলো আমি করেছি, সেগুলোর পর্যবেক্ষণ-নির্ভর মাত্রাকে বিসর্জন না দিয়ে, অর্থাৎ এখনও

সেগুলোর অপরিপক্ক অবস্থায় থাকা অংশগুলো সমেতই সেগুলোকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্তভাবে প্রণালীবদ্ধ করার একটা চেষ্টা আমি করেছিলাম।

আমার বিবেচনায়, স্বয়ং ক্ষমতাকেই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সমকালীন সমাজগুলোয় আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, বা ঐতিহাসিক পর্বের অনুসন্ধানে আমাকে যে অভিজ্ঞতার মুখে পড়তে হয়েছে, সেসব সম্পর্কে ফিরে ভাবলে আমি সর্বদাই ক্ষমতার প্রশ্নটির মুখে এসে পড়ি, যে প্রশ্নটিকে কোনও তাত্ত্বিক কাঠামোই মোকাবিলা করতে পারে বলে মনে হয় না, তা সেই তাত্ত্বিক কাঠামো ইতিহাসের দর্শন, সমাজ সম্পর্কে কোনও সাধারণ তত্ত্ব বা এমনকি কোনও রাজনৈতিক তত্ত্ব, যাই হোক না কেন। ক্ষমতার প্রকৃত বিষয়, ক্ষমতার নানা কলকৌশল, ক্ষমতার নানা সম্পর্ক কাজ করে চলেছে উন্মত্ততা, ওষুধ ও চিকিৎসা, বন্দিশালা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যায়। এই যা সব নিয়ে বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পর্ক গঠিত, সেই একগুচ্ছ পর্যবেক্ষণ-নির্ভর অব্যাখ্যাত বস্তুগুচ্ছ নিয়ে আমি হাতড়ে ফিরছি তাদের ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য। কিন্তু আমি এখনও আমার কাজের একদম শুরুর পর্যায়ে আছি, মোটেই আমার কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। আর তাই আমার কাছে অর্থহীন মনে হয় যখন এমনটা লেখালেখি করা হয় যে ক্ষমতা আমার কাছে এমন এক ধরনের বিমূর্ত নীতি যা বিমূর্তভাবেই অস্তিত্বশীল আর তার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা আমি এড়িয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু কেউই তো কখনও এর ব্যাখ্যা হাজির করেনি। সব ধাপ একলাফে পার হওয়ার চেষ্টা না করে আমি একবারে একটা ধাপ ওঠার চেষ্টা করি, তাই কোনও একটি জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতার ক্রিয়ার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে সাধারণ ধারণার সূত্রায়ন সম্ভবপর করার জন্য বিভিন্ন বিষয়-পরিসরকে আমি একে একে পরীক্ষা করতে করতে যাই।

ত্রোমবাদোরি: এটা বলা যেতে পারে যে আপনার কাজ করার এই ধরন, যেখানে আপনি প্রত্যেকটা প্রশ্নকে চূড়ান্তভাবে আলাদা আলাদা করে বা সীমায়িত করে নিয়ে বিচার করছেন, তা শেষাবধি সবগুলোকে একসঙ্গে ধরে বা সবগুলোকে সংযুক্তিতে ধরে বিচারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অর্থাৎ, ক্ষমতার বিশ্লেষণের প্রশ্নে বিশেষ সমস্যাটির অবস্থান থেকে একটি সর্বাত্মক ধারণায় উৎক্রমণের পথে অন্তরায় এসে যাচ্ছে।

ফুকো: আমাকে প্রায়শই বলা হয়: 'আপনি সেই সমস্ত সমস্যার উত্থাপন করেন যাদের পরিধি খুব সীমিত, কিন্তু আপনি কখনই সাধারণ পছন্দের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও অবস্থান নেন না।'

এটা সত্য যে আমার উত্থাপিত করা সমস্যাগুলো সর্বদা বিশেষ ও সীমায়িত প্রশ্নকে ঘিরে হয়। উদাহরণস্বরূপ উন্মত্ততা ও মনোরোগ-চিকিৎসার প্রতিষ্ঠান, বা এমনকি বন্দিশালার কথাও বলা যেতে পারে। যদি কোনও সমস্যাকে আমরা খুঁতহীন যথাযথ ভাবে উত্থাপিত করতে চাই যাতে তা আন্তরিক অনুসন্ধানের উপজীব্য হয়, তাহলে কী সমস্যাগুলোকে তাদের সবচেয়ে মূর্ত সবচেয়ে স্বতন্ত্র রূপেই চিহ্নিতকরণের চেষ্টা করা উচিত নয়? সমাজ বিষয়ে যে বৃহৎ সর্বাত্মক প্রতর্কগুলো হাজির করা হয়েছে, তাদের কোনওটাই নির্ভর করার মতো যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য বলে আমার মনে হয় না। তদুপরি, আমরা যদি সত্যিই নতুন কিছু নির্মাণ করতে চাই, বা ওইসব বৃহৎ প্রতর্ককাঠামোগুলোকে কতিপয় বাস্তব সমস্যার বিচারে প্রয়োগ করে খুলেমেলে দেখতে চাই, আমাদের তো উপাত্ত এবং প্রশ্নের খোঁজে সেখানেই যেতে হবে যেখানে সেই উপাত্ত ও প্রশ্নগুলো অবস্থিত। তাছাড়া, আমি মনে করি না যে একজন বুদ্ধিজীবী কেবলমাত্র তার পাঠবস্তু-নির্ভর বিদ্যায়তনিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার উপর ভিত্তি করেই যে সমাজে সে বাস করছে তার সম্পর্কে কোনও বাস্তব প্রশ্নকে উত্থাপন করতে পারে। অপরপক্ষে, অ-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রাথমিক রূপই হল তাদের সমস্যাগুলোকে মন দিয়ে শোনা এবং সেই সমস্যাগুলোকে সূত্রায়িত করতে তাদের সঙ্গে মিলে কাজ করা। যেমন ধরা যাক: মানসিক রোগীরা কী বলেন? একটি মনোরোগ-চিকিৎসার হাসপাতালে জীবন কেমন হয়? হাসপাতালের আর্দালিদের কাজটা ঠিক কীরকম? যে অভিজ্ঞতা তাদের হয়, তার সঙ্গে কীভাবে তারা মোকাবিলা করে?

ত্রোমবাদোরি: আমি বোধহয় আমার কথাটা ঠিক বোঝাতে পারিনি। প্রয়োজন হলে এমনকি সম্পূর্ণ অভিনব উপায়েও সীমায়িত সমস্যাবলী উত্থাপন করাকে আমি প্রশ্ন করিনি। আর বুদ্ধিজীবীদের কাজ সম্পর্কে আপনি যা বলছেন তারও গুরুত্ব আমি স্বীকার করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হয় যে বিশেষিকরণ করার মধ্য দিয়ে সমস্যাকে দেখার নির্দিষ্ট পদ্ধতি সেই সমস্যাকে অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে সহযোজিত করে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়।

ফুকো: সমস্যাগুলোকে সীমায়িত বা আঞ্চলিক করে দেখার প্রয়োজনীয়তার কিছু আবশ্যিক তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কারণ আছে। কিন্তু তার মানে এমন নয় যে সমস্যাগুলো সাধারণ সমস্যা নয়। সমাজ যেভাবে উন্মত্ততার সঙ্গে নিজ সম্পর্ক নির্ধারণ করে, যেভাবে সমাজ একটি যুক্তিচালিত সত্তা হিসেবে নিজ পরিচয়ের ধারণা নির্মাণ করে, শেষাবধি সমাজে তার থেকে সাধারণ আর কী হতে পারে? যুক্তির উপর, বিশেষ করে তার নিজস্ব যুক্তির উপর কীভাবে সমাজ ক্ষমতা অর্পণ করে? কীভাবে সমাজ তার নিজস্ব যুক্তিসংগতি নির্মাণ করে এবং কীভাবে সেই নির্মিত যুক্তিসংগতিকে সাধারণ যুক্তি হিসেবে হাজির করে? যুক্তির নামে কীভাবে সমাজ বস্তুরাজির উপর মানুষের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করে? সমাজ সম্পর্কে, সমাজের কর্মপদ্ধতি ও ইতিহাস সম্পর্কে সবচেয়ে সাধারণ প্রশ্নগুলোর মধ্যে এগুলো পড়ে। বা আবারও, কোনটা বৈধ আর কোনটা নয় তার মধ্যে বিভেদরেখাটা টানা হয় কীভাবে? আইনের উপর অর্পিত প্রাধিকার, সমাজের মধ্যে যে সীমাচিহ্নিতকরণের রেখাগুলো আইনের দ্বারা টানা হয়, বাধ্যতা বা অবরোধের যে কলকৌশল আইনকে কার্যকরী করে তোলে এবং এমনই আরো নানা প্রশ্ন রয়েছে সমাজের কাছে উপস্থাপনার যোগ্য সবচেয়ে সাধারণ প্রশ্নগুলোর মধ্যে। নিশ্চিতভাবেই আমি আঞ্চলিক রূপে ও পরিভাষায় সমস্যাগুলোকে উত্থাপন করি, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে তার মধ্য দিয়ে যতটা সাধারণ চরিত্রের প্রশ্ন নিয়ে মানুষ ভাবতে অভ্যস্ত, অন্তত ততটা সাধারণ প্রশ্নের উদ্ঘাটন করতে আমি সমর্থ হই। সব কিছুর পরেও, যুক্তির আধিপত্য কি বুর্জোয়াদের আধিপত্যের মতো ঠিক একই মাত্রায় সাধারণ প্রশ্ন নয়?

ত্রোমবাদোরি: আমি যখন সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছিলাম, আমি মূলত বোঝাতে চাইছিলাম যে কোনও সমস্যার রাজনৈতিক মাত্রার কথা, আবশ্যকীয়ভাবে ব্যাপ্ততর একটি ক্রিয়া বা কর্মসূচীর পরিসরে উচ্চারিত হওয়ার কথা, আর একই সঙ্গে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক সম্ভাবনার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার কথা।

ফুকো: যে ধরনের সাধারণ চরিত্র আমি নিষ্কাশন করতে চাই, তার সঙ্গে অন্যদের সাধারণ চরিত্র সম্পর্কে ধারণা মেলে না। আর সেই অন্যরা যখন কেবলমাত্র আঞ্চলিক সমস্যাবলী উত্থাপন করার জন্য আমায় তিরস্কার করে, তারা আমার সমস্যা-উদ্ঘাটনকারী বিশ্লেষণগুলোর আঞ্চলিক চরিত্রের সঙ্গে এমন এক সাধারণ চরিত্র সম্পর্কিত ধারণাকে গুলিয়ে ফেলে যে ধারণা

সাধারণত ইতিহাসবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ ইত্যাদিদের দ্বারা পোষণ করা হয়ে থাকে।

রাজনৈতিক পার্টি বা সমাজের প্রধান সমস্যাগুলো নির্ধারণ করে দেয় যে মহান তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, তাদের উত্থাপিত সমস্যাগুলো যতটা সাধারণ, আমার উত্থাপন করা সমস্যাগুলোও ততটাই সাধারণ। যেমন ধরা যাক, কম্যুনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলো অযুক্তির উপর যুক্তির ক্ষমতার বিশ্লেষণকে কখনই তাদের করণীয় কাজের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেনি। হয়ত সেটা তাদের কাজ নয়। কিন্তু যদি সত্যিই সেটা তাদের সমস্যা না হয়ে থাকে, তাহলে তাদের সমস্যাবলীও আবশ্যিকভাবে আমার সমস্যা হতে পারে না।

ত্রোমবাদোরি: আপনি যা বলছেন তা সম্পূর্ণভাবে যৌক্তিক। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আপনার কথাও এক ধরনের বাধার আভাস বা উন্মুক্ততার অভাবের আভাস দিচ্ছে, সেই বাধা হল আপনার প্রতর্ককে রাজনৈতিক মাত্রা নিতে দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা...

ফুকো: কিন্তু, আমি যে সমস্যাগুলো উত্থাপন করি, সাধারণ চরিত্রের হলেও সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে সহমতের মাপকাঠি নির্ধারণকারী মহান তাত্ত্বিক-রাজনৈতিক সংস্থাগুলো যে কখনওই কোনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না, তার পিছনের কারণটি কী? যখন আমি উন্মত্ততার সমস্যাটি উত্থাপন করলাম, সেই সমস্যাটি সমস্ত সমাজেরই একটি সাধারণ সমস্যা হওয়া সত্ত্বেও এবং বিশেষ করে আমাদের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হওয়া সত্ত্বেও, কেন প্রথমে সম্পূর্ণ চুপ থাকা ও তার পরে মতবাদিক নিন্দামন্দের ঢল উঠল? যখন অন্যান্য অনেকের সঙ্গে মিলে আমি বন্দিশালা থেকে বেরোনো মানুষ, বন্দিশালার কর্মচারী, বন্দিদের পরিবারদের সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করার মাধ্যমে ফ্রান্সে বন্দিশালার সমস্যাটিকে উত্থাপন করার একটি মূর্ত ব্যবহারিক উপায় তৈরির চেষ্টা করলাম, ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টি-র প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল জানেন কি? পারির শহরতলীতে প্রকাশিত পার্টির একটি আঞ্চলিক দৈনিকপত্রে বিস্ময় প্রকাশ করে এই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত লোকজনদের, অর্থাৎ আমাদের, এখনও জেলে পোরা হয়নি কেন, প্রশ্ন করা হয়েছিল যে পুলিশদের সঙ্গে কি গোপন বোঝাপড়া-যোগসূত্র আমরা তৈরি করেছি যে পুলিশ এভাবে আমাদের কাজ করে যেতে দিচ্ছে।

সেইজন্য ঘুরিয়ে আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি যে রাজনৈতিক পার্টিদের দ্বারা উত্থাপিত মহান প্রশ্নগুলোয় কখনও কোনও অবস্থান না নেওয়ার জন্য ও কখনও সেমত সাধারণ প্রশ্ন নিজে উত্থাপন না করার জন্য কীভাবে আমি সমালোচনার পাত্র হতে পারি? বাস্তবক্ষেত্রে আমি অবশ্যই সাধারাণ সমস্যা তুলে ধরি, আর তার জন্য আমার উপর নিন্দামন্দের গোলাগুলি বর্ষণ চলে। আর তারপর যখন দেখা যায় যে এসব নিন্দামন্দ-গালাগাল লক্ষ্যবস্তুর গায়ে না বিঁধে পিছলে পড়ে যাচ্ছে বা যখন অস্বীকার করার উপায় থাকে না যে উত্থাপিত সমস্যাগুলোর নির্দিষ্ট গুরুত্ব আছে, তখন আবার আমায় এই বলে দোষ দেওয়া হয় যে প্রশ্নগুলোকে যথোপযুক্ত সাধারণ পরিভাষায় ব্যক্ত করতে আমি অক্ষম। কিন্তু ওই যে ধরনের সাধারণত্বের কথা বলা হয়, আমি তা প্রত্যাখ্যান করি, কারণ ওই সাধারণত্বের প্রধান কাজ হল হয় আমার উত্থাপন করা সমস্যার জন্য আমাকে দোষারোপ করা, আর নয়ত যে কাজ আমি করছি তার থেকে আমাকে বিযুক্ত করা। আমি তাদের উদ্দেশ্যেই এই প্রশ্ন করতে চাই: যে সাধারণ সমস্যাগুলো আমি তুলে ধরছি, সেগুলোর মোকাবিলা করতে আপনারা অস্বীকার করছেন কেন?

ত্রোমবাদোরি: বন্দিশালার সমস্যা নিয়ে আপনার কাজের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি যে ঘটনার কথা বললেন তা আমার জানা ছিল না। যাই হোক না কেন, আমি কিন্তু ফরাসী রাজনীতির সঙ্গে, বা বিশেষ করে ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে আপনার সম্পর্কের বিষয়টির দিকে আমার প্রশ্নে ইঙ্গিত করিনি। আমার প্রশ্নটা আরও সাধারণ চরিত্রের ছিল। প্রতিটি নির্দিষ্ট সমস্যার জন্যই রাজনৈতিক সমাধান, অন্তর্বর্তীকালীন বা ক্ষণিক হলেও, সন্ধান করা জরুরী। সেইজন্যই কোনও একটি বিশেষ বিশ্লেষণ থেকে বাস্তব সম্ভাবনাসমূহের বিচারে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, যাতে পরিবর্তন বা রূপান্তরের একটি প্রক্রিয়া দুই দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে গড়ে উঠতে পারে। আঞ্চলিক পরিস্থিতি ও সাধারণ কাঠামোর মধ্যে এই ভারসাম্যবিধানের কাজই হল রাজনৈতিক ভূমিকা।

ফুকো: হ্যাঁ, আমার সম্পর্কে ওই পর্যবেক্ষণও অনেকে ব্যক্ত করেছে: 'আপনি সমস্যার উত্থাপন করেন, কিন্তু তার মূর্ত সমাধান কী হতে পারে তা কখনও বলেন না, আপনি কোনও প্রস্তাব হাজির করেন না। বিপরীতপক্ষে, যে কোনও পরিস্থিতির মুখে একটি অবস্থান নেওয়ার বাধ্যবাধকতা রাজনৈতিক পার্টিদের থাকে, সে বিষয়ে আপনার মনোভাব কোনও সাহায্য

করে না।' এর উত্তরে আমি বলব যে 'রাজনৈতিক পছন্দ' কথাটিকে তার ব্যপ্ততম অর্থে ধরলে, আমার রাজনৈতিক পছন্দের সঙ্গে আবশ্যকীয় ভাবে যুক্ত কারণের জন্যই সমাধানের ব্যবস্থাপত্র তৈরি করে দেওয়ার ভূমিকা পালন করার বিন্দুমাত্র কোনও ইচ্ছা আমার নেই। আমি মনে করি যে আজকের দিনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা মোটেই সমাধানের পথ আদেশ করা নয়, এমনকি সুপারিশ করাও নয়, ভবিষ্যদবক্তার ভূমিকা পালন করা নয়, কারণ সেই ভূমিকা গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে একজন বুদ্ধিজীবী কেবলমাত্র বিশেষ একটি ক্ষমতা-পরিস্থিতির ক্রিয়াকলাপেরই অংশ হয়ে ওঠে, অথচ, আমার মতে, সেই ক্ষমতা-পরিস্থিতির বিশ্লেষণ-সমালোচনা-বিরোধিতাই হল আবশ্যকীয় কাজ।

রাজনৈতিক পার্টিগুলো কেন সমাধানের ব্যবস্থাপত্র হাজির করা বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে পছন্দ করে তা আমি বুঝতে পারি। এভাবে তারা এক সহযোগী সম্পর্ক গড়ে তোলে। বুদ্ধিজীবী একটি প্রস্তাব পেশ করেন, পার্টি তার সমালোচনা করে অথবা আরেকটি প্রস্তাব পেশ করে। এভাবে একটা রাজনৈতিক পার্টির প্রাণের বন্ধু, সাজানো জোড়া ও ওজর হিসেবে কাজ করাকে আমি প্রত্যাখ্যান করি।

ত্রোমবাদোরি: কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে আপনার লেখাপত্র-প্রবন্ধ-নিবন্ধ দিয়ে আপনার কোনও ভূমিকা পালন করার আছে? যদি মনে করেন, তাহলে সে ভূমিকাটি কী?

ফুকো: খাঁটি ও কার্যকরী ভাবে প্রশ্ন তোলাই হল আমার ভূমিকা। আমার ভূমিকা হল প্রশ্নগুলোকে সেইরকম সর্বাধিক জটিলতা ও দুরূহতা নিয়ে উত্থাপন করা যাতে কোনও একটা সমাধান হট্ করে কোনও সংস্কারোদ্যোগী বুদ্ধিজীবীর মাথা থেকে বা পার্টির রাজনৈতিক ব্যুরো থেকে ছিটকে না বেরোতে পারে। যে সমস্যাগুলো আমি উত্থাপন করি, অপরাধ, উন্মত্ততা, যৌনতার মতো জড়ানো-প্যাঁচানো ও প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেই সমস্যাগুলোর কোনও সহজ সমাধান নেই। তার জন্য বহু বছর ধরে, বহু দশক ধরে চালানো কাজ এবং রাজনৈতিক কল্পনাশক্তি প্রয়োজন, একদম তৃণমূলস্তরে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত মানুষজনদের সঙ্গে একসাথে কাজ করা, তাদের বলার অধিকার পুনর্প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র তার পরেই আমরা সাফল্য পাব বর্তমান এই পরিস্থিতির বদল ঘটাতে, যে পরিস্থিতি কেবলমাত্র অন্ধগলি আর বাধার মুখেই আমাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসে

ফেলে। সমস্ত কিছু কীরকম হওয়া উচিত সেই উপদেশ দেওয়া থেকে আমি নিজেকে বিরত রাখি। তার পরিবর্তে আমি সমস্যাগুলোকে তুলে ধরতে চেষ্টা করি, সমস্যাগুলোকে সক্রিয় করে তুলতে চেষ্টা করি, এমন জটিলতায় তাদের প্রদর্শন করার চেষ্টা করি যাতে অপরদের হয়ে ও অপরদের প্রতি বিধান হাঁকায় অভ্যস্ত ভবিষ্যদবক্তা আর নিয়মপ্রণয়নকারী দলের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে মানুষদের জীবনের সঙ্গে সংযুক্তভাবে সমস্যাগুলোর জটিলতা প্রকাশ পাওয়া সম্ভবপর হবে এবং তার ফলশ্রুতিতেই মূর্ত প্রশ্ন, কঠিন অবস্থা, বিদ্রোহের আন্দোলন, ধ্যান ও সাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়ে সাধারণ সৃজনশীল স্বতক্রিয়ার বৈধতাও আত্মপ্রকাশ করবে। এ হল অল্প অল্প করে বস্তুদের মধ্য দিয়ে কাজ করার বিষয়, এমন রূপান্তরের সূচনা করার বিষয় যা সমাধান করে দিতে না পারলেও সমস্যার প্রদত্ত পরিভাষা বা শর্তগুলোকে অন্তত বদলে দেবে।

সমাজের খোদ দেহের উপরে এবং ভিতরে কাজ করবে এমন এক গোটা সামাজিক প্রকল্পের সুবিধাবিধান করতে পারলে আমি খুশি হব। কোনওভাবেই কোনও বিশেষজ্ঞের— এমনকি আমায় যদি সেই বিশেষজ্ঞ বানানো হয়, তাহলেও— উপর সব দায়দায়িত্ব ছেড়ে না দিয়ে সমস্যার শর্ত বা পরিভাষা বদলানোর জন্য, রুদ্ধ পথগুলোকে খোলার জন্য খোদ সমাজের ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই বদল ঘটানোর সেই কাজে আমি নিজেও প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে পারলে খুশি হব। সংক্ষেপে বললে, মুখপাত্রদের সব হঠাতে হবে।

ত্রোমবাদোরি: আমি আপনার সামনে একটা মূর্ত উদাহরণ রাখতে চাই। দুই বা তিন বছর আগে ইতালিতে একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বাবার কাছে তার এবং তার মায়ের মারধোর খাওয়ার ও অপমানিত হওয়ার করুণ ইতিবৃত্তে দাঁড়ি টানতে বাবাকে খুন করেছিল। সেই ঘটনাটি নিয়ে ইতালির জনসাধারণ-মহলে তর্ক-বিতর্কের ঢেউ উঠেছিল। বাবার চালানো অদ্ভুত অত্যাচারের দীর্ঘ পারম্পর্যের ফলশ্রুতি হিসেবে ঘটা এক অপ্রাপ্তবয়স্কের দ্বারা এই মানুষ খুনের ঘটনাকে আমরা কীভাবে বিচার করব? সরকারী বিচারকরা হতবুদ্ধি অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল, জনমত খাড়াখাড়ি ভাগ হয়ে গিয়েছিল, বিতর্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এইটা এমন একটা ঘটনা যেখানে একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে ক্ষণিক বা অন্তর্বর্তীকালীন হলেও একটা সমাধান বের করতেই হবে। আর ভারসাম্য ও রাজনৈতিক পছন্দের নির্ধারক

ভূমিকাও এখানে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। দেশের চালু ফৌজদারী বিধিকে মাথায় রেখে পিতৃহন্তা শিশুটিকে একটি তুলনায় লঘু শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। আর তা নিয়ে অবশ্য এখনও বিতর্ক থামেনি। এইরকম কোনও পরিস্থিতিতে কোনও না কোনও একটা অবস্থান নেওয়া কি বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে না?

ফুকো: ইতালির সংবাদমাধ্যম ওই ঘটনা সম্পর্কে আমার কাছ থেকে বিবৃতি চেয়েছিল, আমি জবাবে বলেছিলাম যে বিবৃতি দেওয়ার মতো জায়গায় আমি নেই কারণ ঘটনার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি যথেষ্ট জানি না। কিন্তু ফ্রান্সেও একটা একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। তিরিশ বছর বয়সের একটি যুবক তার বউকে খুন করার পর বারো বছর বয়সের একটি শিশুর সঙ্গে জোরপূর্বক পায়ুকাম করে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছিল। এই যুবকটির পূর্ব ইতিহাসটাই এতে অন্য মাত্রা যোগ করেছিল। এই খুন করার আগে পনেরো বছরেরও বেশি— দশ বছর বয়স থেকে প্রায় পঁচিশ বছর বয়স অবধি— যুবকটি একটি মনোরোগ-চিকিৎসার প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত খারাপ ব্যবস্থার মধ্যে কাটিয়েছিল কারণ সমাজ, মনোবিদ ও চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানগুলো তাকে মানসিকভাবে অসমর্থ বলে অভিভাবকত্বের অধীনে রাখা উচিত বলে ঘোষণা করেছিল। সেখান থেকে বের হওয়ার দুই বছর পর সে এই বীভৎস অপরাধ সংঘটিত করে। সুতরাং এখানে আমরা এমন একটা ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছি যেখানে একটি মানুষকে তার নিজের কার্যকলাপের দায় নিতে অপারগ বলে প্রথমে ঘোষণা করা হল, পরে হঠাৎই আবার অপরাধ ঘটানোর পর তার দায় তার উপর চাপানো হল। কিন্তু যা সব চেয়ে অবাক করার মতো, তা হল যে সেই হত্যাকারী তখন ঘোষণা করেছিল: 'হ্যাঁ, এটা সত্য যে আমিই দায়ী। তোমরা আমাকে একটা দানব বানিয়েছ। আর যেহেতু আমি এখন একটি দানব, তোমাদেরই উচিত আমার মাথাটা কেটে ফেলার।' তাকে আজীবন কারাবাসের দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কলেজ দি ফ্রাঁস-য় আমার পাঠক্রমে মনোরোগ সংক্রান্ত ফৌজদারী বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে আমি বহু বছর কাজ করেছিলাম। সেই পাঠক্রমে আমার সঙ্গে কাজ করেছিলেন এমন একজন আইনজীবী, যিনি আবার এই ক্ষেত্রে হত্যাকারী যুবকের পক্ষের আইনজীবীদের একজন, তিনি আমায় এই বিচার বিষয়ে সমবাদমাধ্যমে একটি অবস্থান ঘোষণা করতে বলেছিলেন। আমি তা করতে

অস্বীকার করেছিলাম— তা করার ক্ষেত্রে আমি স্বস্তি বোধ করিনি। ভবিষ্যদবক্তা বা খুঁত-ধরার-বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করার কোনও মানে হয় কি? আমি আমার রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছিলাম সমস্যাটিকে তার সমস্ত জটিলতা নিয়ে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে, এমন সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা উসকে দিয়ে যাতে তারপর আর কোনও সংস্কারক বা মনোরোগ-চিকিৎসক-সংঘের সভাপতি নিশ্চিন্ত বদনে 'এমনটাই করা উচিত' বলে নিদান না হাঁকতে পারে। সমস্যাটি এখন এমনভাবে হাজির হয়ে গেছে যে বহু বছর ধরে তা উত্ত্যক্ত করতে থাকবে, একটা অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ জিইয়ে রাখবে। আমি যদি এখন মনোরোগসংক্রান্ত বিচারপ্রক্রিয়ার সমস্ত সমস্যা নিরসন করে একটা নতুন আইন বানাতে বসতাম, তাতে যা পরিবর্তনের কথা বলতে পারতাম, তার চেয়ে অনেক বিপ্লবী পরিবর্তন এই জিইয়ে থাকা উত্ত্যক্ত-অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ থেকে বাস্তবত উঠে আসবে ।

সমস্যাটি আরো গভীর এবং আরো জটিল। সমস্যাটিকে দেখে একটি নিছক প্রায়োগিক প্রশ্ন মনে হতে পারে, কিন্তু গোটা সমস্যাটি চিকিৎসাবিদ্যা এবং ন্যায়বিচারের মধ্যে সম্পর্ককে যেমন জড়িয়ে আছে, তেমনই আইন এবং জ্ঞান(savoir)-য়ের মধ্যে সম্পর্ককেও— অর্থাৎ, আইনব্যবস্থার মতো একটি কাঠামোর মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কীভাবে কাজ করতে পারে, সেই সংক্রান্ত সম্পর্ককেও— জড়িয়ে আছে। সুতরাং সমস্যাটি বিরাট। তাই আমি বলি যে অমুক বা তমুক আইনপ্রণেতাকে— সে তিনি দার্শনিকই হোন বা রাজনীতিবিদই হোন— একটি নতুন আইন প্রণয়ন করতে বসিয়ে দিয়ে সমস্যাটির মাত্রাকে খাটো করে দেখার কী মানে হয়? আসল বিষয়টি তো হল আইন ও জ্ঞানের মধ্যে সহজে নিরসন করা যায় না এমন এই বিরোধটিকে সমাজের বক্ষস্থলে সেই মাত্রায় কার্যকরীভাবে সংঘটিত করা যাতে সমাজই আইন ও জ্ঞানের মধ্যে একটি ভিন্নতর সম্পর্ককে নির্ধারণ করতে পারে।

ত্রোমবাদোরি: নাগরিক সমাজের আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আইন ও জ্ঞানের একটি নতুন ভারসাম্যে পৌঁছানোর দিকে যাওয়ার যে সম্ভাব্য স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপের পূর্বাভাস আপনি দিচ্ছেন সে সম্পর্কে আমি অত আশাবাদী হতে পারছি না...

ফুকো: আমি নাগরিক সমাজ নিয়ে কিছু বলিনি। নাগরিক সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যে তত্ত্বগত বিরোধ নিয়ে গত প্রায় দেড়শ বছর ধরে রাজনৈতিক

তত্ত্ব মাথা ঘামিয়ে যাচ্ছে, তাকে আমি খুব ফলদায়ক বলে মনে করি না। ক্ষমতার প্রশ্নটিকে আমি যে তার হৃদয়ে গিয়ে যেখানে তা চর্চিত হচ্ছে খোদ সেই স্থানে পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে উত্থাপন করতে চাই, ক্ষমতার ভিত্তিমূল বা ক্ষমতার সাধারণ সূত্রায়ন খুঁজে ফিরি না, তার অন্যতম কারণ হল এই যে ক্ষমতা-প্রয়োগকারী রাষ্ট্র যেভাবে ক্ষমতার প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত এক নাগরিক সমাজের উপর তার আধিপত্য চর্চা করে বলে সূত্রায়ন করা হয়, সেই সূত্রায়নকে আমি গ্রহণ করি না। রাষ্ট্র এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে বিরোধিতার তত্ত্ব কাজে লাগে না বলেই আমার ধারণা।

ত্রোমবাদোরি: তা যাই হোক না কেন, আপনার কি এটা মনে হয় না যে একভাবে রাজনৈতিক মাত্রা এড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আপনার প্রস্তাব মূলগতভাবে সমাজে উত্থাপিত জটিল সম্ভাব্য বিষয়গুলোর থেকে এক প্রকার মুখ ঘুরিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু প্রতিষ্ঠান ও পার্টিগুলোর বৃত্তে তা আশু ছাপ ফেলে যায়?

ফুকো: পুরানো বামপন্থী টুকরো টুকরো গোষ্ঠীগুলোরও এই ধরনের ভর্ৎসনা করার অভ্যাস ছিল: যে তোমার মতো একই কাজ করছে না তাকেই নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার বা মুখ ঘুরিয়ে রাখার জন্য দোষ দাও। আমি যে সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করি সেগুলো সাধারণ সমস্যা। আমরা এমন এক সমাজে বাস করি যেখানে জ্ঞানের নির্মাণ, সংবহন ও ভোগ একটি মৌল বিষয়। পুঁজির পুঞ্জীভবন যদি আমাদের সমাজের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হয়, জ্ঞানের পুঞ্জীভবনও আমাদের সমাজের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া, জ্ঞানের চর্চা, উৎপাদন ও পুঞ্জীভবনকে ক্ষমতার কলকৌশল থেকে বিযুক্ত করা যায় না, বরং তাদের মধ্যের জটিল সম্পর্কটিকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ষোল শতক থেকেই মানুষ সবসময় ভেবে এসেছে যে জ্ঞানের রূপের ও অন্তর্বস্তুর বিকাশই অন্যতম উপায় যা মানবসমাজের মুক্তির সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা হতে পারে। তা আমাদের সভ্যতার অন্যতম স্বতঃসিদ্ধে পরিণত হয়েছে। গোটা বিশ্ব জুড়েই তার প্রভাব। এখন ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল এইটি অনস্বীকার্য রূপে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেছে যে জ্ঞানের মহান কাঠামোগুলোর নির্মাণের অন্যতম প্রভাব ও ফলশ্রুতি হিসেবে দাসত্ব ও আধিপত্যের নির্মাণও ঘটেছে। তার ফলে মুক্তির অন্যতম নিশ্চয়তা প্রদানকারী হিসেবে জ্ঞানের বিকাশকে দেখার স্বতঃসিদ্ধটি আজ আবার

আগাগোড়া পুনর্বিচার করে দেখা আবশ্যক হয়ে উঠেছে। এটা কি একটি সাধারণ সমস্যা হল না?

আপনার কি মনে হয় এমন সমস্যা উত্থাপন করার মানে হল রাজনৈতিক পার্টিগুলো যে ধরনের সমস্যা উত্থাপন করে সেগুলোর থেকে মানুষের চোখ ঘুরিয়ে দেওয়া? এতে কোনও সন্দেহ নেই যে রাজনৈতিক পার্টিগুলো যে ধরনের সাধারণত্বের সূত্রায়ন করে তার মধ্যে এই সমস্যাকে সরাসরি অঙ্গীভূত করে নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ রাজনৈতিক পার্টিগুলো মূলগতভাবে কেবলমাত্র সেইসব সূত্রায়িত সাধারণত্বকেই গ্রহণ করে যেগুলোকে একটা ইস্তাহারে খাপ খাওয়ানো যায়, যা তার মক্কেলবর্গকে একসাথে জোট বাঁধাতে ব্যবহার করা যায় আর তার নির্বাচন জেতার কৌশলের অংশ করে নেওয়া যায়। কিন্তু রাজনৈতিক পার্টিদের দ্বারা সূত্রায়িত ও গৃহীত এই সাধারণত্বের ছাঁকনি দিয়ে গলছে না বলে কোনও সমস্যাকে প্রান্তিক, আঞ্চলিক বা চিত্তবিক্ষেপকারী বলে দেগে দেওয়া হবে, তা সহ্য করে নেওয়া যায় না।

ত্রোমবাদোরি: আপনি যখন ক্ষমতার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেন, তখন মনে হয় যেন রাষ্ট্রের স্তরে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্তরে যে সব প্রভাবের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রতিভাত হয় সেগুলোর মধ্যে পার্থক্যের দিকে সরাসরি নির্দেশ না করেই আপনি আলোচনা চালান। এই বিষয়ে জনৈক বলেছেন যে আপনার কাছে ক্ষমতা মুখহীন, ক্ষমতা সর্বত্র বিদ্যমান। তাহলে একটি সর্বাত্মকতাবাদী শাসন আর একটি গণতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে কি কোনও পার্থক্য নেই?

ফুকো: 'শৃঙ্খলা ও শাস্তিদান' বইয়ে আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি কীভাবে পাশ্চাত্যে শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব গঠনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিদের উপর কার্যকরী করা এক বিশেষ ধরনের ক্ষমতা কেবলমাত্র একটি মতবাদেরই জন্ম দেয়নি, তার সাথে একটি উদারপন্থী শাসনব্যবস্থারও জন্ম দিয়েছে। অন্য কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থায়— যেমন ধরা যাক, প্রশাসনিক রাজতন্ত্রে বা সামন্ততন্ত্রে— ব্যক্তিদের উপর এই ধরনের ক্ষমতার চর্চা সম্ভব হতো না। আমি সবসময় যথাযথ রূপে নির্দিষ্ট ও আঞ্চলিক রূপে সীমায়িত প্রতীতিকে বিশ্লেষণ করি, আঠারো শতকের ইউরোপে শৃঙ্খলাদায়ক ব্যবস্থার নির্মাণ যার উদাহরণ। এটা করার মধ্য দিয়ে আমি কখনই এমনটা বলতে বা বোঝাতে চাই না যে পাশ্চাত্য সভ্যতা সর্ব দিক থেকেই একটি শৃঙ্খলাদায়ক সভ্যতা মাত্র। শৃঙ্খলার ব্যবস্থাবলী কিছু ব্যক্তিদের দ্বারা অপর ব্যক্তিদের উপর প্রযুক্ত হয়। প্রশাসক ও প্রশাসিতের মধ্যে পার্থক্য আমি করি। কেন ও কীভাবে এই

ব্যবস্থাগুলো একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ দেশে কিছু নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাতে উদ্ভূত হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করার একটা চেষ্টা আমি করি। ভৌগোলিক ও কালগত পরিচয়হীন কোনও সমাজ নিয়ে আমি আলোচনা করি না। সর্বাত্মকতাবাদী শাসনব্যবস্থা এবং সর্বাত্মকতাবাদী নয় এমন শাসনব্যবস্থার মধ্যে আমি পার্থক্য টানিনি বলে অভিযোগ কী করে উঠতে পারে তা আমার মাথায় ঢোকে না। আঠারো শতকে তো এমন কোনও শাসনব্যবস্থার অস্তিত্বই ছিল না যাকে আমরা আধুনিক অর্থে সর্বাত্মকতাবাদী বলতে পারি।

ত্রোমবাদোরি: কিন্তু আপনার গবেষণাকে আমরা যদি আধুনিকতা নিয়ে একটি অনুসন্ধান হিসেবে দেখি, তাহলে সেখান থেকে কী কী শিক্ষা আমরা নিতে পারি? জ্ঞান ও ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক বড় প্রশ্নগুলোকে যেহেতু গণতান্ত্রিক ও সর্বাত্মকতাবাদী উভয় ধরনের সমাজের ক্ষেত্রেই উত্থাপন করে একইভাবে অসমাধিত হিসেবে তা রেখে দিয়েছে, শেষাবধি তাহলে ওই দুই ধরনের সমাজের মধ্যে তো কোনও বড় মাপের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হল না। অন্যভাবে বললে, ক্ষমতার যে কলকৌশল আপনি বিশ্লেষণ করেন তা সমস্ত ধরনের আধুনিক সমাজগুলোর জন্য একই রকম বা প্রায় এক রকম।

ফুকো: আমার কাজ নিয়ে যখন এই রকম অভিযোগ তোলা হয়, তখন তা শুনে আমার সেই সমস্ত মনোরোগ-চিকিৎসকদের কথা মনে পড়ে যায় যারা আঠারো শতকের বিষয় নিয়ে লেখা 'উন্মত্ততা ও সভ্যতা' পড়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল যে 'ফুকো আমাদের আক্রমণ করছে'। কিন্তু আঠারো শতক বিষয়ে যা আমি লিখেছি তার মধ্যে যদি তারা নিজেদের খুঁজে পায়, সে দোষটা তো আমার হতে পারে না! তা সরলভাবে এটাই দেখায় যে বহুকিছু আসলে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

আমি যখন বন্দিশালার উপর বইটা লিখলাম, এটা তো স্পষ্ট যে আমি জনগণতান্ত্রিক দেশগুলো বা সোভিয়েত রাশিয়ার জেলখানাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করছি না, আমি ফ্রান্সের আঠারো শতক সময়কালের— আরো নির্দিষ্ট করে বললে ১৭৬০ থেকে ১৮৪০ সময়কালের— কথা বলছি। ১৮৪০ সালে এসেই আলোচনা থেমে গেছে। কিন্তু আপনি এখন তা নিয়ে অভিযোগ তুলছেন: 'আপনি সর্বাত্মকতাবাদী শাসন আর গণতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে পার্থক্য টানেন নি!' কী আপনাকে এমন অভিযোগ তোলার দিকে ঠেলে দিল? এমন প্রতিক্রিয়া কেবল এটাই প্রমাণ করে যে মনে করা হচ্ছে আমি যা

বলেছি তা মূলগতভাবে বর্তমান সময়ের জন্যও প্রযোজ্য— তাকে তুলে নিয়ে যেন আপনি আপনার খুশি মতো সোভিয়েত রাশিয়ায় বসাতে পারেন বা কোনও পশ্চিমী দেশে বসাতে পারেন। আমার নিজের দিক থেকে আমি কিন্তু এটাই দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম যে সমস্যাগুলো কীভাবে ঐতিহাসিকভাবে অবস্থিত, একটি প্রদত্ত সময়কালের মধ্যে অবস্থিত।

এটা বলার পরও আর কয়েকটা কথা আছে। আমি মনে করি যে ইতিহাসের গতিপথে ক্ষমতার প্রকৌশল স্থান বদল করতে পারে, যেমন, সেনাবাহিনী থেকে বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হতে পারে, ইত্যাদি। তাদের ইতিহাস বিকাশমান অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর থেকে আপেক্ষিক স্বাধীনতা বজায় রাখে। লাতিন আমেরিকার দাসশিবিরগুলোয় প্রযুক্ত প্রকৌশলের কথা ভাবুন, তা পুনর্বার উনিশ শতকের ফ্রান্স বা ইংল্যান্ডে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সুতরাং, ক্ষমতার প্রকৌশলসমূহের একটি আপেক্ষিক ও অসম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু আমি কখনই এমনটা বলিনি যে কেবলমাত্র ক্ষমতার কলকৌশল দিয়েই একটি সমাজের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে ফেলা যেতে পারে।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বা বন্দিশিবির? ব্রিটিশরা তা আবিষ্কার করেছিল বলে ধরা হয়, কিন্তু তার মানে এমন নয় বা তার থেকে এটা প্রমাণ করা যায় না যে ব্রিটেন একটি সর্বাত্মকতাবাদী দেশ ছিল। ইউরোপের ইতিহাসে কোনও একটি দেশ যদি থেকে থাকে যে সর্বাত্মকতাবাদী ছিল না, তবে সেই দেশটি হল ব্রিটেন— অথচ সেই ব্রিটেনই কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বা বন্দিশিবিরের আবিষ্কার করেছিল যা সর্বাত্মকতাবাদী শাসনব্যবস্থাগুলোর অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠল। এও ক্ষমতার প্রকৌশলের স্থান বদল করার একটি উদাহরণ। কিন্তু আমি কখনও এমন কথা বলিনি এবং এমনটা ভাবার দিকে আমি কোনওভাবে ঝুঁকেও নেই যে গণতান্ত্রিক ও সর্বাত্মকতাবাদী উভয় ধরনের দেশেই কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বা বন্দিশিবিরের অস্তিত্ব দেখায় যে ওই দেশগুলোর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

ব্রোমবাদোরি: তা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু আপনি এক মুহূর্তের জন্য জনচেতনার (du sens commun) আদল গঠনে আপনার প্রতর্কের প্রতিঘাত সম্পর্কে ভাবুন। ক্ষমতার প্রকৌশলের বিশ্লেষণকে অত্যন্ত কঠোর ও নিখুঁত এবং তজ্জন্যেই সীমায়িত করে তোলা কি বিভিন্ন সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাগুলোর মূল্যবোধের মধ্যে বাছাই করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি উদাসীনতার দিকে ঠেলে দিতে পারে না?

ফুকো: কোনও রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা যে নীতিশাস্ত্রের নামে বা দোহাই দিয়ে কাজ করে, তার মুখ চেয়েই সেই শাসনব্যবস্থার যে কোনও কাজকে অব্যাহতি দিয়ে দেওয়ার একটা ঝোঁক আমাদের মধ্যে কাজ করে। উনিশ শতকে বিকশিত হওয়া গণতন্ত্র, বা বলা ভালো, এক ধরনের উদারনীতিবাদই কিন্তু চূড়ান্ত দমন-নিপীড়নমূলক সব প্রকৌশলকে নিখুঁত করে তুলেছিল যা এক অর্থে অন্যান্য দিক থেকে মেলা অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার বিপরীত ভার হিসেবে কাজ করেছিল। স্পষ্টতই, নিরন্তর সহগামী একটি প্রস্তুতি ও নিজেকে উপস্থাপনা করার অভ্যাস (dressage) ছাড়া ব্যক্তিদের মুক্তি আসতে পারে না। কেন ও কীভাবে গণতন্ত্রের এহেন দমন-নিপীড়নমূলক প্রকৌশলগুলোর প্রয়োজন পড়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে গেলে কেন তা গণতন্ত্রের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের পরিপন্থী হবে তা আমি বুঝতে পারি না। এমনটা সম্ভব হতে পারে যে সর্বাত্মকতাবাদী চরিত্রের কোনও শাসনব্যবস্থাও এই দমন-নিপীড়নমূলক প্রকৌশলগুলোকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল এবং তার ফলে সেগুলো এক বিশেষ উপায়ে কাজ করেছিল, কিন্তু তা দিয়ে কোনওভাবেই গণতান্ত্রিক ও সর্বাত্মকতাবাদী শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ঘুচে যায় না। যদি তা বিশ্লেষণযোগ্য কোনও পার্থক্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হয়, তাহলে মূল্যবোধের পার্থক্য নিয়ে কথা বলার কোনও মানে হয় না। 'এটা ওটার থেকে ভালো' বলার আদৌ কি কোনও মানে আছে যদি 'এটা' কী আর 'ওটা'-ই বা কী তা না স্পষ্ট হয়?

একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমি কোনও ভবিষ্যদবক্তা বা নীতিবিদের ভূমিকা পালন করতে চাই না, পশ্চিমী দেশগুলো পুবের দেশগুলোর চেয়ে ভালো এমন ধরনের কোনও ঘোষণা করতে চাই না। জনগণ রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রাপ্তবয়স্কতায় পৌঁছেছে। ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে পছন্দ ঠিক করা, বাছাই করা তাদের নিজেদের কাজ। কোনও একটি শাসনব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে, কী দিয়ে সেই শাসনব্যবস্থা নির্মিত তা বলা জরুরী, অতিকথার ধোঁয়াশা দূর করা জরুরী, আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ার বিভিন্ন চেষ্টাকে আটকানো জরুরী। কিন্তু পছন্দ ও বাছাইয়ের কাজটা জনগণের নিজেকেই করতে হবে।

ত্রোমবাদোরি: দু-তিন বছর আগে ফ্রান্সে 'নয়া দর্শন' ('nouveaux philosophes') খুব সাড়া ফেলেছিল। ওই সাংস্কৃতিক প্রবাহ সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে তা রাজনীতিকে বর্জন করার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত

করেছিল। এই 'নয়া দার্শনিক'-দের সম্পর্কে আপনার মনোভাব ও বিচার কী ছিল?

ফুকো: 'নয়া দর্শন'-য়ের বক্তব্য কী তা আমি জানি না। তাদের লেখা আমি খুব বেশি পড়িনি। তাদের বক্তব্য বলে যা প্রচারিত তা হল এইরকম: সবকিছু সবসময় একইরকম থাকবে, প্রভু সর্বদা প্রভুই থাকবে, যাই ঘটুক না কেন আমরা একটা ফাঁদে আটকে পড়েছি এবং আটকেই থাকব। আমি জানি না যে সত্যিই তারা এমন কথা বলে কিনা। যাই হোক না কেন, ওই কথাগুলোর সঙ্গে আমি একমত নই। কীভাবে সমস্তকিছু বদলে যায়, রূপান্তরিত হয়, স্থানপরিবর্তন করে তা দেখা ও দেখানোর জন্য আমি সবচেয়ে যথাযথ ও প্রভেদক বিশ্লেষণ সংগঠিত করার চেষ্টা করি। ক্ষমতাসম্পর্ককে অধ্যয়ন করার সময় আমি তাদের নির্দিষ্ট বিশেষ আকৃতিকে অধ্যয়ন করি। সবার উপর নিজের আইন চাপিয়ে বসে আছে এমন কোনও প্রভুর ধারণা আমার ভাবনার বাইরে। প্রভুত্বের ধারণাকে আমি গ্রহণ করি না, আইনের সার্বজনীনতার ধারণাকেও আমি গ্রহণ করিনা। বরং তার বিপরীতে, আমি অতি যত্নের সঙ্গে ক্ষমতাচর্চার প্রকৃত কলকৌশলগুলো সম্পর্কে ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করি। তা আমি করি এই কারণেই যে এইসব ক্ষমতাসম্পর্কে যুক্ত বা নিমজ্জিত মানুষরা তাদের স্বতক্রিয়া, তাদের প্রতিরোধ, তাদের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এই ক্ষমতাসম্পর্কের নাগালের বাইরে বেরোতে পারে অথবা এই ক্ষমতাসম্পর্ককে রূপান্তরিত করতে পারে, অর্থাৎ, এক কথায়, বাধ্য পদানত অবস্থা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে। কী করা উচিত তা বলে দেওয়ার বিপক্ষে আমি এই কারণে নই যে কিছুই করার নেই। বরং তার বিপরীতে আমি মনে করি হাজার হাজার জিনিষ করা যেতে পারে। কী করা যেতে পারে তা প্রতিটা মানুষ যে ক্ষমতাসম্পর্কে সে জড়িত তা চিনে নিয়ে প্রতিরোধ করার বা নাগাল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মধ্য দিয়ে নিজেই আবিষ্কার করতে পারে, উদ্ভাবন করতে পারে। সেই দিক থেকে দেখলে, আমার সমস্ত গবেষণাই পরম আশাবাদের স্বতঃসিদ্ধের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। এ কথা বলার জন্য আমি আমার বিশ্লেষণগুলোকে নির্মাণ করি না যে: 'তুমি ফাঁদে পড়ে গেছ, আর কিছু করার নেই'। যে পরিমাণে আমাদের অবস্থাকে আমরা রূপান্তরিত করতে পারি বলে আমার বিশ্বাস, সেই পরিমাণেই আমি আমার বিশ্লেষণ হাজির করি। কোনও না কোনও ব্যবহারে লাগবে এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা নিয়েই আমি প্রত্যেকটি কাজ করি।

ত্রোমবাদোরি: এখন আমি একটি চিঠির প্রসঙ্গে আসতে চাই। চিঠিটা আপনি ১৯৭৮-য়ের ১লা ডিসেম্বর 'ল'ইউনিতা'-কে লিখেছিলেন। সেখানে আপনি ইতালিয় কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। সম্ভাব্য আলোচনার বিষয় হিসেবে আপনি প্রস্তাব করেছিলেন: 'পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর কর্মপদ্ধতি, সেইসব বিভিন্ন দেশের বৈশিষ্ট্যমূলক সমাজের ধরন, বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর ফলশ্রুতি, পশ্চিম ইউরোপে পার্টি কৌশলের সংগঠন, বিশ্বজুড়ে দমনমূলক ব্যবস্থাপত্র ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ, আঞ্চলিক সংগ্রাম ও সাধারণ সমস্যার মধ্যেকার জটিল সম্পর্ক,...'। আপনি চেয়েছিলেন যে সেইরকম আলোচনা যাতে বাদানুবাদ-বিতর্কের ধাঁচে বিভিন্ন শিবির ও বিভিন্ন সংলাপকারীর মধ্যে দূরত্ব বাড়ানোর জন্য ব্যবহার না করে তাদের মধ্যেকার পার্থক্যগুলোকে স্পষ্ট করতে পারে এবং তার মধ্য দিয়ে করণীয় গবেষণার মাত্রাগুলোকে সামনে হাজির করতে পারে। আপনার এই প্রস্তাবের ভিতরের কথাটাকে যদি আপনি আরো স্পষ্ট করে বলেন...

ফুকো: সম্ভাব্য আলোচনার ভিত্তি হিসেবে ওই বিষয়গুলোকে প্রস্তাব করা হয়েছিল। আসলে আমার মনে হচ্ছে যে বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের মাঝে এবং ধনী ও গরিব জাতিরাষ্ট্রগুলোর (শিল্পযোজিত এবং অ-শিল্পযোজিত দেশগুলোর) মধ্যে বিরাট আকারে বিকাশমান বিরোধ ও দ্বন্দ্বগুলোর মাঝে আমরা শাসনপ্রণালীর বিকাশমান সংকটকে দেখতে পাচ্ছি। 'শাসনপ্রণালী' বলতে আমি প্রশাসন থেকে শিক্ষা অবধি একগুচ্ছ প্রতিষ্ঠান ও চর্চাভ্যাসকে বোঝাচ্ছি যাদের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের আচরণকে পথপ্রদর্শন করা হয়। কিছু মানুষের দ্বারা অপরদের শাসন কায়েম করতে ব্যবহৃত এই প্রণালী, প্রকৌশল ও পদ্ধতির গুচ্ছ এখন পশ্চিমী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় বিশ্বেই সংকটের মুখে পড়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। সেখানেও যেভাবে তারা শাসিত হচ্ছে তা জনসাধারণকে ক্রমশ আরও বেশি করে অসন্তুষ্ট করে তুলছে, তাদের সমস্যাবোধ বাড়ছে আর সহ্য করে যাওয়া ক্রমশ আরও কঠিন হয়ে উঠছে। এই যে প্রতীতির কথা আমি বলছি তা প্রকাশ পাচ্ছে কখনও প্রতিরোধের আকার নিয়ে, কখনও বা বিদ্রোহের আকারে। এই প্রতিরোধ বা বিদ্রোহ উসকে দেওয়ার কাজ করছে কখনও প্রাত্যহিক জীবনের কোনও প্রশ্ন, আবার কখনও বা বড় মাপের কোনও নীতি-সিদ্ধান্ত। এই বড় মাপের নীতি-সিদ্ধান্ত পরমাণু শিল্প প্রতিষ্ঠা হতে পারে আবার দেশের

মানুষকে কোনও অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জোটের অংশ করে দেওয়া নিয়েও হতে পারে যা নিয়ে জনসাধারণ স্বচ্ছন্দ বোধ করছে না। আমার ধারণা যে পশ্চিমের ইতিহাসে আমাদের এখনকার সময়ের সঙ্গে সমতুলনীয় একটি সময়পর্ব আমরা পেতে পারি, যদিও পুনরাবৃত্তি কখনই হয় না, এমানকি করুণ পরিণতিও প্রহসন হিসেবে পুনরাবৃত্ত হয় না। সেই সময়পর্ব হল মধ্যযুগ। পনেরো শতক থেকে ষোল শতক— এই সময়পর্ব জুড়ে মানুষের শাসনপ্রণালীতে একটা আপাদমস্তক পুনর্সংগঠনের কাজ চলেছিল, যে টগবগে পরিস্থিতির প্রসব হিসেবে প্রোটেস্টান্টবাদ, মহান জাতিরাষ্ট্রগুলো নির্মাণ, পরম রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনের এক্তিয়ারভুক্ত অঞ্চলের বিভাগীকরণ, ধর্মসংস্কারবিরোধী আন্দোলন (Counterreformation), ক্যাথলিক চার্চের নতুনভাবে উপস্থিত হওয়া, ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছিল। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের স্তরে জনসাধারণকে শাসনের কাজ যেভাবে চলত, তার এক প্রকার ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া চলেছিল এর মধ্য দিয়ে। আমার মনে হচ্ছে যে আমরা আবার একটা শাসনপ্রণালীর সংকট-মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছি। কিছু মানুষ যেভাবে অপরদের চালনা করে তা প্রশ্ন-বিরোধিতার মুখে পড়ছে, চালক বা শাসকরা যদি বা স্বভাবতই এই প্রশ্ন-বিরোধিতা তোলার দলে না থাকে, তাহলেও তারা তাদের কাজ যে ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে তা বুঝতে পারছে। শাসনপ্রণালীর সমস্যার পুনর্মূল্যায়নের এক বিপুল সংকটের গোড়ায় হয়ত আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

ত্রোমবাদোরি: আপনি বলেছিলেন যে এই ধরনের অনুসন্ধান চালানোর জন্য বিশ্লেষণের হাতিয়ারগুলো 'হয় অনিশ্চিত আর নয়ত অনুপস্থিত'। আর কিছু নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের কাজ শুরু করার প্রাথমিক বিন্দুগুলো নতুন দিশায় এগোনো বা নতুনভাবে বিচার করার উপযোগী নয়। তাছাড়াও আপনি এমন এক সাক্ষাৎ চেয়েছিলেন যা বাদানুবাদ-বিতর্ককে ছাপিয়ে যেতে পারবে।

ফুকো: ইতালিয় ও ফরাসী কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা অনেকবার আমাকে মৌখিক আক্রমণ করেছে, কখনও কখনও তা হিংস্রতার মাত্রাও ধারণ করেছে। যেহেতু আমি ইতালিয় ভাষায় কথা বলি না এবং যেহেতু তাদের সমালোচনার অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি, তাই আমি কখনও তার জবাব দিইনি। কিন্তু যখন দেখলাম যে তারা এখন তাত্ত্বিক আলোচনা করার নির্দিষ্ট স্তালিনীয় পদ্ধতিগুলোকে পরিত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, তখন আমি প্রস্তাব করতে চাইলাম যে সেই খেলাটিকেও আমরা পরিত্যাগ করি যে

খেলায় অপর কেউ কিছু বললেই তাকে বুর্জোয়াদের মতবাদ-প্রচারক শ্রেণিশত্রু বলে দেগে দেওয়াই হল দস্তুর। কারণ তাহলে আমরা আন্তরিকভাবে বিতর্কে প্রবেশ করতে পারব। যেমন ধরা যাক, শাসনপ্রণালীগত যৌক্তিকতার সংকট সম্পর্কে আমি যা বলছি তাকে যদি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে তাকে একটা বিস্তৃত বিতর্কের বিষয় করে তোলা হোক না কেন। তাছাড়াও, আমার মনে হয় যে ফরাসী কম্যুনিস্টদের তুলনায় ইতালিয় কম্যুনিস্টরা চিকিৎসা বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার মতো একগুচ্ছ মূর্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে তুলনায় বেশি উৎসুক। এই মূর্ত সমস্যাগুলো আরো সাধারণ বেশ কিছু প্রশ্নকে হাজির করে দেয়, যেমন, সমসাময়িক সমাজে আইন-প্রণয়ন ও স্বাভাবিকীকরণের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্ন, আইন ও রীতির মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্ন, ন্যায়বিচার ও চিকিৎসার মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্ন। একসঙ্গে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক না কেন।

ত্রোমবাদোরি: আবার বাদানুবাদ-বিতর্কের কথায় ফিরে এলে, আপনি এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে আপনি তেমন কোনও আলোচনা পছন্দ করেন না বা গ্রহণ করেন না যা 'যুদ্ধের নকল করে বিচারবিধান প্রক্রিয়ার প্রহসন হাজির করে'। এর মধ্য দিয়ে কী বলতে চেয়েছিলেন একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?

ফুকো: রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনার উপর পরজীবীর মতো চেপে বসেছে যুদ্ধের ছাঁচ: আলাদা ভাবনা সম্পন্ন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে দেওয়া হয় শ্রেণিশত্রু হিসাবে এবং তারপর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো হয় যতক্ষণ না তাকে পরাজিত করে চূড়ান্ত বিজয় হাসিল হচ্ছে। মতবাদিক সংগ্রামের এই মহান ভাবনাটি আমার মধ্যে কিঞ্চিৎ হাসির উদ্রেক করে কারণ প্রতিটা ব্যক্তির তাত্ত্বিক সংযোগগুলোকে তাদের ইতিহাসে ফেলে বিচার করলে সেগুলোর এমনই জড়ানো-প্যাঁচানো ও দোলায়মান রূপ দেখা যায় যেখানে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত কোনও সীমারেখা খুঁজে পাওয়া যায় না যার ওপারে কোনও শত্রুকে খেদিয়ে দিয়ে আসা যেতে পারে। খাড়া করা এক শত্রুর বিরুদ্ধে নিরন্তর চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা এই সংগ্রাম কি আদপে অতি কম গুরুত্বের কিছু ছোটখাট ঝগড়াঝাটিকে অতীব গুরুত্ব দিয়ে হাজির করারই একটি উপায় নয়? বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃত রাজনৈতিক ওজন যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি ওজনদার হিসেবে নিজেদের হাজির করার একটি

উচ্চাশাই কি এইসব মতবাদিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় না? এসবের বদলে, ভিন্ন ভিন্ন অভিমুখ নিয়ে হলেও পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গবেষণা চালিয়ে যাওয়াই কি আরো আন্তরিকতার কাজ হতো না? যদি কেউ সবসময়েই জোর দিয়ে আউড়ে যায় যে সে একজন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাহলে খুবই সম্ভাবপর যা তেমন কোনও প্রকৃত যুদ্ধবিগ্রহের পরিস্থিতি যখন এসে পড়ে, তখনও কি সে সেই অপরের সঙ্গে ওই শত্রুর মতোই আচরণ করার পথ নিতেই প্রলুব্ধ হবে না? সেই পথ অতি বিপজ্জনক, তা সরাসরি নিপীড়নের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঢোকায়। আমি বুঝতে পারি যে একজন বুদ্ধিজীবীর মধ্যে এই আকাঙ্খা থাকতে পারে যে কোনও রাজনৈতিক পার্টি তাকে গুরুত্ব দেবে বা সমাজের চোখে সে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, আর সেই আকাঙ্খা থেকেই সে কোনও এক মতবাদিক বিপক্ষের সঙ্গে লড়াই-লড়াই খেলায় তেড়েফুঁড়ে লাগতে পারে— কিন্তু তা আমার খুবই বিপজ্জনক বলে মনে হয়। এর থেকে অনেক বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে যদি আমাদের সঙ্গে যারা ভিন্নমত তারা কোনও ভুল করছে বলে আমরা মনে করি বা সেই ভিন্নমতধারীরা কী করতে চাইছে আমরা নিজেরা তা সম্যক বুঝতে পারিনি বলে মনে করি।

উৎস: ফুকোর এই সাক্ষাৎকারটি ডি ত্রোমবাদোরি ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে নিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারটির বয়ান প্রথম ইতালিয় ভাষায় ১৯৮০ সালে ইতালিয় পত্রিকা ইল কনট্রিবুটো-তে প্রকাশিত হয়। রবার্ট হারলি-র করা এর ইংরেজি অনুবাদ সংকলিত হয়েছে জেমস ডি ফবিয়ঁ সম্পাদিত মিশেল ফুকোর 'পাওয়ার (এসেনশিয়াল ওয়ার্কস অফ ফুকো, ১৯৫৪-১৯৮৪, তৃতীয় খণ্ড)' বইতে। সেই ইংরেজি অনুবাদ থেকেই এখানে বাংলায় ভাষান্তরিত করা হয়েছে।

লিখন, ভাষণ

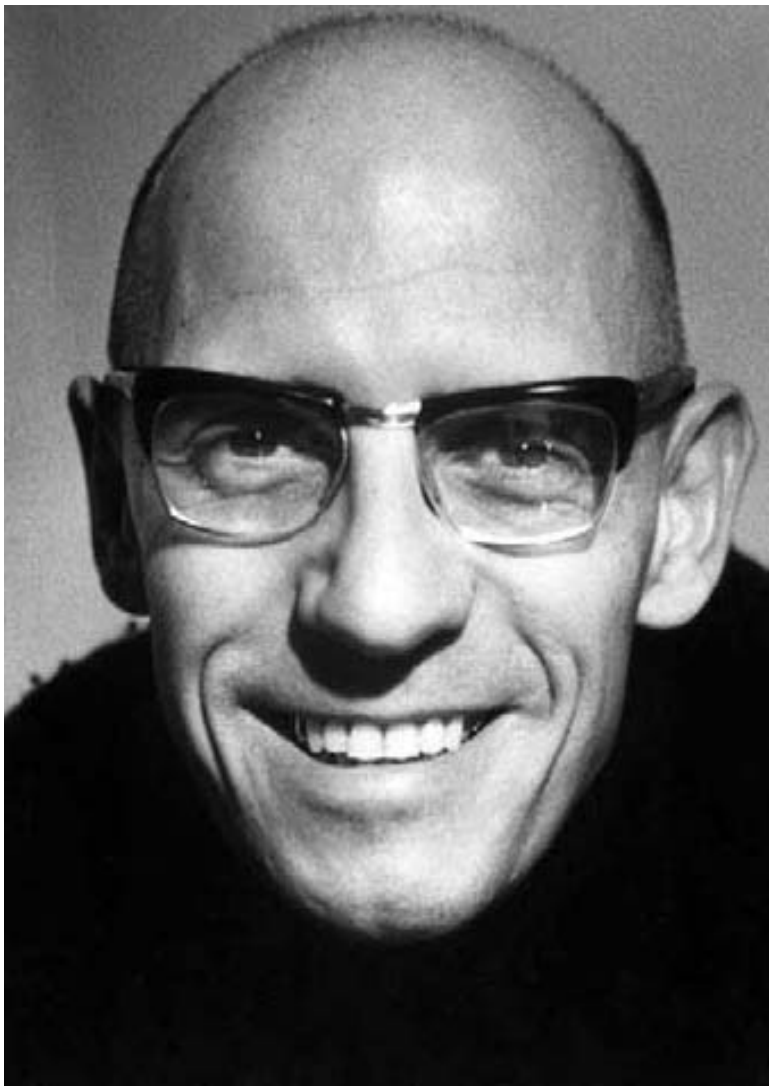

মিশেল ফুকো

ক্ষমতার কলকৌশল বিশ্লেষণের পদ্ধতি

ক্ষমতার প্রকৃতি, রূপ ও একতা সম্পর্কে 'ক্ষমতা' শব্দটি নানা ভুল বোঝাবুঝির জন্ম দিতে পারে। কোনও রাষ্ট্র তার নাগরিকদের অধীনতা ও আনুগত্য নিশ্চিত করতে যে প্রতিষ্ঠানাদি ও কৌশলসমূহ ব্যবহার করে, 'ক্ষমতা' বলতে আমি সে সবকে বোঝাচ্ছি না। বশ্যতানির্মাণের যে সমস্ত প্রক্রিয়া হিংসার প্রতিতুলনায় নিয়মের রূপ ধারণ করে, তাদের কথাও আমি বোঝাচ্ছি না। উপরন্তু, আমি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এমন কোনও সাধারণ ব্যবস্থাকে বোঝাচ্ছি না যা একটি গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর উপর প্রয়োগ করে এবং যার প্রভাব ধারাবাহিক প্রত্যয়িতকরণের মধ্য দিয়ে গোটা সমাজদেহে ছড়িয়ে যায়। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, নিয়মের রূপ বা আধিপত্যের সার্বিক একতাকে যদি আমরা প্রারম্ভিক প্রদত্ত হিসেবে ধরে নিই, তাহলে ক্ষমতার সাপেক্ষে কোনও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাই সম্ভবপর হবে না, বরং আমাদের শুরু করতে হবে এখান থেকে যে এগুলো হল ক্ষমতার উপান্তকালীন রূপ। আমার মনে হয়, যে পরিসর একইসঙ্গে ক্ষমতার ক্রিয়াক্ষেত্র, আবার তার নিজস্ব সাংগঠনিক নির্মিতি, সেই বলয়ের মধ্যে এমন এক বল-সম্পর্কের বহুত্ব ও এমন এক পদ্ধতি হিসেবে ক্ষমতাকে বোঝা উচিত, যেখানে বিরামহীন মুখোমুখি হওয়া ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে তা পরিবর্তিত হয়, শক্তপোক্ত হয় বা বিপরীতে পরিণত হয়, একে অপরকে অবলম্বন করে বা একে অপরে ঠেস দিয়ে শৃঙ্খল বা ব্যবস্থার আকার ধারণ করে, অথবা বিপরীতে বিচ্ছিন্নকরণ বা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পৃথক হয়ে যায়। আর শেষত, ক্ষমতাকে বোঝা উচিত তার প্রভাববিস্তারের কৌশলাদির মধ্য দিয়ে— রাষ্ট্রযন্ত্র, আইন বা নিয়মের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে— সামাজিক প্রভুত্বের বিবিধ

রূপের মধ্য দিয়ে যাদের সাধারণ জাল বা প্রাতিষ্ঠানিক কেলাসন দেখা দেয়। ক্ষমতার কলকৌশল সম্পর্কে ধারণাকে ব্যবহার করে সমাজবিন্যাসের বুননকে বোধ্য করে তোলার জন্য ক্ষমতার সম্ভাব্যতার শর্ত সন্ধান করতে হলে, তার কার্যকারিতার ধরন বা তার বহিঃপরিধির কোনও প্রভাবও বুঝতে গেলে, অনুসন্ধানকারীর উচিত হবে না কোনও কেন্দ্রীয় বিন্দুর অস্তিত্বকে প্রাথমিক বলে ধরে নেওয়া, উচিত হবে না সার্বভৌমত্বের এমন কেনও স্বতন্ত্র উৎসবিন্দু খোঁজা যা থেকে উদ্ভূত হয়ে অনুসম্ভূত রূপগুলো ছড়িয়ে পড়েছে। বল-সম্পর্কের অস্থির অন্তস্তল তার মধ্যেকার অসাম্যের তাড়নায় অনবরত ক্ষমতার দশার জন্ম দেয়, কিন্তু সেই সমস্ত দশাই আঞ্চলিক ও অস্থিতিশীল। ক্ষমতা যে সর্বত্র বিদ্যমান তা এই কারণে নয় যে সমস্ত কিছুকে তার অজেয় এককের মধ্যে জমাট বাঁধিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা তার করায়ত্ত, বরং তা এই কারণে যে এক মুহূর্ত থেকে অপর মুহূর্তে, প্রতি মুহূর্তে তা উৎপাদিত হয়ে চলেছে, বা, বলা ভালো, প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যের এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে তা উৎপাদিত হয়ে চলেছে। ক্ষমতার অস্তিত্ব যে সর্বত্র, তা এই কারণে নয় যে সবকিছুকে সে জাপটে ধরে রেখেছে, বরং তা এই কারণে যে সবকিছু থেকে তা উৎসারিত হচ্ছে। 'ক্ষমতা' যখন স্থায়ী, পুনরাবৃত্তিমূলক, জড় ও স্ব-পুনরুৎপাদনে সক্ষম হিসেবে প্রকাশিত হয়, তখন মোদ্দায় তা তার ভিত্তিস্বরূপ এই সব চঞ্চল গ্রন্থিসমূহ থেকে নির্গত হয়ে অস্থিরগতিকে স্থিরতার বন্ধনে বাঁধতে চায়। সন্দেহ নেই যে নামবৈশিষ্ট্যবাদী বিচারে বলতে হয়: ক্ষমতা কোনও প্রতিষ্ঠান নয়, কোনও কাঠামো নয়, আমাদের বিভূষিত করা কোনও শক্তি নয়; কোনও একটি নির্দিষ্ট সমাজের অন্তর্বর্তী একটি জটিল কৌশলগত অবস্থানকে আমরা 'ক্ষমতা' নামে চিহ্নিত করি।

তাহলে কি বহুপরিচিত বাক্যটিকে উলটে নিয়ে আমাদের বলতে হবে যে ভিন্নতর উপায়ে যুদ্ধের ধারাবাহিকতাই হল রাজনীতি? যুদ্ধ ও রাজনীতির মধ্যে একটি বিভেদরেখাকে বজায় রাখতে চাইলে আমাদের হয়ত প্রস্তাব করতে হবে এভাবে: বল-সম্পর্কের বহুত্বকে সামগ্রিকভাবে না হলেও আংশিকভাবে সাংকেতিক রূপে প্রকাশ করা যায় 'যুদ্ধ' এবং 'রাজনীতি' – এই দুই অভিধায়; অসমভার, অসমসত্ত্ব, অস্থিতিশীল ও টানাপোড়েনে থাকা বল-সম্পর্কগুলোকে সমাকলন করার এ হল দুটি ভিন্ন কৌশল, যে দুটি আবার সর্বদা একে অপরে রূপান্ত রিত হওয়ার প্রবণতা বজায় রাখে।

পূর্ব আলোচনার রেশ টেনে আমরা কিছু প্রস্তাব হাজির করতে পারি:

- ক্ষমতা এমন কোনও বস্তু নয় যা আহরণ করা যায়, কেড়ে নেওয়া যায় বা ভাগাভাগি করা যায়। ক্ষমতা এমন কোনও বস্তু নয় যা আঁকড়ে ধরে রাখা যায় বা পিছলে যেতে দেওয়া যায়। অসম ও অস্থিতিশীল সম্পর্করাজির পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগুন্তি বিন্দু থেকে ক্ষমতা প্রযুক্ত ও চর্চিত হয়।
- ক্ষমতার সম্পর্কসমূহ অন্যান্য ধরনের সম্পর্কসমূহের (যেমন, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াজাত সম্পর্কসমূহ, জ্ঞানতাত্ত্বিক সম্পর্কসমূহ, যৌন সম্পর্কসমূহ) বাইরে অবস্থিত নয়; বরং তা সেসবের মধ্যেই অন্তর্নিহিত, সে সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে ঘটমান বিভাজন, অসাম্য ও অস্থিতির আশু ফল হল তা; আবার উল্টোদিক থেকে, তা হল এই সমস্ত বিভাজনের অন্তর্নিহিত শর্ত। এমনটা নয় যে শুধুমাত্র কিছু নিষেধারোপ বা সঙ্গতদানের ভূমিকা নিয়ে ক্ষমতার সম্পর্কসমূহ কেবল উপরিকাঠামোতেই উপস্থিত। যেখানেই ক্ষমতার সম্পর্ক ক্রিয়াশীল, সেখানেই তা প্রত্যক্ষ উৎপাদিকা ভূমিকা পালন করে।
- ক্ষমতা আসে নিচ থেকে। অর্থাৎ, শাসক ও শাসিতের মধ্যে এমন কোনও দ্বৈত ও সর্বব্যাপী বিরোধ নেই যা একটি সাধারণ ধাত্র (ম্যাটরিক্স) রূপে ক্ষমতার সম্পর্কসমূহের শিকড় হিসেবে কাজ করে, এমন কোনও দ্বৈততা নেই যা উপর থেকে নিচের দিকে পর্যায়ক্রমিক ভাবে আরও বেশি সীমায়িত গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে সমাজদেহের গভীরতম তলদেশ অবধি সঞ্চারিত হয়ে যায়। বরং, ধরে নিতে হবে যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, পরিবারে, সীমায়িত গোষ্ঠীতে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে বহুভাঁজ বলসম্পর্কসমূহ রূপ নেয় ও কার্যকরী হয়, সেগুলো সমগ্র সমাজদেহ জুড়ে দেখা দেওয়া সুদূরপ্রসারী প্রভাবসম্পন্ন ফাটলগুলোর মূলে কাজ করে। এই সাধারণ বলরেখাগুলো তখন আঞ্চলিক বিরোধগুলোর উপর আড়াআড়িভাবে ন্যস্ত হয়ে সেগুলোকে পরস্পর-সংযুক্ত করে তোলে এবং বল-সম্পর্কগুলোর পুনর্বণ্টন, পুনর্বিন্যাস ও অভিসারের নিশ্চিত ঝোঁক তৈরি করে। এহেন মুখোমুখি সংঘাতের দ্বারা পুষ্ট প্রভুত্বকারী প্রভাবগুলোই গুরুতর আধিপত্যসমূহ রূপে দেখা দেয়।

- বল-সম্পর্কগুলো একইসঙ্গে ইচ্ছাসাপেক্ষ ও বিষয়ী-নিরপেক্ষ। বল-সম্পর্কগুলো কার্যত বোধগম্য হলে তা এইজন্য নয় যে তাদের ব্যাখ্যা-প্রদানকারী অন্য কোনও দৃষ্টান্তের ফল সেগুলো, বরং তা এইজন্য যে সেগুলো আদ্যোপান্ত বিচার-বিবেচনা-হিসেবে সিক্ত: বিবিধ লক্ষ্য ও অভিপ্রায় ছাড়া ক্ষমতার চর্চা হয়না। কিন্তু তার মানে আবার এই নয় যে বল-সম্পর্ক কোনও এক ব্যক্তি-বিষয়ীর সিদ্ধান্ত বা পছন্দের ফল। বল-সম্পর্কের যুক্তিসঙ্গতি পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করছে কোন প্রধান দপ্তর, কোন গোষ্ঠীসম্প্রদায় তার অঙ্গুলিহেলনে প্রশাসনকে চালাচ্ছে, গোটা ক্ষমতার জালকে পরিচালনা করা ও সমাজের কার্যকারিতাও বজায় রাখা সর্বাধিক গুরুত্বের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো কারা নিচ্ছে— এহেন অনুসন্ধান থেকে নিজেদের বিরত রাখা দরকার। এমন সব কৌশলই ক্ষমতার যুক্তিসঙ্গতির বৈশিষ্ট্য যা তার উৎকীর্ণ হওয়ার সীমায়িত স্তরেই প্রায়শ যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে (যাকে আমরা ক্ষমতার আঞ্চলিক ঘৃণাবাতুলতা বলতে পারি), যা একে অপরের মধ্যে সংযোগ রেখে একে অপরকে আকর্ষিত ও প্রসারিত করে, অথচ তাদের সমর্থন-ভিত্তি ও সহযোগী শর্ত অন্যত্র নির্দিষ্ট করে শেষাবধি বিস্তৃত ব্যবস্থাসমূহ তৈরি করে। সেই বিস্তৃত ব্যবস্থাসমূহে যুক্তি স্পষ্টগ্রাহ্য, অভিপ্রায় সহজবেদ্য, অথচ প্রায়শই তারা অনাবিষ্কৃত থেকে যায়, খুব অল্পজনই তাদের সূত্রায়িত করে ওঠে। মহান অজ্ঞাত ও প্রায় অব্যক্ত কৌশলগুলোর এহেন অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য সেইসব বহুব্যক্ত কূটকৌশলের সমন্বয়সাধক হিসেবে কাজ করে যেগুলোর আবিষ্কর্তা ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হওয়ার দাবি ভান-ভনিতাহীনভাবেই অনেকে করে থাকেন।
- যেখানে ক্ষমতা, সেখানেই প্রতিরোধ। তবু, বা বলা ভালো, সেইজন্যই, ক্ষমতার সাপেক্ষে প্রতিরোধ কখনই বহিঃস্থ নয়। তার মানে কি এই যে সর্বদাই ক্ষমতার 'অভ্যন্তরে' থাকতে হয়, তাকে 'এড়ানোর' কোনও পথ নেই, তার সাপেক্ষে 'বহিঃস্থ' বলে কিছু হয়না কারণ যে কোনও অবস্থাতেই তার নিয়মের অধীন থাকতে হয়? বা, এমনটা কি বলতে হবে যে, যুক্তিবন্ধনের ছল যেমন ইতিহাস, ইতিহাসের ছল তেমন ক্ষমতা, শেষাবধি সর্বদাই সে জয় হাসিল করে? কিন্তু তা হলে তো ক্ষমতা-সম্পর্কগুলোর কঠোরভাবে সম্পর্ক-

সাপেক্ষ চরিত্রকে ভুল বোঝা হবে। ক্ষমতা-সম্পর্কের প্রতিপক্ষ, সহায় ও বাঁটের ভূমিকা পালন করে যে প্রতিরোধ-বিন্দুর বহুত্ব, তার উপর ক্ষমতা-সম্পর্কের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। ক্ষমতার জালের সর্বত্রই এহেন প্রতিরোধবিন্দু বর্তমান। সুতরাং মহান 'প্রত্যাখ্যানের' কোনও একমেবাদ্বিতীয়ম গতিপথ নেই, নিটোল সত্ত্বা বিশিষ্ট এমন কোনও বিদ্রোহ থাকতে পারে না যা সমস্ত বিদ্রোহের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে, নেই বিপ্লবের কোনও খাঁটি নিয়ম। তার পরিবর্তে আছে প্রতিরোধসমূহের বহুত্ব। প্রতিটি প্রতিরোধ একটি বিশেষ ঘটনা: সম্ভবপর প্রতিরোধ, প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ, সম্ভাবনাহীন প্রতিরোধ; প্রতিরোধ যেগুলো স্বতঃস্ফূর্ত বা অপরিশীলিত বা নিঃসঙ্গ বা কয়েকজনের দ্বারা পরিকল্পিত বা অনিয়ন্ত্রিত বা হিংসাত্মক; আবার অন্যতর প্রতিরোধ যেগুলো আপসমুখী বা স্বার্থচালিত বা আত্মবলিদানমুখী; সংজ্ঞার্থে তারা কেবল ক্ষমতা-সম্পর্কের কৌশলক্ষেত্রের মধ্যেই অস্তিত্বধারণ করতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এগুলো শুধুমাত্র এমনই প্রতিক্রিয়া বা ছিটকে ওঠা যা শেষ বিচারে বুনিয়াদী আধিপত্যের সাপেক্ষে নিষ্ক্রিয়তাসর্বস্ব ও পরাজয়-নিশ্চিত এক তলদেশ তৈরি করে। হাতে গোনা কয়েকটা অসমসত্ত্ব নীতি থেকে প্রতিরোধ উদ্ভূত হয়না, আবার এমন কোনও প্রলোভন বা অঙ্গীকার থেকেও হয়না যা বাধ্যতামূলকভাবেই অধরা থাকবে। ক্ষমতার সাপেক্ষে প্রতিরোধ হল বেজোড় পদ; ক্ষমতার মধ্যে লঘুকরণ-অসম্ভব বিপরীত হিসেবে তারা আকীর্ণ। আর সেজন্যই প্রতিরোধের বিন্যাস নিয়মহীন: সময় ও পরিসরের জমিতে প্রতিরোধের বিন্দু, গ্রন্থি ও অধিশ্রয়ণগুলো পরিবর্তনশীল ঘনতায় ছড়ানো, সময়বিশেষে তা ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীদের কোনও এক সুনির্দিষ্ট পন্থায় সংহত করে, কোনও নির্দিষ্ট দেহবিন্দু বা জীবনমুহূর্ত বা আচরণাবলীকে প্রজ্জ্বলিত করে তোলে। তাহলে কি কোনও মহান বিপ্লবী ভাঙন হতে পারে না, হতে পারে না কোনও বিপুল দ্বি-বিভাজন? কখনও কখনও হতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই যা ঘটে তা হল প্রতিরোধের অস্থিতিশীল ও ক্ষণস্থায়ী বিন্দুসমূহ, যেগুলো সমাজে ফাটল তৈরি করে, ফাটলগুলো অনবরত অবস্থান পাল্টাতে পাল্টাতে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যে ভাঙন ধরায় ও নিত্যনতুন গোষ্ঠীগঠন

ঘটায়, ব্যক্তির নিজের মধ্যেও গর্ত খুঁড়ে, টুকরোয় কেটে আবার পুনর্গঠন করে দেহে ও মনে লঘুকরণ-অসম্ভব অঞ্চল চিহ্নিত করে দিয়ে যায়। ক্ষমতা-সম্পর্কের জাল যেমন বিশেষ যন্ত্রাদি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আসলে সীমাবদ্ধ না হয়েও বহমানতায় তাদের মধ্যে নিবিড় বুনটের রূপ ধারণ করে, রাষ্ট্র যেভাবে ক্ষমতা-সম্পর্কগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সংহতকরণের উপর নির্ভর করে, ঠিক তেমনই প্রতিরোধের বিন্দুগুলোর ঝাঁক সামাজিক স্তরবিন্যাস ও ব্যক্তিদের ঐক্য পেরিয়ে বহমান থাকে। আর সন্দেহ নেই যে এহেন প্রতিরোধের বিন্দুগুলোর কৌশলী সংহিতাকরণ বিপ্লবকে সম্ভব করে তোলে।

বল-সম্পর্কের এই বলয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতার কলকৌশল বিশ্লেষণ করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। কত না দীর্ঘকাল রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ম-ও-সার্বভৌম-য়ের কারাগারে বন্দি! সেই কারাগার থেকে এভাবে আমরা মুক্ত হতে পারি। যদি একথা সত্যি হয় যে মাকিয়াভেলি সেই অল্প কয়েকজনের একজন যারা 'প্রিন্স'-য়ের ক্ষমতাকে বল-সম্পর্কগুলোর ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছিল (মাকিয়াভেলির উপর ঘৃণাবাতুলতার অপবাদ আরোপও নিঃসন্দেহে এই সূত্রেই ঘটেছিল), তাহলে আমাদের সম্ভবত আর এক পা এগিয়ে 'প্রিন্স'-য়ের ব্যক্তিত্বনির্মাণকে বাদ দিয়ে বলসম্পর্কের বলয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত কৌশলাদির উপর ভিত্তি করে ক্ষমতার কলকৌশলের গূঢ়লেখ পাঠ করতে হবে।

উৎস: মিশেল ফুকো রচিত 'যৌনতার ইতিহাস, প্রথম-খণ্ডের' অংশ। ফরাসি ভাষায় মিশেল ফুকো-র লেখা 'লা ভলন্তে ডি স্যাভয়র' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। রবার্ট হার্লে-র করা বইটির ইংরেজি অনুবাদ 'দি উইল টু নলেজ, দি হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি-ভলুম ১' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। এই ইংরেজি অনুবাদের ১৯৯৮ সালে পেঙ্গুইন থেকে প্রকাশিত সংস্করণের ৯২–৯৭ পৃষ্ঠায় বিধৃত অংশটি এখানে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।

কুলজিশাস্ত্র ও ক্ষমতা

৭ই জানুয়ারি, ১৯৭৬ তারিখে কলেজ দি ফ্রাঁসয় দেওয়া ভাষণ

বিগত প্রায় চার-পাঁচ বছর ধরে— কার্যত এই প্রতিষ্ঠানে আমার আসার সময় থেকেই— এক সারি গবেষণা আমাদের চিন্তাচর্চার বিষয় হয়ে থেকেছে এবং আমার এবং আপনাদের উভয়ের জন্যই কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যা হাজির করতে থেকেছে। সেই গবেষণাগুলোর কাজ গুটিয়ে আনা বা কোনও এক ভাবে শেষ করার অভিপ্রায় থেকেই আজ আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। এই গবেষণাগুলোর প্রত্যেকটি অন্যগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হলেও, তারা সবে মিলে একটি নিরবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্র হয়ে ওঠেনি। তারা প্রতিটিই খণ্ডিত গবেষণা, শেষ বিচারে কোনওটিই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হাজির করেনি, কোনও দিকনির্দেশও হাজির করেছে বলে বলা যাবে না। পরিব্যাপ্ত ছড়ানো ছিটানো, আবার একই সঙ্গে পুনরাবৃত্তিপ্রবণ, তারা অনবরত একই জমির উপর ফিরে ফিরে হেঁটেছে, একই প্রসঙ্গ-ধারণা-ইত্যাদির অবতারণা করেছে।

আমার কাজ এখানে যেভাবে এগিয়েছে তা নিশ্চয়ই আপনারা স্মরণ করতে পারবেন: দণ্ড বিষয়ক প্রক্রিয়ার ইতিহাস বিষয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, উনিশ শতকে মনোরোগ-চিকিৎসার বিবর্তন ও প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ বিষয়ে খানেক অধ্যায়, প্রাচীন গ্রিক সূক্ষ্ম তর্কবিদ্যা (sophistry) সম্পর্কে কিছু পর্যবেক্ষণ, গ্রিক মুদ্রা ও মধ্যযুগের ইনকুইজিশন (*রোমান-ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের দমন করার জন্য স্থাপিত বিচারপ্রক্রিয়া— বঙ্গানুবাদক*) সম্পর্কে আরও কিছু পর্যবেক্ষণ। সতেরো শতকে পাদরীর

কাছে পাপস্বীকারের চল যেভাবে ছিল বা আঠারো ও উনিশ শতকে শিশুদের যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার যেসব উপায় দেখা গিয়েছিল, তার উপর ভিত্তি করে আমি যৌনতার ইতিহাস, বা অন্ততপক্ষে, যৌনতা বিষয়ক জ্ঞানের ইতিহাসের রূপরেখা এঁকেছি। অস্বাভাবিকতা বিষয়ক তত্ত্ব ও ধারণাজ্ঞান এবং তদসম্পর্কিত বিবিধ কলাকৌশলের উদ্ভবের একটি বিবর্তনমূলক ইতিহাসের রূপরেখা আমি তৈরি করেছি। সময়কে চিহ্নিত করার বেশি আর কিছুই এর কোনওটি করে না। পুনরাবৃত্তিপ্রবণ ও সংযোগহীন এই পাঠগুলো কোনওদিকে এগোয় না। যেহেতু সত্যিই তারা একই কথা বলে যাওয়া থেকে কখনই বিরত হয় না, বোধহয় কোনও কিছুই তা বলতে পারে না। অর্থ উদ্ধার করা অসম্ভব এমন এক অগোছালো জগাখিচুড়ির চেহারা তৈরি হয়েছে। সংক্ষেপে বললে, এর থেকে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না।

তবু, আমি দাবি করতে পারি যে এসব কিছু সত্ত্বেও এই পথগুলোয় হাঁটা দরকার ছিল, কোনদিকে সে পথ নিয়ে যাচ্ছে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, বরং সে পথগুলোর যে পূর্বনির্ধারিত প্রারম্ভবিন্দু ও গন্তব্য ঠিক করে রাখা ছিল না সেটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তারা কেবল আপনার জন্য কিছু পথরেখা তৈরি করেছে যা ধরে আপনি এগোতে পারেন বা মোড় ঘুরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যেতে পারেন, আর আমি হয় তাদের বিধেয় মতো আরও বাড়াতে পারি নতুবা আবার নতুনভাবে সাজাতে পারি। শেষ বিচারে তারা কেবল খণ্ডিত টুকরো, এবং আপনাকে বা আমাকেই ঠিক করতে হবে তাদের দিয়ে আপনি বা আমি কী করব। আমার নিজেকে নিয়ে আমার মনে হয়েছে যে আমার আচরণ বুঝিবা সেই তিমি মাছের মতো মনে হতে পারে, যে সমুদ্রের উপরিতলে লাফিয়ে উঠে মুহূর্ত খানেকের জন্য ছোট্ট এক ফোয়ারা উগরে উপরিতলে আলোড়ন তুলল এবং এমন ধারণা তৈরি করল, বা বিশ্বাস করার অভিনয় করল, বা সত্যিই নিজে বিশ্বাস করে বসল, যে অতলান্ত গভীরে যেখানে কেউ তাকে আর দেখতে পাচ্ছে না, হদিস করতে পারছে না বা নিয়ন্ত্রণও করতে পারছে না, সেখানে সে বুঝি বা আরও নিগূঢ়, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিবাহিত গতিপথে ধাবিত হচ্ছে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে এমনটাই ঠেকেছে, হতে পারে যে আপনারা হয়ত অন্যভাবে তা বোধ করেছেন।

আপনাদের কাছে আমার হাজির করা কাজগুলোর চরিত্র যে একইসঙ্গে খণ্ডিত, পুনরাবৃত্তিপ্রবণ ও ছেদময় তা আদপে বোধহয় এমন একটা কিছুর প্রতিফলন যাকে জ্বরগ্রস্ত আলস্য বলা যেতে পারে— এই রোগ বিশেষ করে তাদেরই ধরে যারা প্রেমে মজে আছেন গ্রন্থাগারের, নথিপত্রের, উল্লেখপঞ্জির, ধূলিধুসরিত বৃহৎ গ্রন্থের, অপঠিত পাঠ্যবস্তুর, এমন বইয়ের যা ছাপার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাগারগুলোর তাকে নির্বাসিত হয়ে শতকের পর শতক উপেক্ষিত হয়ে পড়ে থাকার পর হয়ত বা কারও নজরে পড়ে যায়। এসব হয়ত বেশ ভালো রকম মানিয়ে যায় সেইসব অলস জ্ঞান ফলানো বিজ্ঞদের ব্যস্ত-সমস্ত জাড্যের সঙ্গে যে ভুঁইফোড়-চূড়ামণিদের বাহ্য প্রকাশ কেবলমাত্র পৃষ্ঠাতলের পাদটীকার প্রদর্শনীতেই ফুটে ওঠে। বা হয়ত ভালো মানিয়ে যায় সেইসবজনেদের সঙ্গে যারা পাশ্চাত্যের প্রাচীনতর বা বিশেষ ধরনের গোপনীয়তায় মোড়া সেইসব অদ্ভুত রকমের অবিনশ্বর সংঘগুলোর অংশীদার হিসেবে নিজেদের ভাবেন, যে সংঘগুলো খৃস্টপূর্ব প্রাচীনকালে সম্ভবত অজানা ছিল, খৃস্টধর্মের সাথে সাথেই যাদের উদ্ভব, খুব সম্ভবত প্রথম মঠগুলোর সময়েই হানাদারি, আগুন ও অরণ্যের পরিধি জুড়ে তাদের গড়ে ওঠা: আমি ব্যবহারহীন পাণ্ডিত্যের মহান ঊষ্ণ ও সূক্ষ ফ্রিম্যাসন পরম্পরার কথা বলছি।

কিন্তু সেই প্রকার ফ্রিম্যাসন পরম্পরার প্রতি অনুরাগ দিয়ে আমার কর্মপথ নির্ধারিত হয়নি। আমার মনে হয় আমাদের করা কাজের পক্ষে যা বলা যায় তা এই যে গত দশ-পনের বা বড়জোর কুড়ি বছরের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে তা যথেষ্ট, যে সময়পর্বে নজর করার মতো দুটো ঘটনা ঘটেছে, যা যদি বা যথার্থই গুরুত্বপূর্ণ না হয়, তা হলেও আমার কাছে রীতিমত চিত্তাকর্ষক।

একদিকে, এই সময়পর্ব চিহ্নিত হয়ে থেকেছে যাকে বলা যায় ছড়ানো-ছেটানো ছেদময় আক্রমণের ফলপ্রসূতা দিয়ে। অনেকগুলো বস্তুকে মাথায় রেখে আমি একথা বলছি। যেমন আমার মাথায় আছে মনোরোগ-চিকিৎসার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্মের ভিত ধরে নাড়া দেওয়া, আর সে ব্যাপারে অঞ্চলভিত্তিক মনোরোগ-চিকিৎসা-বিরোধী (anti-psychiatric) প্রতর্ক-গুলোর অবাক-করা কার্যকারিতা। আপনারা খুব ভালোই জানেন যে এই প্রতর্কগুলোয় এমন কাঠামোবদ্ধ সমন্বয় নীতি নেই যা তাকে বিগত কোনও সময়ে বা এখন কোনও সম্পর্ক-কাঠামোর মধ্যে সুস্থিত করতে পারে। রীখের তত্ত্বের মতো মার্কসবাদ দ্বারা সাধারণভাবে অনুপ্রাণিত কিছু অভিমুখ বা

অস্তিত্ববাদী বিশ্লেষণের দিকে ঝোঁকা কিছু নির্দেশের কথা মাথায় রেখেই আমি একথা বলছি। আবার, আমার মাথায় রয়েছে প্রথানুগত নৈতিকতা ও ধাপবন্দি কাঠামোর বিরুদ্ধে চালিত সেইসব আক্রমণগুলোর অদ্ভুত কার্যকারিতা, যেগুলোরও রিখ ও মার্কুসের সঙ্গে আলগা ও দূরাগত সম্পর্ক ছাড়া আর কোনও পূর্বাপর্য নেই। অন্যদিকে রয়েছে আইন ও দণ্ড ব্যবস্থার উপর আক্রমণগুলোর ফলপ্রসূতা, যেগুলোর কিছু কিছু শ্রেণি-বিচারের সাধারণ ও বেশ গোলমেলে ধারণার সঙ্গে আলগা বাঁধনে যুক্ত, আবার কিছু কিছু নৈরাষ্ট্রবাদী ভাবনার সঙ্গে আরও যথাযথভাবে সংলগ্ন। সমপরিমাণেই আমার মাথায় রয়েছে *অ্যান্টি-ঈদিপাস*-য়ের মতো বইয়ের কার্যকারিতা, যে বইয়েরও প্রকৃত অর্থে কোনও পূর্বনির্দেশের উৎস নেই কেবলমাত্র তার নিজের বিস্ময়কর তাত্ত্বিক উদ্ভাবনীক্ষমতা ছাড়া: একটা বই, বা বলা ভালো একটা বস্তু, একটা ঘটনা, যা এমনকি মনোবিশ্লেষণচর্চার নৈমিত্তিক স্তরের এতাবধি আরামকেদারা ও বিশ্লেষকের আসনের মধ্যে অনবরত পাক খাওয়া ফিসফিসানির মধ্যেও এক তীক্ষ্ণস্বর আমদানি করতে সমর্থ হয়েছে।

সুতরাং, আমি বলব যে গত দশ বা পনেরো বছরের সময়পর্বে বস্তু, প্রতিষ্ঠান, চর্চা ও প্রতর্কসমূহের সমালোচনার সামনে রক্ষণ কেঁপে যাওয়ার অবস্থা তৈরি হয়েছে। এক ধরনের ভঙ্গুরতা আবিষ্কৃত হয়েছে খোদ অস্তিত্বের ভিত্তিভূমিতে— এমনকি এবং সর্বোপরি অস্তিত্বের সেসব অঞ্চলে যেগুলো সবচেয়ে পরিচিত, সবচেয়ে শক্তপোক্ত এবং আমাদের দেহ ও আমাদের দৈনন্দিন আচরণের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কিন্তু অস্থিতিশীলতার এই বোধ এবং ছেদময়, বিশেষ ও আঞ্চলিক সমালোচনার এই বিস্ময়কর ফলপ্রসূতার কার্যত পাশাপাশিই এমন কিছুও খুঁজে পাওয়া যায় যা গোড়ায় হয়ত কেউ আঁচ করতে পারেনি, যা হল সামগ্রিক, *সর্বাত্মকতাবাদী তত্ত্বের* বাধাস্বরূপ প্রভাব। এমনটা নয় যে আঞ্চলিক গবেষণা চালানোর উপযোগী হাতিয়ারপত্র যোগানো বা যুগিয়ে চলার কাজ এইসব সামগ্রিক তত্ত্বগুলো করেনি: মার্কসবাদ ও মনোঃসমীক্ষণ তার প্রমাণ। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে এই হাতিয়ারগুলো কার্যকরী হয়েছে এই শর্তেই যে ওইসব প্রতর্কগুলোর তাত্ত্বিক ঐক্য এক অর্থে সরিয়ে রাখা হয়েছে, বা অন্তত সংক্ষেপিত, বিভাজিত, বিপর্যস্ত, পরিহাসের বিষয়, নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত বা যেমন খুশি করা হয়েছে। প্রতিটা ক্ষেত্রেই সামগ্রিকতার সাপেক্ষে ভাবার চেষ্টা গবেষণার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত পনের বছরের এসব ঘটনাবলী থেকে মূল যে নির্যাস গ্রহণ করা যেতে পারে, বা যা হল তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তা হল সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণের *আঞ্চলিক* চরিত্র। এই আঞ্চলিক চরিত্রের মানে এক ধরনের ভোঁতা অতিসরল মান্ধাতা-আমলের প্রয়োগবাদ নয়, সব ধরনের তাত্ত্বিক প্রবণতা থেকে কিছু না কিছু খুঁটে নেওয়ার সুবিধাবাদী সপসপে পল্লবগ্রাহীতা নয়, এমনকি তা এহেন স্ব-আরোপিত সংযমবহুলতাও নয় যা নিজে থেকে এক নিকৃষ্ট ধরনের তাত্ত্বিক দৈন্য তৈরি করে। আমার মনে হয় যে সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণের এই বাধ্যতামূলক আঞ্চলিক চরিত্র বাস্তবে তাত্ত্বিক উৎপাদনের এক ধরনের অ-কেন্দ্রীভূত স্বশাসিত প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে যার বৈধতা কোনও প্রতিষ্ঠিত মতবাদিক রাজত্বের স্বীকৃতি পাওয়ার উপর নির্ভর করে না।

এখানেই এসব ঘটনাবলীর গত বেশ কিছু সময় ধরে প্রকাশিত আরেকটি বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গ এসে যায়: আমার মনে হয়েছে যে এই আঞ্চলিক চরিত্রের সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণ এগিয়েছে যে পথ ধরে তাকে আমরা 'জ্ঞানে ফিরে যাওয়ার' পথ বলতে পারি। এই শব্দগুচ্ছের মধ্য দিয়ে আমি আসলে বলতে চাইছি: অন্তত অগভীর উপরিস্তরে তো বটেই, একদম সাম্প্রতিক সময়কালে আমরা বারবার মুখোমুখি হয়েছি এমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ মূলভাবের যে তত্ত্ব নয় বরং জীবন গুরুত্বপূর্ণ, জ্ঞান নয় বরং বাস্তবতা গুরুত্বপূর্ণ, বইপত্র নয় বরং টাকা গুরুত্বপূর্ণ, ইত্যাদি; কিন্তু আমার এটাও মনে হয় যে তদুপরি এই মূলভাব থেকে উৎসারিত হয়ে ফুটে বেরোনো আরও একটা কিছু আমরা দেখছি যাকে আমরা *অবদমিত জ্ঞানের বিদ্রোহ* বলে বর্ণনা করতে পারি।

অবদমিত জ্ঞান বলতে আমি দুটো জিনিসকে বোঝাচ্ছি। একদিকে আমি সেই সমস্ত ঐতিহাসিক নির্যাসকে বোঝাচ্ছি যারা আনুষ্ঠানিক সামঞ্জস্যবিধান বা দস্তুরমাফিক কাঠামোবদ্ধকরণের প্রক্রিয়ায় চাপা পড়েছে ও ছদ্মরূপে ঢাকা পড়েছে। মূর্তভাবে বললে, তা মনোরোগীদের হাসপাতালের জীবন সম্বন্ধীয় এমন কোনও সংকেততত্ত্ব নয়, এমনকি অপরাধের এমন কোনও সমাজতত্ত্বও নয়, যা মনোরাগীদের হাসপাতাল ও একইভাবে জেলখানার একটা কার্যকরী সমালোচনা হাজির করাকে সম্ভবপর করে তুলেছে, বরং তা সম্ভব হয়েছে ঐতিহাসিক নির্যাসের আশু আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। আর তা এই কারণেই যে আনুষ্ঠানিকিকরণের বা কাঠামোবদ্ধকরণের মতবাদের দ্বারা আরোপিত মুখোশের ঢাকনা সরিয়ে সংঘাত ও সংগ্রামের ছেদসৃষ্টিকারী

প্রভাবকে পুনরাবিষ্কার করার সামর্থ্য একমাত্র ঐতিহাসিক নির্যাসই আমাদের দিতে পারে। সুতরাং, অবদমিত জ্ঞান হল ঐতিহাসিক নির্যাসের সেই সমস্ত চাঙড় যারা হাজির থাকলেও আনুষ্ঠানিকতাবাদী বা কাঠামোবদ্ধকরণের তত্ত্বের দেহমধ্যে ছদ্মরূপে ঢাকা ছিল এবং সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণ— অবশ্যই বিদ্যায়তনিক প্রয়াসের উপর ভর করে— যাদের উন্মোচিত করতে পেরেছে।

অন্যদিকে, আমি বিশ্বাস করি যে অবদমিত জ্ঞান বলতে আরও অন্য কিছুকেও বুঝতে হবে, যা এক অর্থে সম্পূর্ণ আলাদা কিছু, যা হল জ্ঞানদের এক গোটা সংগ্রহ যাদের কার্যকারিতায় অপর্যাপ্ত বলে বা যথেষ্ট পরিমাণে বিবৃত নয় বলে চিহ্নিত করে খারিজ করা হয়েছে: স্বীকৃতি বা বৈজ্ঞানিকতার আবশ্যক স্তরের নিচে ধাপবন্দি কাঠামোর একেবারে তলার দিকে যাদের হেলাফেলার জ্ঞান হিসেবে জায়গা হয়েছে। আমি এও বিশ্বাস করি যে সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণ তার ভূমিকা পালন করে এই সমস্ত নিম্নপদস্থ জ্ঞানদের পুনরায় আবির্ভূত করার মধ্য দিয়ে যাদের হেলাফেলার বা এমনকি খারিজ করে দেওয়া হিসেবে অবদমিত করে রাখা হয় (যেমন মনোরোগের রোগীর, অসুস্থ মানুষের, সেবিকা বা চিকিৎসকের সে ধরনের জ্ঞান যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞানের সমান্তরাল বা প্রান্তীয়, অপরাধকারীর জ্ঞান, ইত্যাদি) এবং যার মধ্যে আমি যাকে বলব এক ধরনের জনপ্রিয় জ্ঞান জড়িয়ে থাকে, যদিও তা চালু সাধারণজ্ঞান নয় মোটেই, বরং চালু সাধারণজ্ঞানের বিপরীতে তা এক বিশেষ আঞ্চলিক স্থানিক জ্ঞান, এমন এক বিষম জ্ঞান যেখানে সবার মত মিলে যাওয়া অসম্ভব এবং চতুর্দিকের সমস্ত কিছুর তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হওয়া থেকেই যার বল তৈরি হয়।

অবশ্য, একদিকে যত্নবান পাণ্ডিত্যপূর্ণ যথাযথ ঐতিহাসিক জ্ঞানের ফল, আর অন্যদিকে আঞ্চলিক নির্দিষ্ট সব জ্ঞান যাদের কোনও সাধারণ অর্থ নেই এবং কার্যকরীভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের থেকে সংরক্ষিত না হতে পারলেই যারা ব্যবহারহীনতায় তলিয়ে যায়— এই দুই ধরনের জ্ঞানকে অবদমিত জ্ঞানের একই শ্রেণিতে ফেলে ভাবার আকাঙ্খার মধ্যে একটা অদ্ভুত আপাতবিরোধিতা আছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ চাপা-পড়া জ্ঞান আর বিজ্ঞান ও জ্ঞানের ধাপবন্দি কাঠামোয় বর্জিত জ্ঞানগুলোর মধ্যে যোগ আবিষ্কার করার মধ্য থেকেই আমাদের গত পনের বছরের

সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণের প্রতর্কগুলো তাদের নিজস্ব প্রয়োজনীয় বল আহরণ করেছে।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান এবং খারিজ করা জ্ঞান— চাপা দেওয়া অবদমিত জ্ঞানের এই দুই ধরনের জ্ঞানেরই আসলে ভাবনার বিষয়টা কী? তাদের ভাবনার বিষয় হল *সংগ্রাম সংক্রান্ত ঐতিহাসিক জ্ঞান*। পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানের বিশেষীকৃত পরিসরেই হোক, বা, খারিজ করা হেলাফেলার জনপ্রিয় জ্ঞানে হোক, সেইসব শত্রুভাবে সাক্ষাতের স্মৃতি জমে আছে যা এমনকি আজ অবধি জ্ঞানের প্রান্ত সীমায় সরিয়ে রাখা হয়েছে।

এর থেকে যা ফুটে বেরোয় তাকে একপ্রকার কুলজিশাস্ত্র (genealogy) বলা যেতে পারে, বা বহুরকম কুলজিশাস্ত্রীয় গবেষণাও বলা যেতে পারে, যা হল একইসঙ্গে সংগ্রামগুলোর অধ্যবসায়ী পুনরাবিষ্কার এবং সেজনিত সংঘাতের কর্কশ স্মৃতি। আর, পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান ও জনপ্রিয় জ্ঞানের সম্মিলিত ফলস্বরূপ এই কুলজিশাস্ত্রগুলো সম্ভব হয়ে উঠতে পারত না বা সম্ভব করে তোলার প্রচেষ্টাও সম্ভব হত না একটি শর্ত ছাড়া। সেই শর্ত হল ধাপবন্দি কাঠামোয় উচ্চ ধাপে আসীন সমগ্রতা-নির্মাণকারী প্রতর্কগুলোর প্রতিপত্তি ও তাত্ত্বিক অগ্রণী হিসেবে বিশেষাধিকারকে খর্ব করা।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান ও আঞ্চলিক স্মৃতির এই সমাহার যা আমাদের পক্ষে সংগ্রামগুলোর ঐতিহাসিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা ও আজকের দিনে সেই জ্ঞানের কৌশলী ব্যবহার সম্ভবপর করে তোলে, তাকে কুলজিশাস্ত্র নামেই অভিহিত করা যাক। আপনাদের সঙ্গে মিলে গত কয়েক বছর ধরে যে কুলজিশাস্ত্রগুলো সংকলন করার চেষ্টা আমি করেছি, আপাতত এভাবেই তার সংজ্ঞা দেওয়া যাক।

তত্ত্বের বিমূর্ত অখণ্ডতা এবং তথ্যাবলীর মূর্ত বহুত্বের মধ্যে যে বিরোধ তা নিয়ে যে এইরূপ কুলজিশাস্ত্রীয় উপাধিধারী গবেষণাকর্মের কিছুই আসে যায় না তা আপনারা ভালো ভাবেই জানেন। কোনও এক প্রকার বৈজ্ঞানিকতার ধুয়ো তুলে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানসমূহের কড়া বাঁধুনির সঙ্গে তুলনা টেনে যে দূরকল্পনাবাদীরা এর দোষ খুঁজে বের করে অযোগ্য বলে বাতিল করতে চায়, তাদের নিয়েও এর কিছু আসে যায় না। সুতরাং, কুলজিশাস্ত্রীয় গবেষণা প্রকল্প কোনও প্রয়োগবাদী পথে নিজেকে ভাঁজ খুলে মেলে ধরতে চায় না, আবার তথাকথিত দৃষ্টবাদকেও তার চলার পথ করতে চায় না। প্রকৃত অর্থে তা যা করতে চায় তা হল আঞ্চলিক, ছেদময়, বর্জিত, অবৈধ জ্ঞানগুলোর

মনোযোগ-প্রার্থনার দাবিকে স্বীকৃতি দেওয়া। তা করার জন্য যে অখণ্ড তত্ত্ব-শরীর কোনও এক পরম সত্য জ্ঞানের নামে, বিজ্ঞান ও তার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও এক স্বেচ্ছাচারী ধারণা আরোপ করে এই আঞ্চলিক, ছেদময়, বর্জিত, অবৈধ জ্ঞানগুলোকে ছাঁকনিতে ফেলে, ধাপবন্দি কাঠামোর তলায় ঠেলে শৃঙ্খলা তৈরি করতে চায়, সেই অখণ্ড তত্ত্ব-শরীরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়। কুলজিশাস্ত্রগুলো তাই ঠিক বিজ্ঞানের আরও যত্নবান আরও যথাযথ রূপ নির্মাণের দৃষ্টবাদী প্রকল্প নয়। কুলজিশাস্ত্রগুলো হল যথার্থ অর্থে বিজ্ঞানবিরোধী। এমনটা অবশ্য নয় যে তারা মূর্খতার বা অ-জ্ঞানের কোনও কাব্যিক অধিকারের প্রস্তাবনা করছে: এমনটা নয় যে তারা জ্ঞানকে অস্বীকার করছে বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গুণাবলীকে অস্বীকার করছে এবং আশু অভিজ্ঞতার এমন এক চর্চার উপর ভর করছে যাকে জ্ঞানরূপে সূত্রায়িত করা যায় না। আমরা তেমন কিছু নিয়ে ভাবিত নই। আমাদের ভাবনা বরং বিভিন্ন জ্ঞানের বিদ্রোহ নিয়ে। সে বিদ্রোহ প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানের বিষয় পদ্ধতি বা ধারণার বিরুদ্ধে নয়, বরং আমাদের সমাজের মতো সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠান ও সংগঠিত বৈজ্ঞানিক প্রতর্কের সঙ্গে যুক্ত কেন্দ্রীভবনকারী ক্ষমতার প্রভাবের বিরুদ্ধে। বৈজ্ঞানিক প্রতর্কের প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ যে আধারেই ধারিত হোক না কেন— সে বিশ্ববিদ্যালয়ই হোক বা আরও সাধারণভাবে কোনও শিক্ষাকাঠামো হোক, মনোসমীক্ষণের মতো কোনও তাত্ত্বিক-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হোক, বা মার্কসবাদের মতো রাজনৈতিক তন্ত্রের হাজির করা নির্দেশকাঠামো হোক— কুলজিশাস্ত্রকে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে যেহেতু কুলজিশাস্ত্র আসলে বৈজ্ঞানিক অভিধায় ভূষিত প্রতর্কের ক্ষমতাপ্রভাবের বিরুদ্ধে অবস্থান করছে।

আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাইব যে বহু বছর ধরে— অন্তত অর্ধশতাব্দী তো হবেই— কত না অসংখ্য জন এই প্রশ্ন নিয়ে চর্চা করেছে যে 'মার্কসবাদ কি বিজ্ঞান না কি বিজ্ঞান নয়?'। বলা যেতে পারে যে একই ধরনের প্রশ্ন তোলা হয়েছে মনোসমীক্ষণ নিয়ে, বা আরো দুর্ভাগ্যের বিষয়, লিখিত সাহিত্যের সংকেততত্ত্ব নিয়ে। 'বিজ্ঞান নাকি বিজ্ঞান নয়'-ধরনের সমস্ত যাচাইকারী প্রশ্নের উত্তরে কুলজিশাস্ত্রগুলো বা কুলজিশাস্ত্রীরা কী উত্তর দেবে, তা যদি সত্যিই যদি জানতে চান তবে বলি যে আসল গণ্ডগোলটা বেঁধে আছে মার্কসবাদ বা মনোসমীক্ষণ বা অমুক বা তমুক পাঠ বা বিশ্লেষণকে ধরে-বেঁধে বিজ্ঞানে

পরিণত করার জন্য আপনাদের অতি-উৎসাহের মধ্যেই। আমাদের যদি মার্কসবাদ নিয়ে কোনও অভিযোগ থেকে থাকে, তা এটাই যে তাকে কার্যকরীভাবে একটা বিজ্ঞানের চেহারা দেওয়া যায়। আরও ভেঙে বললে, মার্কসবাদ বা মনোসমীক্ষণের মতো কোনওকিছু তার প্রতিদিনের কার্যকারিতায় কতটা বৈজ্ঞানিক চর্চার সঙ্গে তুলনীয়, তার গঠনের নিয়ম, তার কার্যনির্বাহী ধারণাসমূহের বিচারে মার্কসবাদ ও মনোসমীক্ষণের মধ্যে রূপগত ও কাঠামোগত তুলনা কতটা করা যায়— এসব প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমাদের নিজেদেরকে যে প্রশ্নটির সামনে দাঁড় করানো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তা হল: তেমন কোনও বিজ্ঞানের সহচর হয়ে যে ধরনের ক্ষমতা আসে, সেই ক্ষমতার আকর্ষণ কাজ করছে না কি? অতি অবশ্যই এই ধরনের প্রশ্নগুলোকে খাড়া করতে হবে: 'এ বিজ্ঞান না কি বিজ্ঞান নয়' প্রশ্ন তোলার মধ্য দিয়ে কী ধরনের জ্ঞানকে আমরা সেই মুহূর্তেই বাতিল বলে ঘোষণা করতে চাইছি? যখন আপনি ঘোষণা করছেন: আমি এই প্রতর্কের উপস্থাপক একটি বৈজ্ঞানিক প্রতর্কের উপস্থাপনা করছি এবং আমি একজন বৈজ্ঞানিক', তখন কোন বাগ্মী প্রতর্ককারী বিষয়ীকে— অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের কোন কোন বিষয়কে— আপনি 'খাটো' করে দেখাতে চাইছেন? কোন তাত্ত্বিক-রাজনৈতিক *অগ্রণী*-কে আপনি সিংহাসনে বসিয়ে তার চারদিকে আবর্তনরত ছেদময় জ্ঞানের সমস্ত রূপের থেকে বিযুক্ত করে দিতে চান? যখন দেখি যে আপনি প্রাণপণে মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিকতাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন আমার মোটেই এমন মনে হয় না যে আপনার উপস্থাপনা মার্কসবাদের অন্তর্গত একটি যুক্তিসংগত কাঠামোকে এবং তজ্জন্যই তার যে কোন প্রস্তাবই যে যাচাইকারী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উপজাত সিদ্ধান্ত এই প্রত্যয়কে তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করছেন, আমার মনে হয় যে একেবারে আলাদা কিছু করছেন, আপনি আসলে মধ্যযুগ থেকে পাশ্চাত্য-সমাজ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রতর্ককারীদের যে ক্ষমতাপ্রভাবে ভূষিত করেছে, সেই ক্ষমতাপ্রভাব মার্কসবাদী প্রতর্ক ও প্রতর্ককারীদের জন্য আদায় করতে চাইছেন।

বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত ক্ষমতার উচ্চাবচ ধাপবন্দি কাঠামোয় বিভিন্ন জ্ঞানকে উৎকীর্ণ করার নানারকম প্রকল্পের তুলনায়, তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে কুলজিশাস্ত্রকে দেখা উচিত এমন একটা প্রয়াস হিসেবে যা ঐতিহাসিক জ্ঞানগুলোকে সেমত অধীনতা থেকে মুক্ত করতে চায়, এক তাত্ত্বিক,

একমেবাদ্বিতীয়ম, কাঠামোকৃত ও বৈজ্ঞানিক প্রতর্কের শাসন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিরোধ ও সংগ্রাম করার উপযোগী করে তুলতে চায়। তা জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ধাপবন্দি কাঠামো নির্মাণের বিরুদ্ধে ও তদনিহিত ক্ষমতাপ্রভাবের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক জ্ঞানগুলোকে— দেল্যুজ-য়ের ভাষায় অধস্তন জ্ঞানগুলোকে— পুনর্বার সক্রিয় করে তোলার উপর নির্ভরশীল: সেটাই হল এই বিশৃঙ্খল ও টুকরো-টুকরো কুলজিশাস্ত্রগুলোর প্রকল্প। দুটো পদে এই বৈশিষ্ট্য বিধৃত করতে গেলে বলা যায় যে, আঞ্চলিক প্রতর্কসমূহের এহেন বিশ্লেষণের উপযুক্ত পদ্ধতি হল 'প্রত্নশাস্ত্র' (archaeology), আর, এইসব আঞ্চলিক প্রতর্কসমূহের বিবরণের মধ্য দিয়ে সক্রিয় করে তোলা অধীনস্থ জ্ঞানগুলো যে কৌশলের মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পারে তা হল কুলজিশাস্ত্র।

সামগ্রিকভাবে প্রকল্পের চরিত্রটি তুলে ধরতে গেলে এই কয়েকটি কথাই বলা যায়। আমি চাইব যে এই সমস্ত টুকরো টুকরো গবেষণা, যা একই সঙ্গে অধ্যারোপিত ও ছেদময়, যা আমি গোঁ ধরে চার-পাঁচ বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছি, এগুলোকে আপনারা এহেন কুলজিশাস্ত্রের এমন কিছু উপাদান হিসেবে গণ্য করুন যা গত পনের বছর ধরে— মোটেই আমার একার প্রচেষ্টায় নয়— রচিত হয়েছে। এখানে অবশ্য একটা সমস্যা হাজির হয়, একটা প্রশ্ন মাথা তোলে: এমন একটা তত্ত্ব, যা তার ছেদময়তা নিয়ে এত আকর্ষণীয় ও বিশ্বাসযোগ্য, যদি বা খুবই কম যাচাইয়ের উপযোগী, তা নিয়ে চালিয়ে যেতে অসুবিধা কোথায়? মনোবিজ্ঞানের কোনও একটা দিক বা যৌনতার তত্ত্বের কোনও একটা দিক আবার বেছে নিয়ে চালিয়ে যাওয়া নয় কেন? সত্যিই চালিয়ে যাওয়া যেতে পারত (আর আমি এক অর্থে চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করব) যদি না বর্তমান পরিস্থিতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন না দেখা দিত। পরিবর্তন বলতে আমি বোঝাতে চাইছি যে গত পাঁচ, দশ বা এমনকি পনের বছরে ভোল পালটে গেছে— লড়াইয়ের মুখাবয়বও পালটে গেছে। বলসম্পর্কগুলো কি আজও তেমন আছে যাতে এই খুঁড়ে তুলে আনা জ্ঞানগুলো আজও এক প্রকার স্বয়ংশাসিত জীবন পেতে পারে? এই উপায়ে কি তাদের প্রতিটি অধীনতার সম্পর্ক থেকে বের করে আনা যেতে পারে? তারা নিজেরা কী বলে আয়ত্ত করেছে? আর, সর্বোপরি, সম্ভবত এমনটাই কি ঘটছে না যে এই কুলজিশাস্ত্রের টুকরোগুলোকে যে মুহূর্তে আলোতে আনা হচ্ছে, খুঁড়ে তুলে আনতে চাওয়া জ্ঞানের সেই বিশেষ

উপাদানগুলো যে মুহূর্তে নিসৃষ্ট হয়ে জ্ঞাপন-সংবহনে জায়গা পাচ্ছে, সেই মুহূর্তেই তাদের পুনর্সংহিতাকরণ ও পুনঃ-উপনিবেশকরণের বিপদ এসে যাচ্ছে? যে একমেবাদ্বিতীয়ম প্রতর্কগুলো এই কুলজিশাস্ত্রের টুকরোগুলোর আবির্ভাবের সময় প্রথমে সেগুলোকে বাতিল ঘোষণা করেছিল ও উপেক্ষা করার পথ নিয়েছিল, মনে হয় যে এখন তারাই এগুলোকে দখল-অধিকার করে নিজেদের প্রতর্কের পরিবেষ্টনীর মধ্যে ফেরত নিয়ে আসতে এবং জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রভাবের যা যা লক্ষণা সেসব দিয়ে ভূষিত করতে রীতিমতো উন্মুখ হয়ে উঠেছে। আর আমরা যদি সেই পরিণতি থেকে এই কেবলমাত্র সদ্য মুক্ত হওয়া টুকরোগুলোকে রক্ষা করতে চাই সে প্রয়াসও কি একটা পাল্টা বিপদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলবে না? সেই বিপদ হল আমাদের জন্য পেতে রাখা ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের হাতেই আবার আরেক একমেবাদ্বিতীয়ম প্রতর্ক তৈরি করা যার দিকে ঠেলার জন্যই আমাদের বারবার প্রশ্ন করা হচ্ছে: 'এসব না হয় হল, কিন্তু ঠিক কোন দিশায় আপনারা চলেছেন? কী ধরনের সামগ্রিক ঐক্য আপনারা চান?' একটা দূর অবধি লোভ হয় যে উত্তর দিই: 'বেশ তো, আমরা কেবল যেতেই থাকি না কেন, আরো সব জড়ো করতে করতে। উপনিবেশিকৃত হয়ে যাওয়ার বিপদের মুহূর্তটি এখনও আসেনি।' এমনকি কেউ এমন পাল্টা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানও ছুঁড়ে দিতে পারে যে 'দেখি না কেমন সাধ্য আছে আমাদের উপনিবেশিকৃত করার!' বা কেউ এমনও বলতে পারে: 'মনোরোগ চিকিৎসা বিরোধী আন্দোলন (anti-psychiatry) ও মনোরোগ চিকিৎসার প্রতিষ্ঠানগুলোর কুলজিশাস্ত্র তৈরির উদ্যোগ শুরু হওয়ার পর তো পনেরো বছর কেটে গেল, এখনও কি একজনও মার্কসবাদী বা একজনও মনোরোগ-চিকিৎসক তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের পেরিয়ে আসা গোটা পথটা বিচার করে কোথাও দেখাতে পেরেছে যে আমাদের তৈরি কুলজিশাস্ত্রগুলো মিথ্যা, বিশদিকরণে অপর্যাপ্ত, বাজে কথার চাষ বা ভিত্তিহীন?' আসলে বাস্তবে এই কুলজিশাস্ত্র-সংগ্রহকে ঘিরে তখনও যেমন আজও তেমনই বোদ্ধার ভনিতায় ভরা অখণ্ড নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে। সবচেয়ে বেশি হলে যে ধরনের যুক্তি-তর্ক এর বিরুদ্ধে শোনা গেছে তার ধরনও আমার মনে হয় অনেকটা মঁসিয় জুকুঁই-য়ের (ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টির একজন ডেপুটি— অনুবাদক) বক্তব্যের মতো, যিনি বলেছিলেন: 'এ সবই বেশ ভালো, কিন্তু যাই হোক না কেন, সোভিয়েত মনোরোগ-চিকিৎসা গোটা বিশ্বে সবার আগে ।' এ কথার উত্তরে আমি

বলব: 'কত না ঠিক কথাটাই বলেছেন! সোভিয়েত মনোরোগ-চিকিৎসা সত্যিই বিশ্বে সবার আগে, আর ঠিক এইটাই তার বিরোধিতা করার অন্যতম কারণ।'

অখণ্ড নৈঃশব্দ্যখানি, বা বোদ্ধার ভনিতা, যা সম্বল করে একমেবাদ্বিতীয়ম তত্ত্বগুলো জ্ঞানগুলোর কুলজিশাস্ত্রকে এড়িয়ে যেতে চায়, তা এই কুলজিশাস্ত্র রচনার কাজ চালিয়ে যাওয়ার একটা ভালো কারণ হতে পারে। তাহলে অন্তত কুলজিশাস্ত্রীয় টুকরোগুলোকে কত না বিভিন্ন রকমের ফাঁদ রূপে, দাবি রূপে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান রূপে বা যেমন খুশি তেমন রূপে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু এভাবে বিষয়টিকে যদি আমরা একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা— বৈজ্ঞানিক প্রতর্কের ক্ষমতার প্রভাবের বিরুদ্ধে জ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা— হিসেবে দেখি, বিরোধীপক্ষের নৈঃশব্দ্যকে তার মধ্যে তৈরি হওয়া আমাদের প্রতি ভয় বলে গণ্য করি, তাহলে হয়ত লম্বা বিচারে তা অতি-আশাবাদের ছলনা হয়ে যেতে পারে। কারণ এমনটাও তো হতে পারে যে শত্রুপক্ষের নীরবতা— আর এ যে অন্তত পদ্ধতিগত বা কৌশলগত একটি নীতি তা খেয়াল রাখা জরুরী— আসলে তার মধ্যে আদৌ কোনও ভয় তৈরি করতে না পারার আমাদের ব্যর্থতাকে দেখাচ্ছে। যাই হোক না কেন, তাদের মধ্যে আমরা কোনও ভয় সঞ্চার করতে পারিনি এমনটা ধরে নিয়েই আমাদের এগোতে হবে, যেক্ষেত্রে এই সমস্ত ছড়ানো-ছিটানো কুলজিশাস্ত্রগুলোর জন্য একটা শক্তপোক্ত সমসত্ত্ব তাত্ত্বিক জমি হাজির করা নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা থাকবে না, এমন কোনও তাড়নাও থাকবে না যে উপর থেকে নামিয়ে আনা কোনও উজ্জ্বল তাত্ত্বিক মণ্ডল দিয়ে ঘিরে ফেলে এদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। বরং তার বিপরীতে আমাদের কাজ হবে এই বিরোধিতায়, এই সংগ্রামে, প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে এবং বৈজ্ঞানিক প্রতর্কে বিনিয়োগকারী জ্ঞান ও ক্ষমতার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে বিরোধ-বিতর্কের বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা ও উন্মোচিত করা।

এই সমস্ত কুলজিশাস্ত্রগুলোয় বিরোধ-বিতর্কের বিষয় হল ক্ষমতার সেই প্রকৃতি যা তার সমস্ত হিংসা, আক্রমণপ্রবণতা ও অসংগতি নিয়ে গত চল্লিশ বছরে, অর্থাৎ, ফ্যাসিবাদের ভেঙে পড়া ও স্তালিনবাদের পতনের সঙ্গে সমকালীনভাবে, জোয়ারের মতো ফুলেফেঁপে দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠেছে। আমাদের প্রশ্ন করতে হবে যে কী এই ক্ষমতা— বা, এভাবে প্রশ্নটি সূত্রায়িত করলে যেহেতু তা এক সমগ্রের ধারণাকে তাত্ত্বিকভাবে রাজসিংহাসনে

বসানোর দিকে নিয়ে যায়, যা আমি সর্বত এড়িয়ে যেতে চাই— ক্ষমতার বিবিধ উদ্ভাবন-পরিকল্পনাগুলো কী যা সমাজের এহেন বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন অংশে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে ও বহুভাঁজ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করতে পারে? তাদের ক্রিয়াকৌশল, প্রভাব ও সম্পর্কগুলো কী? আমার মনে হয় যে মূল প্রশ্নটি দানা বেঁধে আছে এখানে: ক্ষমতার বা ক্ষমতাগুলোর বিশ্লেষণ কী একভাবে বা অন্যভাবে অর্থনীতি থেকে অবরোহী পদ্ধতিতে করতে হবে? প্রশ্নটিকে এবং তাকে খাড়া করার পিছনে আমার মধ্যে কাজ করা কারণগুলোকে আরও কিছুটা স্পষ্ট করা যাক। অসংখ্য বিপুল পার্থক্য উপেক্ষা করা এক বিমূর্তায়ন হাজির করার কোনও অভিপ্রায় আমার নেই, তবু আমার মনে হয় যে এই পার্থক্যগুলো সত্ত্বেও বা এমনকি হয়ত এই পার্থক্যগুলোর কারণেই রাজনৈতিক ক্ষমতার বিচারশাস্ত্রীয় ধারণা ও যাকে বলা যায় উদারনৈতিক ধারণা (আঠারো শতকের '*philosophes*'-য়ের মধ্যে যা পাওয়া যায়) এবং মার্কসবাদী ধারণা, বা অন্ততপক্ষে বর্তমানে মার্কসবাদী ধারণা বলে যা প্রচলিত, তাদের মধ্যে কিছু মিলের জায়গা আছে। এই মিলের জায়গাটাকে আমি বলব ক্ষমতার তত্ত্বায়নে অর্থনীতিবাদ। তা বলতে আমি কী বোঝাতে চাইছি? ধ্রুপদী বিচারশাস্ত্রীয় তত্ত্বে ক্ষমতাকে একটি অধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়, যা কেউ যে কোনও পণ্যের মতো নিজ মালিকানাভুক্ত করতে পারে, এবং যে কারণেই কেউ তা অংশত বা সমগ্রত হাতবদল বা স্বত্ব-হস্তান্তর করতে পারে এমন বিধি-কানুনের মধ্য দিয়ে যা স্বত্বত্যাগ বা চুক্তির মধ্য দিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা সংজ্ঞাত করে। এখানে ক্ষমতা মানে সেই মূর্ত ক্ষমতা যা প্রতিটি মানুষের দখলিস্বত্বে আছে, এবং যার পুরোপুরি বা আংশিক স্বত্বত্যাগের মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়। এই তাত্ত্বিক নির্মাণের আবশ্যিক ভিত্তি হল এই ধারণা যে রাজনৈতিক ক্ষমতার গঠন চুক্তিভিত্তিক বিনিময় সম্বলিত এক আইনসিদ্ধ আদানপ্রদানের ধাঁচা মেনে চলে (এই কারণেই এহেন তত্ত্বগুলোতে ক্ষমতার সঙ্গে পণ্যের বা ক্ষমতার সঙ্গে সম্পদের প্রত্যক্ষ তুলনা টানা হয়)। অন্যটির ক্ষেত্রে— ক্ষমতা সম্পর্কে সাধারণ মার্কসবাদী ধারণার কথা বলছি— এসব কোনওকিছুই পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই পরবর্তী ধারণার ক্ষেত্রেও অন্তর্নিহিত এমন কিছু আছে যাকে ক্ষমতার অর্থনৈতিক কার্যপ্রণালী বলা যায়। উৎপাদন সম্পর্ক বজায় রাখা এবং উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও নির্দিষ্ট রূপ দ্বারা সম্ভবপর করে তোলা শ্রেণি আধিপত্য বজায়

রাখা— এই যুগপৎ ভূমিকার সাপেক্ষেই যে মাত্রায় ক্ষমতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটি নির্মিত হয়, সে মাত্রাতেই ক্ষমতার অর্থনৈতিক কার্যপ্রণালী হাজির করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, রাজনৈতিক ক্ষমতার অস্তিত্বের কারণ নিহিত আছে অর্থনীতির মধ্যে। মোটাদাগে বললে, প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটির ক্ষেত্রে এমন এক রাজনৈতিক ক্ষমতাকে হাজির করা হচ্ছে যার রূপগত ধাঁচা বিনিময় প্রক্রিয়া ও পণ্যসমূহের অর্থনৈতিক সঞ্চালনের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে; আর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক কারণ, তার মূর্ত রূপগুলোর মৌলিক উপাদান, তার কার্যপ্রণালীর মৌল নীতি, সব অর্থনীতির মধ্যেই আছে। তাই, যে গবেষণাকাজের কথা আমরা আলোচনা করছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নগুলোকে এভাবে ভেঙে নেওয়া যায়: প্রথমত, ক্ষমতা কি সর্বদাই অর্থনীতির অধীনস্থ অবস্থানে থাকে? ক্ষমতা কি সর্বদাই অর্থনীতির সেবায় নিয়োজিত এবং শেষ বিচারে অর্থনীতির কাছেই দায়বদ্ধ? ক্ষমতার আবশ্যিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি অর্থনীতির সেবা করা? অর্থনীতির পক্ষে উপযুক্ত ও অর্থনীতির কার্যনির্বাহে আবশ্যক সম্পর্কগুলোকে বজায় রাখা ও পুনরুৎপাদিত করাই কি ক্ষমতার ভূমিকা হিসেবে নির্ধারিত? দ্বিতীয়ত, ক্ষমতা কি পণ্যের ধাঁচায় গঠিত? ক্ষমতা কি এমনকিছু যা বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে বা চুক্তির মধ্য দিয়ে মালিকানাসত্বে আনা যায়, আহরণ করা যায়, আবার স্বত্বত্যাগ করা যায়? ক্ষমতা কি এমনকিছু যা একজন খুইয়ে বসতে বা পুনরুদ্ধার করতে পারে, যা সঞ্চালিত হয়, যা অমুক বা তমুক অঞ্চল খালি করে চলে যায়? নাকি, ব্যাপারটা এর উল্টো? এমনকি যখন ক্ষমতার সম্পর্ক কার্যত অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে নিবিড়ভাবে বিজড়িত এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে একই সঞ্চারপথে সঞ্চালিত, তখনও ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করার জন্য আমাদের আলাদা আলাদা হাতিয়ার প্রয়োগ করতে হবে? যদি তাই হয়, তাহলে রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে আন্ত র্সম্পর্কটা কার্যকরিতায় অধীনতা ও রূপবিচারে সমাকৃতি সম্পন্ন এমন ধাঁচায় ফেললে হবে না। তাদের একে অপরের মধ্যে মিশে না যাওয়ার চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা রকম কিছু, যা বোঝা ও চিহ্নিত করা আামাদের কাজ।

ক্ষমতার একটি অ-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করতে চাইলে আমাদের হাতে আজ কী কী উপায় লভ্য আছে? আমার মনে হয় তা খুব গুটিকয়েকই হবে। প্রথমত, আমাদের হাতে আছে এই বিবৃতি যে ক্ষমতা কেউ কাউকে দেয় না,

তা পুনরুদ্ধারও হয় না, বরং তা চর্চিত হয়, কেবলমাত্র চর্চার গতিশীলতার মধ্যেই তার অস্তিত্ব হতে পারে। আরও একটা বিবৃতি আমাদের ব্যবহারের জন্য আছে, যে ক্ষমতা মানে প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা বা পুনরুৎপাদন করা নয়, বরং ক্ষমতা সর্বোপরি একটা বলের সম্পর্ক। সুতরাং সেই অনুযায়ী যে প্রশ্নগুলো উঠবে তা হল: ক্ষমতা যদি চর্চিত হয়ে থাকে, কী ধরনের চর্চার মধ্য দিয়ে তা হয়? কী তার উপাদান? কী তার কলকৌশল? সমকালীন বহু বিশ্লেষণ একটা তৈরি উত্তর হাজির করবে: যা দমন করে আবশ্যকভাবে তা-ই হল ক্ষমতা। ক্ষমতা প্রকৃতিকে দমন করে, প্রবৃত্তিকে দমন করে, একটি শ্রেণিকে দমন করে, ব্যক্তিবিশেষদের দমন করে। আজকালকার প্রতর্কে এই দমনরূপী ক্ষমতার সংজ্ঞা যদিও বিরামহীনভাবে উল্লিখিত-পুনরুল্লিখিত হয়ে চলে, এর উদ্ভব কিন্তু এই সময়ে হয়নি— হেগেল প্রথম একথা বলেছিলেন, তারপর ফ্রয়েড বলেছিলেন এবং পরবর্তীকালে রিখ বলেছিলেন। যাই হোক না কেন, আজকালকার বাচনরীতিতে ক্ষমতাকে দমনের উপায় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করাই দস্তুর হয়ে গেছে। তাহলে ক্ষমতার বিশ্লেষণ কি সর্বাগ্রে ও সব থেকে বেশি দমনের কলকৌশলেরই বিশ্লেষণ হওয়া উচিত নয়?

আবার দ্বিতীয় একটি পথও আমরা ভাবতে পারি: বল সম্পর্কসমূহকে যেভাবে প্রয়োগ করা হয় ও মূর্ত রূপ দেওয়া হয় যথার্থ অর্থে তাই-ই যদি ক্ষমতা হয়, তাহলে স্বত্বত্যাগ, চুক্তি বা বিচ্ছিন্নকরণের মতো পদের মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ করার বদলে বা কার্যকারিতার দিক থেকে উৎপাদন সম্পর্ক বজায় রাখার ভূমিকা দিয়ে বিশ্লেষণ করার বদলে ক্ষমতাকে কি প্রাথমিকভাবে *সংগ্রাম, সংঘাত ও যুদ্ধের* মতো পদের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা উচিত নয়? 'মূলগতভাবে ক্ষমতা হল দমন'— এই প্রাথমিক প্রকল্পের মুখোমুখি তাহলে একটি দ্বিতীয় প্রকল্প উঠে আসবে, যা হল: ক্ষমতা হল যুদ্ধ, অপরাপর উপায়ে চালিত এক যুদ্ধ। 'যুদ্ধ হল অপরাপর উপায়ে চালিয়ে যাওয়া রাজনীতি'–ক্লসউইৎজ-য়ের এই বিবৃতিকে এভাবে উল্টে দাঁড় করানোর তিনটে তাৎপর্য আছে। প্রথমত, তার মানে হল এই যে আমাদের সমাজের মতো সমাজে ক্রিয়াশীল ক্ষমতা সম্পর্কগুলো এমন এক নির্দিষ্ট বল সম্পর্কের উপর ভর করে থাকে যা যুদ্ধের মধ্যে ও যুদ্ধের দ্বারাই কোনও একটি নির্ধারিত ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট মুহূর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও, যদি বা তা সত্য হয় যে রাজনৈতিক ক্ষমতা যুদ্ধে ইতি টেনে নাগরিক সমাজে শান্তির

রাজ কায়েম করে বা কায়েম করতে চায়, তা কোনওভাবেই এমনটা বোঝায় না যে সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা যুদ্ধের প্রভাবকে সরিয়ে ফেলে বা অন্তিম যুদ্ধের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত অস্থিতিকে দূর করে। এই প্রকল্প অনুযায়ী, রাজনৈতিক ক্ষমতার ভূমিকা হল এই সম্পর্ককে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোয়, অর্থনৈতিক অসাম্যের অবস্থায়, ভাষায় এবং আমাদের প্রত্যেকের দেহতে অকথিত যুদ্ধের কোনও রূপের মধ্য দিয়ে অবিরত উৎকীর্ণ ও পুনরুৎকীর্ণ করে যাওয়া।

সুতরাং, 'যুদ্ধ হল অপরাপর উপায়ে চালিয়ে যাওয়া রাজনীতি'– ক্লসউইৎজ-কথিত এই প্রবাদকে উল্টে দাঁড় করানোর প্রথম অর্থ এমনভাবে করা যেতে পারে। যুদ্ধের মধ্যে প্রদর্শিত হওয়া বলের অস্থিতিকে মান্যতাদান ও সমর্থন হিসেবে রাজনীতিকে দেখা হল এর অন্তর্বস্তু। কিন্তু এই উল্টে দাঁড় করানোর অন্য একটি তাৎপর্যও আছে। তা হল এই যে, রাজনৈতিক সংগ্রাম, ক্ষমতা সংক্রান্ত সংঘাত, ক্ষমতার জন্য সংঘাত, ক্ষমতা নিয়ে সংঘাত, বলসম্পর্কের অদলবদল, কিছু প্রবণতাকে আনুকূল্য করা, শক্তপোক্ত করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি আরও যা যা এই 'নাগরিক শান্তি'-র মধ্যে পড়ে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার সেই কোনওকিছুকেই যুদ্ধের ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। চলমান একই যুদ্ধের বিভিন্ন অধ্যায়, উপভাগ ও স্থানচ্যুতি হিসেবে তাদের বুঝতে হবে। এমনকি যখন কেউ শান্তিপর্ব ও তার প্রতিষ্ঠানগুলোর ইতিহাস লেখে, তখনও সে এই যুদ্ধেরই ইতিহাস লিখে চলেছে। ক্লসউইৎজ-কথিত প্রবাদটিকে উল্টে দাঁড় করানোর তৃতীয় ও শেষ যে অর্থটি চিহ্নিত করা যায় তা হল এই যে অন্তিম ফলটি একমাত্র যুদ্ধের দ্বারাই উৎপন্ন হতে পারে, যেখানে যুদ্ধ মানে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা যা শেষ বিচারে অস্ত্রশস্ত্র অবলম্বনের মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি হবে। এই অন্তিম যুদ্ধের মধ্যেই হবে রাজনৈতিক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি। তেমন এক অন্তিম যুদ্ধই বিরামহীন যুদ্ধ হিসেবে ক্ষমতার চর্চার চিরতরে পরিসমাপ্তি ঘটাবে।

সুতরাং, যেই না আমরা ক্ষমতার অর্থনীতিবাদী বিশ্লেষণ থেকে মুক্ত হতে চাইব, তখনই দুটো শক্তপোক্ত প্রকল্প আমাদের সামনে হাজির হয়। তাদের মধ্যে একটি সওয়াল করে যে ক্ষমতার কলকৌশল হল যুদ্ধের কলকৌশল। সুবিধার্থে একে আমি রিখের প্রকল্প বলব। অপর প্রকল্পটি সওয়াল করে যে বলের বৈরিতামূলক সংঘাতই হল ক্ষমতা সম্পর্কের ভিত্তি, সুবিধার্থে যাকে আমি নিৎশের প্রকল্প বলব।

এই দুই প্রকল্প অসেতুসম্ভব নয়, এমনকি বলা যায় যে তারা বেশ বিশ্বাসসৃজনকভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। শেষাবধি দমনকে তো যুদ্ধের রাজনৈতিক ফলাফল হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, অনেকটা যেমন রাজনৈতিক অধিকারের ধ্রুপদী তত্ত্বে দমন-নিপীড়নকে বিচারবিধি ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের খেলাপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল।

এভাবে আমরা ক্ষমতার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান প্রবেশ-পথের প্রতিতুলনা করতে পারি। প্রথমটি হল আঠারো শতকের *philosophes*-য়ে প্রাপ্ত পুরানো পথ। সেখানে সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠার স্বার্থে ত্যাগ করা আদি অধিকার হিসেবে ক্ষমতার ধারণা করা হয়েছে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার ছাঁচে চুক্তি হিসেবে তার অভিব্যক্তি সূচিত হয়েছে। এভাবে সংগঠিত কোনও ক্ষমতার নিপীড়ন হয়ে ওঠার ঝুঁকি থাকে যখনই তা নিজেকে ছাপিয়ে যায়, অর্থাৎ, যখনই তা চুক্তির শর্তের বাইরে বেরিয়ে যায়। এর উল্টোদিকে, অপর প্রবেশ-পথটি ক্ষমতাকে আর চুক্তি ও নিপীড়নের ছাঁচে বিশ্লেষণ করতে উদ্যোগী হয় না বরং যুদ্ধ ও দমনের ছাঁচে বিশ্লেষণ করে, আর এ ক্ষেত্রে দমন সেই ভূমিকা পালন করে না যা পূর্ববর্তী পথে চুক্তির সাপেক্ষে নিপীড়ন পালন করে, অর্থাৎ এখানে তা আর কোনও চুক্তির খেলাপ নয়, বরং তা হল কেবলমাত্র আধিপত্যের সম্পর্কের ধারাবাহিকতার প্রভাব। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দমন হল এই ছদ্ম-শান্তির ধারাবাহিক ছেদহীন যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে বলের নিত্য সম্পর্কের বাস্তবায়ন ছাড়া আর কিছু নয়।

সুতরাং আমাদের হাতে আছে ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করার দুটো ধাঁচা: চুক্তি-নিপীড়ন ধাঁচা যা বিচারশাস্ত্রীয় চরিত্রের, আর যুদ্ধ-দমন ধাঁচা, যেখানে নিত্য বিরোধটা বৈধ আর অবৈধর মধ্যে নয়, বরং সংগ্রাম ও আত্মসমর্পণের মধ্যে ঘটে চলেছে।

এটা স্পষ্ট যে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আমার কাজ এই সংগ্রাম-দমন ধাঁচা অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে, আর এই অবলম্বনটিকেই এখন আমি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হচ্ছি। এই পুনর্বিবেচনা যেমন এ কারণে যে এখানে বহু বিষয়ে বিশদিকরণে ফাঁক রয়ে গেছে, তেমন এই কারণেও যে আমার মনে হতে শুরু করেছে যে যুদ্ধ ও দমনের এই দুটি ধারণায় বহু বদল আনা দরকার যদি না শেষ পর্যন্ত তাদের পুরোপুরিই পরিত্যাগ করতে হয়। যাই হোক না কেন ধারণাগুলোকে আরও খুঁটিয়ে পুনর্বিচার করা প্রয়োজন।

সবসময়েই এই দমনের ধারণাটিকে নিয়ে আমি সন্দিহান ছিলাম। যে কুলজিশাস্ত্রগুলো নিয়ে কথা হচ্ছিল— দণ্ডিতদের অধিকারের ইতিহাস, মনোরাগচিকিৎসার ক্ষমতার ইতিহাস, শিশু-যৌনতা নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস, ইত্যাদি— এর প্রত্যেকটাতেই আমি আপনাদের দেখাতে চেষ্টা করেছি যে ক্ষমতা কাঠামোগুলোর দ্বারা বলবৎ করা কলকৌশলগুলো কী পরিমাণে দমনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কিছু, বা অন্তত আরো বেশি কিছু। সুতরাং দমনের এই ধারণাকে আরও খুঁটিয়ে পুনর্বিচার করার প্রয়োজনীয়তা উঠে আসছে আমার এই বোধ থেকে যে ক্ষমতার যে প্রভাব ও কলকৌশল বিশ্লেষণ করার কাজে তা এত ব্যাপ্তভাবে ব্যবহৃত হয়, সে কাজের জন্য তা সম্পূর্ণত অপর্যাপ্ত।

উৎস: বক্তৃতাটির লিপ্যন্তর করেন আলেসান্দ্রো ফন্তানা এবং পাসকুয়াল পাসকুইনো। কলিন গর্ডন সম্পাদিত মিশেল ফুকো-র *পাওয়ার/নলেজ* বইয়ে গ্রন্থিত ইংরেজি অনুবাদ থেকে এখানে বাংলায় ভাষান্তর করা হয়েছে।

শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা

১৪ই জানুয়ারি, ১৯৭৬ তারিখে কলেজ দি ফ্রাসঁ-য় দেওয়া ভাষণ

মোটামুটি ১৯৭০/৭১ সাল থেকে এখন অবধি যে পথ ধরে আমি পাঠ-অনুসন্ধান চালিয়ে গেছি তা ক্ষমতা সম্পর্কে '*কীভাবে ?*' প্রশ্নটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ, আমি ক্ষমতার কলকৌশলকে দুটি নির্দেশবিন্দু বা দুটি সীমাবিন্দুর সাপেক্ষে বুঝতে চেষ্টা করেছি। এই দুটি নির্দেশবিন্দু বা সীমাবিন্দুর একটি হল আধিকারের নানা বিধি যা ক্ষমতার একপ্রকার দস্তুরমাফিক সীমানির্দেশকরণের কাজ করে, আর অন্যটি হল সেই সত্যের ভাব যা এ ক্ষমতা দ্বারা উৎপন্ন ও পরিবাহিত হয়, আবার অন্যপক্ষে যা এ ক্ষমতার পুনরুৎপাদন করে। সুতরাং এখানে আমরা ক্ষমতা, অধিকার ও সত্য নিয়ে গঠিত একটা ত্রিভুজ পাচ্ছি।

রাজনৈতিক দর্শনের পরম্পরাগত প্রশ্নটির পরিলেখ সূত্রায়িত করা যেতে পারে এভাবে: সত্যের প্রতর্ক, বা সোজা কথায়, সত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উত্তমতম প্রতর্ক রূপে দর্শন কীভাবে ক্ষমতার অধিকারগুলোর সীমা চিহ্নিত করে দিতে পারে ? এটাই পরম্পরাগত প্রশ্ন। কিন্তু আমি যে প্রশ্নটি খাড়া করতে চাই তা এর থেকে আলাদা। পরম্পরাগত প্রশ্নটির সম্ভ্রান্ত ও দার্শনিক চরিত্রের প্রতিতুলনায় আমার কাঙ্খিত প্রশ্নটি অনেক বেশি মাটিঘেঁষা ও মূর্ত। আমার প্রশ্নটি এরকম: সত্যের প্রতর্ক উৎপাদন করার কাজে ক্ষমতার সম্পর্ক কী কী অধিকারের বিধি কার্যকরী করে ? বা অন্যভাবে বললে, আমাদের সমাজের মতো সমাজে এহেন শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে সক্ষম যেসব সত্যের প্রতর্ক, তাদের উৎপাদন করার ঝোঁক কী ধরনের ক্ষমতার মধ্যে

আছে ? আমি যা বলতে চাইছি তা হল: আমাদের সমাজের মতো সমাজে তো বটেই, মূলগতভাবে যে কোনও সমাজেই, ক্ষমতার এমন বহুভাঁজ সম্পর্কসমূহ বর্তমান যেগুলো সমাজদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেঁধিয়ে গিয়ে সমাজবৈশিষ্ট্যসূচক হয়ে ওঠে ও সমাজদেহকে বিধিমত গঠন করে। আর এই ক্ষমতার সম্পর্কগুলো একটি প্রতর্কের উৎপাদন, পুঞ্জীভবন, সংবহন ও ক্রিয়াপ্রক্রিয়া ছাড়া নিজেরা প্রতিষ্ঠিত, সংগঠিত ও কার্যকরী হতে পারে না। এই যোগাযোগের মাধ্যমে ও এই যোগাযোগের ভিত্তিতে ক্রিয়াশীল সত্যের প্রতর্কগুলোর একটি নির্দিষ্ট অর্থশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া ক্ষমতার কোনও চর্চা অসম্ভব। ক্ষমতার মাধ্যমে আমাদের সত্যের উৎপাদনব্যবস্থার অধীন করা হয়, আবার, সত্য উৎপাদন না করে আমরা ক্ষমতা চর্চা করতে পারি না। একথা সব সমাজের জন্য সত্য হলেও আমার মনে হয় যে আমাদের সমাজের মতো সমাজে ক্ষমতা, অধিকার ও সত্যের মধ্যে সম্পর্কগুলো অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ভাবে সংগঠিত হয়ে থাকে। স্বয়ং তার কলকৌশলকে নয়, বরং তার তীব্রতা ও বিরামহীনতাকে যদি চিহ্নিত করতে হয়, তবে আমি বলব, ক্রিয়াশীল থাকার জন্য আমাদের সমাজের যে ক্ষমতার সত্য প্রয়োজন, তাই যে ক্ষমতার সত্যকে সে দাবি করে, সেই ক্ষমতার সত্যকে উৎপাদন করতে আমাদের বাধ্য করা হয়: সত্য বলতে আমরা বাধ্য, স্বীকার করতে বা সত্যকে আবিষ্কার করতে আমরা বাধ্য বা দণ্ডিত। ক্ষমতা কখনওই তার জবাবদিহি চাওয়ায়, তদন্ত চালানোয় ও সত্যের পঞ্জীকরণ করায় বিরাম দেয় না: তা বিরামহীন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে, পেশাদারিত্ব তৈরি করে, পুরস্কারের ব্যবস্থা করে। শেষ বিচারে, আমরা সত্য উৎপাদন করতে বাধ্য ঠিক যেমন আমরা সম্পদ উৎপাদন করতে বাধ্য, কার্যত সম্পদ উৎপাদন করার জন্য আমরা প্রাথমিকভাবে সত্য উৎপাদন করতে বাধ্য। আর এক ভাবেও আমরা সত্যের অধীনস্থ। তা এই অর্থে যে সত্যই আইন বানায় এবং এমন সত্য প্রতর্ক উৎপাদন করে যা অন্তত আংশিকভাবে হলেও ক্ষমতার প্রভাবগুলোকে নির্ধারণ করে, চালান করে ও নিজে থেকে আরও প্রসারিত করে। শেষ অবধি, ক্ষমতার সুনির্দিষ্ট প্রভাব বহনকারী সত্য প্রতর্কগুলোর কার্যকারিতার মধ্য দিয়েই আমাদের বিচার হয়, দোষচিহ্নিত হয়, বর্গীকরণ করা হয়, কার্যভার অনুযায়ী চিহ্নিত করা হয় এবং বাঁচা বা মরার একটা নির্দিষ্ট পন্থার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, অধিকারের বিধি, ক্ষমতার কলকৌশল, সত্যের প্রভাবাবলি, বা, এভাবেও বলা যায়, ক্ষমতার বিধি ও সত্য প্রতর্কগুলোর ক্ষমতা— কমবেশি এসবই আমার ভাবনাচিন্তার বিচরণের সাধারণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। যদিও আমি খুব ভালোভাবেই সচেতন যে এই ক্ষেত্রে আমার বিচরণ আঁকাবাঁকা পথ ধরে আংশিকতায় আবদ্ধ থেকেছে। গবেষণার এই পর্যায় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আমি এই পর্যায়ে পথপ্রদর্শক নীতি হিসেবে কী গ্রহণ করেছিলাম এবং পদ্ধতিগত অনুজ্ঞা বা সবধানতাই বা কী অবলম্বন করেছিলাম, সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। অধিকার ও ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক পাঠ করার সাধারণ নীতি প্রসঙ্গে আমার মনে হয় যে মধ্যযুগ থেকে পাশ্চাত্য সমাজগুলোতে রাজকীয় ক্ষমতাকে আবশ্যকীয়ভাবে কেন্দ্রে রেখেই আইন-বিষয়ক চিন্তাভাবনা বিস্তারিত করা হয়েছে। রাজকীয় ক্ষমতার চাহিদায় সাড়া দিয়ে,তার লাভের জন্য এবং তার যৌক্তিকতা বিধানের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করার জন্যই আমাদের নিজেদের এই সমাজের আইনকানুন সম্বন্ধীয় ভিত্তিটি গড়া হয়েছিল। পাশ্চাত্যে অধিকার মানেই রাজার অধিকার। স্বাভাবিকভাবেই কারও অজানা নয় যে রাজকীয় ক্ষমতার সংগঠনে ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞদের বিখ্যাত, বহুচর্চিত ও বহুবন্দিত ভূমিকা কী ছিল। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ভেঙে পড়া আইনকানুন ব্যবস্থাটি যে বড় ঘটনাটিকে ঘিরে বারো শতকে আবার দানা বেঁধেছিল ও যার ভিত্তিতে পুনর্নির্মিত হয়েছিল সেটি হল রোমান আইনের পুনর্জন্ম। এই রোমান আইনের পুনর্জন্ম কার্যত রাজতন্ত্রের কর্তৃত্ববাদী, প্রশাসনিক ও, শেষ বিচারে, পরম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় কৌশলী ও গঠনমূলক ভূমিকা নির্বাহ করেছিল। আর পরবর্তী শতকগুলোয় যখন এই আইনি কাঠামোর উপর থেকে রাজার নিয়ন্ত্রণ খসে গেল, বা আরো সঠিকভাবে বললে, এই আইনি কাঠামোকে যখন ঘুরিয়ে রাজার নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হল, তখন সর্বদা এই সার্বভৌম ক্ষমতার সীমাগুলোকেই প্রশ্নের মুখে ফেলা হয়েছে, তার বিশেষ অধিকারগুলোর বিরুদ্ধেই যুদ্ধঘোষণা করা হয়েছে। অন্যভাবে বললে, আমার মনে হয় যে রাজাই পাশ্চাত্যের গোটা আইনি কাঠামোর কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে থেকে গেছে। পাশ্চাত্যের আইনি ব্যবস্থার সাধারণ সংগঠন নিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় যে এখানে রাজা, রাজার অধিকার, রাজার ক্ষমতা এবং তার চূড়ান্ত সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে আবশ্যকীয়ভাবে নাড়াচাড়া করা

হচ্ছে। ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞরা রাজার বিশ্বস্ত অনুচরই হোক বা তার প্রতিপক্ষই হোক, আইনি চিন্তা ও জ্ঞানের এসব জাঁকজমকপূর্ণ কাঠামোগুলো সর্বক্ষেত্রেই রাজকীয় ক্ষমতার কথাই বলছে।

এই কথা বলার ধরন দুরকমের হতে পারে। একরকমভাবে বলার অভিপ্রায় হল রাজকীয় ক্ষমতা নির্ধারণকারী আইনকানুনের অস্ত্রশালার চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা, রাজার ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়েই যে সার্বভৌমত্বের কার্যকরী মূর্তায়ন ঘটছে তা উন্মোচিত করা এবং এটা দেখানো যে রাজার ক্ষমতা যে মাত্রায় পরম সেই মাত্রাতেই তা রাজার মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এর বিপরীতে অন্যভাবে বলার অভিপ্রায় হল এই সার্বভৌম ক্ষমতার উপর সীমা আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা দেখানো, এই সার্বভৌম ক্ষমতাকে এমন কিছু অধিকারের বিধির অধীনস্থ করা যাদের ঘেরাটোপের মধ্যে এর চর্চা হলে তবেই তা বৈধ রূপে স্বীকৃত হবে। মধ্যযুগের সময় থেকেই অধিকারের তত্ত্বের আবশ্যিক ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষমতার বৈধতা নির্ধারণ করা— এই প্রধান সমস্যাটিকে ঘিরেই অধিকার ও সার্বভৌমত্বের সমগ্র তত্ত্ব সংগঠিত হয়েছে।

আমরা যখন বলি যে পাশ্চাত্য সমাজগুলোতে অধিকার বিষয়ক কেন্দ্রীয় সমস্যাটি হল সার্বভৌমত্ব, তখন মূলগতভাবে যা বোঝাতে চাই তা এই যে অধিকার বিষয়ক প্রতর্ক ও কৌশলগুলোর অত্যাবশ্যক ভূমিকা হল ক্ষমতার অন্তর্নিহিত আধিপত্যকে ঢেকে রাখা যাতে আপাতদর্শনে ক্ষমতাকে দুটো আলাদা দিক থেকে হাজির করা যায়: একদিকে সার্বভৌমত্বের বৈধ অধিকার হিসেবে, আর অন্যদিকে তাকে মেনে চলার আইনি বাধ্যবাধকতা হিসেবে। অধিকারের ব্যবস্থাটি পুরোপুরি রাজাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, আর তাই তা আধিপত্যের ঘটনা ও তার ফলাফলকে দূর করার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে।

মধ্যযুগ থেকে চলে আসা অধিকার বিষয়ক প্রতর্কসমূহে অনুসৃত বিশ্লেষণের প্রণালীকে উল্টে দেওয়ার অভিপ্রায় গত কয়েক বছর ধরে আমার গবেষণাপ্রকল্পের সাধারণ অন্তর্বস্তু হিসেবে কাজ করছে। তাই আমার উদ্দেশ্য ছিল তাকে উলটে দাঁড় করানো, যেমন ধরা যাক আধিপত্যের ঘটনাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া, একই সঙ্গে সে আধিপত্যের গুপ্ত চরিত্র ও নিষ্ঠুরতাকে উন্মোচিত করা। সাধারণভাবে অধিকার কীভাবে এই আধিপত্যের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে— যা পুনর্বার বলার অবকাশ রাখে

না— আমি কেবল তাই-ই দেখাতে চাইনি, বরং এটাও দেখাতে চেয়েছি যে কী পরিমাণে ও কী রূপে অধিকার (শুধুমাত্র আইনই নয়, বরং ব্যবস্থাপত্র, প্রতিষ্ঠানাদি ও বিধিসমূহের গোটা জটিল প্রক্রিয়াটি) সেইসব সম্পর্ককে চালান করে ও কার্যকর করে যে সম্পর্কগুলো সার্বভৌমত্বের সম্পর্ক নয়, বরং আধিপত্যের সম্পর্ক। তাছাড়াও, আধিপত্য বলতে আমি সেই ধরনের নিরেট সামগ্রিক ধরনের আধিপত্যের কথা বোঝাচ্ছি না, যা একজন ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির উপর বা এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর উপর চর্চা করে। আমি বোঝাচ্ছি আধিপত্যের সেই বহুভাঁজ রূপের কথা যা সমাজের অভ্যন্তরে চর্চিত হতে পারে। সুতরাং আমি কেন্দ্রীয় অবস্থানে স্থিত রাজার আধিপত্য বোঝাচ্ছি না, বরং পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রজারা যে আধিপত্য চর্চা করে তা বোঝাচ্ছি: সার্বভৌমত্বের সমসত্ত্ব অট্টালিকাকে বোঝাচ্ছি না, বরং সমাজজীবনের মধ্যে স্থান করে নিয়ে সক্রিয় বশীভূতকরণের যে বহুবিধ রূপ তা বোঝাচ্ছি।

অধিকার বিষয়ক ব্যবস্থা ও আইনের পরিসর এইসব আধিপত্যের সম্পর্কের বা বশীভূতকরণের বহুদেহবিশিষ্ট কৌশলাদির স্থায়ী গোমস্তা হিসেবে কাজ করে। আমার মনে হয়, প্রতিষ্ঠা করতে হবে এমন বৈধতা হিসেবে না দেখে, প্ররোচনাদানে সক্রিয় বশীভূতকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার যে রূপ অধিকার ধারণ করে, তার সাপেক্ষেই অধিকারকে দেখা উচিত।

আমার ক্ষেত্রে সমস্যা হল কীভাবে সার্বভৌমত্ব ও ব্যক্তি বিষয়ীদের বাধ্যতা সংক্রান্ত এই প্রশ্নটি যা অধিকার বিষয়ক ভাবনার কেন্দ্রে বসে আছে, তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় যাতে সার্বভৌমত্ব ও বাধ্যতার প্রশ্নকে আধিপত্য ও বশীভূতকরণের প্রশ্ন দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা যায়। বিশ্লেষণের সাধারণ দিকনির্দেশটি এভাবে নির্দিষ্ট করায় তা পালন করার জন্য কিছু সংখ্যক পদ্ধতিগত সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। প্রথমত এটা স্বীকার করে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ক্ষমতার কেন্দ্রীয় অবস্থানগুলিতে প্রাপ্য ক্ষমতার নিয়ন্ত্রিত ও বৈধ রূপগুলোকে নিয়ে, তার কাজ করার সাধারণ কলকৌশল নিয়ে এবং সেসবের ধারাবাহিক প্রভাব নিয়ে এই বিশ্লেষণ মাথা ঘামাবে না। বরং, তার বিপরীতে, এই বিশ্লেষণ মনোযোগ দেবে ক্ষমতার প্রান্তসীমাগুলোয় যা ক্ষমতার চরম গন্তব্যস্থলও বটে; এই বিশ্লেষণ মনোনিবেশ করবে সেই বিন্দুগুলোয় যেখানে ক্ষমতা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাল তৈরি করে বহমান, অর্থাৎ, তুলনামূলক আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক রূপ ও

প্রতিষ্ঠানের উপর নজর ফেলবে। আসলে এর প্রধান মনোনিবেশের জায়গা হতে হবে সেই বিন্দুগুলো যেখানে ক্ষমতাকে সংগঠিত ও সীমায়িত করে রাখা অধিকারের বিধিগুলোকে ছাপিয়ে গিয়ে ক্ষমতা নিজেকে বিস্তৃত করে, প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে নিজেকে বিনিযুক্ত করে, কৌশলাদির মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, হাতিয়ার ধারণ করে এবং ঘটনাক্রমে বস্তুগত হস্তক্ষেপের হিংসাত্মক উপায়ও অবলম্বন করে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। দণ্ডদানের অধিকার কোথায় কীভাবে সার্বভৌমত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা খুঁজে বের করার বদলে, রাজকীয় অধিকার বা গণতান্ত্রিক অধিকারের তত্ত্বে কীভাবে এই দণ্ডদানের অধিকারকে হাজির করা হয়েছে তা খোঁজার বদলে আমি দেখার চেষ্টা করেছি কী কী উপায়ে দণ্ডদান ও দণ্ডদানের ক্ষমতা জেলবন্দি করে রাখা ও পীড়ন করার সঙ্গে যুক্ত কতিপয় আঞ্চলিক, প্রাদেশিক, বস্তুগত প্রতিষ্ঠানে কার্যকরীভাবে মূর্ত রূপ ধারণ করেছে; আর এসবকে দণ্ডদানের কার্যকরী বিশেষ ব্যবস্থাপত্রের আবহে— আবহ বলতে একইসঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রাকৃতিক আবহ, নিয়ন্ত্রিত ও হিংসাত্মক আবহ— হাজির করতে চেষ্টা করেছি। অন্যভাবে বললে, ক্ষমতাকে চিহ্নিত করা উচিত তার চর্চার প্রান্তসীমাবিন্দুগুলোয় যেখানে সবসময়েই তা তুলনায় কম বৈধ রূপ ধারণ করে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিগত সাবধানতাটি বলে যে সচেতন অভিপ্রায় বা সিদ্ধান্তের স্তরে গিয়ে ক্ষমতাকে নিয়ে ভাবা এই বিশ্লেষণের কাজ নয়। এই বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে তার অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার চেষ্টা করবে না এবং গোলোকধাঁধায় ফেলা উত্তরহীন এই প্রশ্নকে খাড়া করবে না যে 'ক্ষমতা তাহলে কার হাতে আছে এবং সেই ব্যক্তির মনে কী আছে?' তার পরিবর্তে এর কাজ ক্ষমতাকে সেই বিন্দুতে পাঠ-বিশ্লেষণ করা যেখানে তার অভিপ্রায় বলে যদি কিছু থাকে তবে তা সম্পূর্ণতই বাস্তব কার্যকরী চর্চাসমূহের মধ্যেই নিযুক্ত অবস্থায় আছে। যাকে আপাতত আমরা বলতে পারি ক্ষমতার বিষয়, ক্ষমতার লক্ষ্যবস্তু, বা ক্ষমতার প্রয়োগক্ষেত্র, তার সঙ্গে ক্ষমতা যেখানে প্রত্যক্ষ ও আশু সম্পর্কে স্থিত , যেখানে ক্ষমতা নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছে এবং তার বাস্তব প্রভাব ফলাচ্ছে, সেই বিন্দুতে ক্ষমতার বাইরের মুখকে ধরে ক্ষমতার পাঠ-বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

সুতরাং, এই প্রশ্ন আমরা করব না যে কেন কিছু মানুষ আধিপত্য খাটাতে চায়, কী তাদের অভিপ্রায়, সামগ্রিক কী রণকৌশল তারা অবলম্বন করে।

তার বদলে আমরা প্রশ্ন করব যে চলমান বশীভূতকরণের স্তরে কীভাবে সবকিছু ঘটছে; যে ধারাবাহিক ছেদহীন প্রক্রিয়াসমূহ আমাদের দেহকে অধীনস্থ করে, আমাদের আকার-ইঙ্গিতকে শাসন করে, আমাদের আচরণকে হুকুম-নিয়ন্ত্রিত করে, ইত্যাদি, সেই স্তরে কীভাবে সবকিছু ঘটছে? অন্য ভাষায় বললে, সার্বভৌমত্ব তার অত্যুচ্চ স্বাতন্ত্র্যের অবস্থান থেকে কীভাবে আমাদের দৃষ্টিতে ধরা দেয়, সেই প্রশ্ন নিজেদের করার বদলে আমরা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করব কীভাবে বিবিধ প্রাণী, বল, শক্তি, বস্তু, আকাঙ্খা, চিন্তা, ইত্যাদির বহুত্বের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে বিষয়ীরা আসলে বস্তুগতভাবে নির্মিত হয়। অধীনস্থকরণ প্রক্রিয়াকে তার বস্তুগত দৃষ্টান্তের মধ্যে রেখে বিষয়ী-নির্মাণের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বুঝতে আমরা চেষ্টা করব। তা হবে '*লেভিয়াথান*'-য়ে হবস্-য়ের প্রকল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত। আসলে, আমার মনে হয়, যেসব ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞদের কাছে সমস্যাটা হল বহুবিবিধ ব্যক্তিএককদের বিশেষ অভিপ্রায়সমূহ থেকে পাতনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি একক অভিপ্রায়, বা বলা ভালো সার্বভৌমত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি একক একমেবাদ্বিতীয়ম দেহ গঠন করা, ামাদের কাজ হল তাদের প্রকল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত। লেভিয়াথান-য়ের নকশাটার কথাই ধরা যাক: যে মাত্রায় লেভিয়াথান একজন তৈরি-করা মানুষ, সেই মাত্রাতেই সে কিছু সংখ্যক আলাদা ব্যক্তিত্বের মিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়, যে আলাদা ব্যক্তিত্বগুলি রাষ্ট্র গঠন করতে ব্যবহৃত জটিল উপাদানগুলির দ্বারা আবার একসঙ্গে বাঁধা পড়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের হৃদয়ে, বা বলা ভালো, রাষ্ট্রের মাথায় এমন কিছুর অস্তিত্ব আছে যা রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করে, আর তাই-ই হল সার্বভৌমত্ব, হবস্-য়ের মতে যা হল লেভিয়াথান-য়ের আদর্শ। তা বেশ, কেন্দ্রীয় আদর্শের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর বদলে আমার বিশ্বাসমতে আমাদের উচিত কাজ হল ক্ষমতার প্রভাবের ফলে যে অসংখ্য দেহসমূহ প্রান্তিক বিষয়ী হিসেবে ন্যস্ত হয়েছে তাদের পাঠ-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা।

তৃতীয় পদ্ধতিগত সাবধানতা দরকার এই বিষয়ে যে ক্ষমতাকে কখনই অপরাপর অন্যদের উপর একজন ব্যক্তির, একটি গোষ্ঠীর বা একটি শ্রেণির সুসংগঠিত সমসত্ত্ব আধিপত্য হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। বরং তার বিপরীতে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে অতিরিক্ত দূর থেকে না দেখলে ক্ষমতা কখনই এমন কিছু রূপে দেখা দেয় না যা ক্ষমতাধারী ও ক্ষমতাকে ধরে রাখা একচেটিয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে ক্ষমতাহীন ও ক্ষমতার কাছে নতিস্বীকার

করতে বাধ্য গোষ্ঠীর তফাৎ গড়ে দেয়। ক্ষমতাকে এমনকিছু হিসেবে বিশ্লেষণ করতে হবে যার সংবহন বা সঞ্চলন ঘটে চলেছে, বা এমনকিছু যা কেবলমাত্র একটি শৃঙ্খলমালার রূপ ধরেই কাজ করে। ক্ষমতা কখনই এখানে বা ওখানে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না, কখনই তা কারও হস্তগত হয়ে থাকতে পারে না, একটি পণ্য বা একখণ্ড সম্পদের মতো তা আত্মসাৎ করা যায় না। জালসদৃশ এক সংগঠনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা নিযুক্ত ও চর্চিত হয়। আর ব্যক্তিএককরা কেবলমাত্র সেই জালের তন্তুর মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয় না, ব্যক্তিএককরা সর্বদাই একই সঙ্গে যুগপৎভাবে ক্ষমতার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ও ক্ষমতাপ্রভাব খাটানোর অবস্থানে থাকে। ব্যক্তিএককরা কেবলমাত্র ক্ষমতার নিষ্ক্রিয় সম্মতিপ্রদত্ত নিশানা নয়, তারা সর্বদা ক্ষমতার গ্রন্থনার উপাদান হিসেবেও কাজ করে। সংক্ষেপে বললে, ব্যক্তিএককরা হল ক্ষমতার বাহন, তারা ক্ষমতার প্রয়োগবিন্দু নয়।

ব্যক্তিএকক কি এক ধরনের মৌলিক পরমাণুকেন্দ্র, আদিম এক পরমাণু, বিবিধ ও নিষ্ক্রিয় জড়বস্তু, যার উপর ক্ষমতা এসে এঁটে বসে বা যার বিরুদ্ধে ক্ষমতা আঘাত হানে, আর তা করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিএককদের বশীভূত করে ফেলে বা চূর্ণ করে ? এমনটা ভাবা ঠিক হবে না। আসলে ক্ষমতার একটি প্রধান প্রভাবই হল এই যে তার কারণে কতিপয় দেহ, অভিব্যক্তি, প্রতর্ক, কামনা চিহ্নিত হয় ও নির্মিত হয় ব্যক্তিএকক রূপে। অর্থাৎ, ব্যক্তিএকক ক্ষমতার *বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু* নয়, বরং, আমার মনে হয়, তা হল ক্ষমতার প্রধান প্রভাবগুলোর অন্যতম। ব্যক্তিএকক হল ক্ষমতার একটি প্রভাব, এবং একইসঙ্গে, বা যে মাত্রায় তা এই প্রভাব সেই মাত্রায় তা ক্ষমতার গ্রন্থনার উপাদান। যে ব্যক্তিএককে ক্ষমতা নির্মাণ করেছে তা একইসঙ্গে ক্ষমতার বাহনও বটে।

এই অনুসারে একটি চতুর্থ পদ্ধতিগত সাবধানতা এসে পড়ে: যখন বলছি যে ক্ষমতা এমন এক জাল তৈরি করে যার মধ্য দিয়ে তা মুক্তভাবে সঞ্চালিত হয়, তখন তা কেবল একটা দূর অবধিই সত্য। অনেকটা একই রকম ভাবে বলা যায় যে তাহলে আমাদের সবার মাথার মধ্যেই একপ্রকার ফ্যাসিবাদ আছে, বা আরও সূক্ষ্মভাবে বলা যেতে পারে আমাদের সবার দেহেই একপ্রকার ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমার মনে হয় না যে তার থেকে এমন সিদ্ধান্ত টানা ঠিক হবে যে বিশ্বে সবচেয়ে সুবন্টিত বস্তু হল ক্ষমতা, যদিও এক অর্থে তা পুরোপুরি অস্বীকার করারও উপায় নেই। আমরা এখানে দেহদের

মধ্য দিয়ে ক্ষমতার কোনও গণতান্ত্রিক বা নৈরাষ্ট্রবাদী বন্টনের আলোচনা করছি না। অর্থাৎ, আমার মনে হয়— এবং এটাই চতুর্থ পদ্ধতিগত সাবধানতা— যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হল এমন কোনও অবরোহমূলক নির্ধারণের মাধ্যমে ক্ষমতাকে বোঝার চেষ্টা না করা যা ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে যাত্রা শুরু করে ক্রমশ আবিষ্কার করতে চায় কী পরিমাণে তা ভিত্তির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অণুকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে কীভাবে সেখানেও নিজেকে পুনরুৎপাদিত করে চলেছে। ক্ষমতার এহেন *নিম্নগামী* বিশ্লেষণের বদলে বরং একপ্রকার *ঊর্ধ্বগামী* বিশ্লেষণ করা জরুরী। সেই ঊর্ধ্বগামী বিশ্লেষণ শুরু করতে হবে সেইসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কলকৌশল থেকে যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ইতিহাস, নিজস্ব যাত্রাপথ, নিজস্ব প্রযুক্তি ও কৌশল আছে। সেখান থেকে শুরু করে তারপর দেখতে হবে কীভাবে ক্ষমতার এই কলকৌশলগুলো ক্রমশ অধিকতর সাধারণ কলকৌশল ও আধিপত্যের সামগ্রিক রূপগুলোর দ্বারা বিনিযুক্ত, উপনিবেশিকৃত, ব্যবহৃত, আরও জটিল পাক খেয়ে রুপান্তরিত, স্থানান্তরিত, বিস্তৃত ইত্যাদি হয়েছে বা এখনও হয়ে চলেছে। এমনটা নয় যে এই সামগ্রিক আধিপত্য একেবারে তলার ভিত্তি অবধি প্রতিঘাতের বিবিধতায় নিজেকে বিস্তৃত করে। আমার মনে হয় যে সবচেয়ে তলার ভিত্তির স্তরে ক্ষমতার প্রতীতি, কৌশল ও পদ্ধতিগুলো কীভাবে কাজ করে তা অবশ্যই বিশ্লেষণ করতে হবে, কীভাবে এই পদ্ধতিগুলো স্থানান্তরিত, বিস্তৃত ও পরিবর্তিত হয় তা অবশ্যই দেখাতে হবে, কিন্তু সবার উপরে যা দেখানো জরুরী তা হল কীভাবে তা অধিকতর সামগ্রিক প্রতীতির দ্বারা বিনিযুক্ত ও অধিকৃত হয় এবং এই যে প্রকৌশলগুলো একইসঙ্গে ক্ষমতার থেকে আপেক্ষিক স্বাধীনতা বজায় রাখে আবার ক্ষমতার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদান হিসেবে কাজ করে, কী সূক্ষ্ম উপায়ে তাদের সঙ্গে অধিকতর সাধারণ ক্ষমতারূপগুলো বা অর্থনৈতিক স্বার্থগুলো ব্যাপৃত হয়। বিষয়টা আরো পরিষ্কার করার জন্য উন্মত্ততার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেপ্রকার নিম্নগামী বিশ্লেষণ এড়িয়ে যাওয়া উচিত বলে আমার মত, তেমন বিশ্লেষণ বলবে যে ষোল বা সতের শতক থেকে বুর্জোয়ারা হল আধিপত্যকারী শ্রেণি এবং তারপর এই প্রাথমিক প্রস্তাব থেকে উন্মত্তদের আটক করে রাখাকে ব্যাখ্যা করতে এগোবে। এরকম অবরোহমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণ সবসময়েই করা যেতে পারে এবং তা করা বেশ সহজও বটে এবং এইজন্যই আমি তার বিরোধী। এমনটা দেখানো খুব সহজ যে পাগলরা

যেহেতু শিল্পোৎপাদনের জন্য অকেজো ব্যক্তি তাই তাদের পরিহার করাই বিধেয়। একই রকম যুক্তি খাড়া করা সম্ভব শিশুদের যৌনতা নিয়েও— এবং উইলহেলম রিচ-য়ের মতো বহু ভাবুক কার্যত একটা দূর অবধি তেমন করেছেনও। বুর্জোয়া শ্রেণির আধিপত্যকে ধরে নিয়ে কীভাবে কেউ শিশুদের যৌনতার অবদমনকে ব্যাখ্যা করতে পারে? ব্যাখ্যা করতে পারে খুব সহজেই— এটা যদি ধরে নেওয়া হয় যে সতেরো ও আঠারো শতকের সময় থেকে মানব দেহ আবশ্যকীয়ভাবে উৎপাদনী শক্তির একটি অংশে পরিণত হয়েছে, তাহলে মানবদেহের যে কোনও ধরনের ব্যবহার যা উৎপাদনী শক্তির সংগঠনে ভূমিকা নেয় না আর তাইজন্যই বাতিলযোগ্য বলে চিহ্নিত, তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, বাদ দেওয়া হয়েছে ও অবদমন করা হয়েছে। এই ধরনের অবরোহমূলক যুক্তিবিস্তার সবসময়ই সম্ভব। তারা একইসঙ্গে ঠিক ও বেঠিক। তাছাড়াও তারা অতিরিক্ত বাকপটুত্বে পিছল, কারণ সম্পূর্ণ উল্টোদিকে গিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণির আধিপত্যের নীতিকে মান্যতা দিয়েও কেউ সমভাবে দেখাতে পারে যে শিশুদের যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার রূপগুলো মোটেই আগে থেকে বলে দেওয়া সম্ভব ছিল না। বরং একইরকম বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে দাবি করা যেতে পারে যে যৌন প্রশিক্ষণ এবং যৌন অবচেতনকে উৎসাহিত করার দরকার ছিল যেহেতু মূলগত প্রশ্নটি ছিল শ্রমবাহিনীকে সংগঠিত করার তাগিদকে ঘিরে এবং আমরা খুব ভালোই জানি যে অন্তত উনিশ শতকের শুরুর সময়ে শ্রমবাহিনীর আদর্শ কাঙ্খিত রূপটি ছিল এক অসীম রূপ: শ্রমবাহিনী যত বড় হবে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ততই তার কার্যকারিতাকে পূর্ণ করতে পারবে ও আরো উন্নত করে তুলতে পারবে।

আমার বিশ্বাস যে বুর্জোয়াশ্রেণির আধিপত্যের সাধারণ প্রতীতি থেকে শুরু করে অবরোহমূলক যুক্তিবিস্তারের মাধ্যমে যা খুশি তাই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা আমাদের দরকার নেই, আমাদের দরকার সম্পূর্ণ অন্য কিছু। আমাদের ঐতিহাসিকভাবে অনুসন্ধান চালাতে হবে, সবচেয়ে তলার স্তর থেকে শুরু করে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে কীভাবে ক্ষমতার কলকৌশল কাজ করতে পেরেছে। যেমন ধরা যাক, পাগলদের আটক করে রাখার ব্যাপারে বা যৌনতার অবদমন ও নিষেধিকরণের ব্যাপারে আমাদের দেখতে হবে যে পরিবার, প্রত্যক্ষ পরিবেশ, সমাজকোষ বা সমাজের সবচেয়ে প্রাথমিক এককগুলোর কার্যকরী স্তরে

অবদমন ও বহিষ্করণের এসব প্রতীতি কীভাবে তাদের হাতিয়ার ও যুক্তিগুলোকে কিছু সংখ্যক প্রয়োজনের নিরিখে শামিল করছে। আমাদের চিহ্নিত করতে হবে তাদের যারা এই অবদমন বা বহিষ্করণের দায় বহনকারী প্রতিনিধি বা নিযুক্তক, প্রকৃতই যারা প্রতিনিধি বা নিযুক্তক (যারা প্রত্যক্ষ সামাজিক *পারিষদবর্গের* ভূমিকা নেয়, পরিবার, বাবা-মা, চিকিৎসক ইত্যাদি), সাধারণিকৃত বুর্জোয়ার সূত্রের মধ্যে সবাইকে দলা পাকিয়ে এক করে রাখায় সন্তুষ্ট হলে চলবে না। আমাদের দেখতে হবে কীভাবে কোনও প্রদত্ত মুহূর্তে নির্দিষ্ট কোনও সন্ধিক্ষণে কিছু সংখ্যক রূপান্তরের সহযোগে ক্ষমতার এই কলকৌশলগুলো অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাদায়ী ও রাজনৈতিকভাবে কার্যকরী হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। আমার মনে হয় যে এইভাবে সহজেই দেখানো যাবে কীভাবে পাগলদের বহিষ্করণ বা শিশুদের হস্তমৈথুনের উপর নিষেধাজ্ঞা ও নজরদারির মতো ব্যবস্থাই বুর্জোয়াদের দরকার ছিল বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এদের মধ্যেই নিজের প্রকৃত স্বার্থ আবিষ্কার করেছিল এমনটা নয় (কারণ, আবারও বলি, বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত অভ্যাসবিধিও সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারে), বরং এহেন বহিষ্করণের কৌশল ও পদ্ধতিগুলো এই ব্যবস্থার দরকার ছিল। বুর্জোয়াদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়কাল থেকে বহিষ্করণের কলকৌশল, নজরদারি করার ব্যবস্থাপত্র, যৌনতাকে রোগচিকিৎসার আদলে ঢেলে সাজানো, অপরাধী ও পাগল নির্ধারণ সহ ক্ষমতার সমস্ত আণবিক কলকৌশল প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। বা আরো ভালো করে বললে বলা যায়, যে মাত্রায় অন্তত এখানে চিহ্নিত করা সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়াদের স্বার্থ সংক্রান্ত এই দৃষ্টিভঙ্গি আপাতদৃষ্টিতে সারহীন বলে মনে হয়, তা আসলে এই তথ্যকেই প্রতিফলিত করে যে পাগলদের বহিষ্করণ করতে হবে বা শিশুদের যৌনতা অবদমন করতে হবে এমন ভাবনা বুর্জোয়ারা নিজেরাই প্রথম ভাবেনি। বরং যা ঘটেছে তা হল এই যে পাগলদের বহিষ্করণ ও শিশুদের যৌনতার উপর নজরদারির কলকৌশলগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়কাল থেকে কিছু কারণে (যা আমাদের পাঠ-বিশ্লেষণ করতে হবে) তাদের রাজনৈতিক কার্যকারিতা প্রদর্শন করতে শুরু করে এবং অর্থনৈতিক মুনাফাসঞ্চয়েও সহায়ক ভূমিকা নিতে শুরু করে। তার স্বাভাবিক ফল হিসেবেই হঠাৎই সামগ্রিক পদ্ধতিব্যবস্থা ও সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থা তাদের উপনিবেশিকৃত করে নেয় ও বজায় রাখতে শুরু করে। যদি আমরা ক্ষমতার

এই কৌশলগুলোকে ধরতে পারি এবং প্রদত্ত প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট কারণে তার থেকে উৎপন্ন হওয়া অর্থনৈতিক সুবিধা ও রাজনৈতিক কার্যকারিতাকে দেখাতে পারি, তবেই আমরা বুঝতে পারব কীভাবে এই কলকৌশলগুলো সামাজিক সমগ্রের মধ্যে কার্যকরীভাবে অঙ্গীভূত হয়েছে।

কিছুটা অন্যভাবে বললে বলা যায়: পাগলরা কখনই বুর্জোয়াদের কোনও কাজে লাগেনি; কিন্তু পাগলদের বহিষ্করণ করতে প্রযুক্ত পদ্ধতিগুলো উনিশ শতকের সময় থেকে আবারও কিছু রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কিছু রাজনৈতিক সুবিধা ও অবস্থা বিশেষে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কার্যকারিতা হিসেবে নিজেদের উন্মোচিত করেছে ও বুর্জোয়াদের উপলব্ধিতে ধরা দিয়েছে, যা গোটা ব্যবস্থাটিকে সংগঠিত করে সামগ্রিকভাবে কার্যকরী করে তুলেছে। বুর্জোয়ারা ক্ষমতা নিয়ে উৎসাহী, পাগলামো নিয়ে উৎসাহী নয়, শিশুদের যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা নিয়েও উৎসাহী নয়, ওই প্রতীতি নিয়ে তাদের উৎসাহ নেই। অপরাধীদের যে দণ্ডদান বা পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার খুব কমই অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে, তা নিয়ে বুর্জোয়ারা মাথা ঘামায় না, কিন্তু মাথা ঘামায় সেই কলকৌশলের সমষ্টি নিয়ে যার মাধ্যমে অপরাধপ্রবণতাকে নিয়ন্ত্রিত, চিহ্নিত, দণ্ডিত, সংস্কার ইত্যাদি করা হয়।

আমাদের পদ্ধতিগত সাবধানতাগুলোর মধ্যে পঞ্চমটি হল: খুব সম্ভবত ক্ষমতার প্রধান কলকৌশলগুলোর সহগামী হিসেবে মতবাদিক উৎপাদনের কাজ চলেছে। যেমন ধরা যাক, সম্ভবত শিক্ষার মতবাদ, রাজতন্ত্রের মতবাদ, সংসদীয় গণতন্ত্রের মতবাদ ইত্যাদি ছিল বা আছে, কিন্তু মূলগতভাবে আমার মনে হয় না যে যা ঘটেছে তাকে মতবাদিক বলা যেতে পারে। যা ঘটেছে তা মতবাদের থেকে একইসঙ্গে অনেক বেশি আবার অনেক কমও বটে। তা হল পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি, নিবন্ধনের কৌশল, অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রণালী, ইত্যাদির মতো জ্ঞান তৈরি ও সঞ্চয় করার উপযোগী উপায়সমূহের উৎপাদন। এসবের তাৎপর্য হল এই যে এহেন সূক্ষ্ম কলকৌশলের মাধ্যমে যখন ক্ষমতা চর্চিত হয়, তখন মতবাদিক নির্মাণের পর্যায়ে পড়ে না এমন একটি জ্ঞান, বা বলা ভালো, জ্ঞানের ব্যবস্থাপত্র বিকশিত, সংগঠিত ও পরিবাহিত হয়।

এই পাঁচটি পদ্ধতিগত সাবধানতার সারসংক্ষেপ হিসেবে বলব যে ক্ষমতার প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা-অনুসন্ধানের অভিমুখ সার্বভৌমত্বের বিচারবিভাগীয় সৌধ, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপত্র ও আনুষঙ্গিক মতবাদগুলোর দিকে

রাখলে চলবে না, সেই অভিমুখ রাখতে হবে আধিপত্য ও ক্ষমতার বস্তুগত চালনাকারীদের দিকে, বশীভূতকরণের বিভিন্ন রূপ ও তাদের আঞ্চলিক ব্যবস্থার আনতি ও ব্যবহারের দিকে এবং কৌশলগত ব্যবস্থাপত্রের দিকে। ক্ষমতা সম্পর্কে পাঠ-অনুসন্ধানের কাজে লেভিয়াথান-য়ের ধাঁচাকে আমাদের পরিহার করতে হবে। বিচারবিভাগীয় সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সংকীর্ণ ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আমাদের বরং আধিপত্যের কলাকৌশল পাঠ-অনুসন্ধানের উপর ক্ষমতার বিশ্লেষণকে দাঁড় করাতে হবে।

যে পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত বলে আমি মনে করি, এই হল তার সাধারণ রূপরেখা। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মনোরোগ চিকিৎসার সঙ্গে সংযুক্ত ক্ষমতা, শিশুদের যৌনতা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর আমরা যে বিবিধ গবেষণা চালিয়েছি, সেখানেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে আমি চেষ্টা করেছি। এখন, এইসব পদ্ধতিগত সাবধানতা অবলম্বন করে কেউ যদি এই অনুসন্ধানক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অনুসন্ধানে ব্রতী হয়, তবে ঐতিহাসিক তথ্যের একটি সুদৃঢ় জমাট শরীর দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস। এই নিরেট ঐতিহাসিক তথ্যাবলীই শেষ বিচারে আমাদের এমন কিছু সমস্যার মুখে এনে ফেলে যা সম্পর্কে এই বছরের ভাষণে আমি কিছু বলতে চাই।

এই নিরেট ঐতিহাসিক তথ্যাবলী বলতে আমি সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত বিচারবিভাগীয়-রাজনৈতিক তত্ত্বের কথা বোঝাচ্ছি, যার কথা কিছুক্ষণ আগেও আমি বলেছি। এই তত্ত্ব চারটি ভূমিকা পালন করেছিল। প্রথমত তা ক্ষমতার এমন এক কলকৌশল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছিল যা সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অধীনে কার্যকর ছিল। দ্বিতীয়ত, বড় মাপের প্রশাসনিক রাজতন্ত্রগুলো নির্মাণের হাতিয়ার এবং এমনকি তা সমর্থনের যুক্তি হিসেবেও কাজ করেছিল। তৃতীয়ত আবার ষোল শতকের সময় থেকে বা আরো বেশি করে সতেরো শতকের সময় থেকে এবং ধর্মীয় যুদ্ধের পর্বে বেশ ভালো ভাবেই এই সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব অস্ত্র হিসেবে এক শিবির থেকে আরেক শিবিরের হাতে ঘোরাঘুরি করেছে এবং কোনও না কোনও ভাবে রাজকীয় ক্ষমতাকে হয় সীমায়িত করতে আর নয়তো জারি করতে ব্যবহৃত হয়েছে: আমরা যেমন তাকে ক্যাথলিক রাজতন্ত্রবাদী ও প্রোটেস্টান্ট রাজতন্ত্র-বিরোধীদের শিবিরে পাব, প্রোটেস্টান্ট ও কমবেশি উদারতাবাদী রাজতন্ত্রীদের শিবিরে পাব, তেমনই পাব রাজহত্যার পক্ষ নেওয়া ক্যাথলিক বা রাজবংশ বদলের পক্ষ নেওয়া ক্যাথলিকদের মধ্যেও। তা অভিজাতদের হাতে অস্ত্র

হিসেবে কাজ করেছে, আবার সংসদপন্থীদের হাতেও অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। রাজকীয় ক্ষমতার প্রতিনিধিদের শিবিরে তা পাওয়া যায়, শেষ সামন্ত রাজন্যদের শিবিরেও তা পাওয়া যায়। শেষাবধি, আঠারো শতকে এসে এই একই সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের সারবস্তু রোমের আইনের মতবাদের মধ্য দিয়ে নতুনভাবে সক্রিয় হয়ে হাজির হতে দেখি রুশো ও তাঁর সমসাময়িকদের ভাবনার মধ্যে, কিন্তু সেখানে তার ভূমিকা চতুর্থ এক রকমের: প্রশাসনিক, হুকুমচালিত ও স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরোধিতায় বিকল্প এক সংসদীয় গণতন্ত্রের ধাঁচা তৈরি করাই তখন তার লক্ষ্য। আর ফরাসি বিপ্লবের সময়েও এই চতুর্থ ভূমিকাটিই তা পালন করেছে।

সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের পালন করা এই চারটি ভূমিকাকে অনুসন্ধান করলে আমার মনে হয় যে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছব, তা হল: যতক্ষণ সামন্ততান্ত্রিক ধরনের একটি সমাজ টিকে ছিল, সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের উদ্দিষ্ট সমস্যাগুলো কার্যত ক্ষমতার সাধারণ কলকৌশলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সীমাবদ্ধ ছিল কীভাবে সমাজের উচ্চতর মহলে তার অস্তিত্ব নিম্নতর মহলে তার চর্চাকে প্রভাবিত করতে পারে তার মধ্যে। অন্যভাবে বললে, সংকীর্ণ বা ব্যাপ্ত, যে অর্থেই তার ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, সার্বভৌমত্বের সম্পর্কটি গোটা সমাজদেহকেই বেষ্টন করে ছিল। ক্ষমতার চর্চা হওয়ার প্রণালী প্রধানত সার্বভৌম ও প্রজার সম্পর্কের মধ্য দিয়েই নিরূপণ করা যেত। কিন্তু সতেরো ও আঠারো শতকে এসে আমরা পাই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীতির উদ্ভব। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতীতি হল অত্যন্ত নির্দিষ্ট পদ্ধতিগত কৌশল, সম্পূর্ণ অভিনব উপায়পত্র ও একদম আলাদা ব্যবস্থাপত্র সমন্বিত ক্ষমতার এক নতুন কলকৌশলের আবির্ভাব, বা বলা ভালো আবিষ্কার, যা সার্বভৌমত্বের সম্পর্কের সঙ্গে কোনওভাবেই খাপ খায় না বলে আমার মনে হয়।

ক্ষমতার এই অভিনব কলকৌশল যত না পৃথিবী ও পৃথিবীর উৎপাদের উপর নির্ভরশীল, তার থেকে অনেক বেশি দেহ ও দেহের ক্রিয়াদির উপর নির্ভরশীল। এ হল এমন ক্ষমতার কলকৌশল যা দেহ থেকে সম্পদ বা পণ্যাদির চেয়ে বরং সময় ও শ্রমকে নিঙড়ে নেওয়ায় কুশলী। এ হল এমন এক ধরনের ক্ষমতা যা সময়পর্যায় জুড়ে অসন্তত ভাবে খাজনা বা বাধ্যতামূলক দেয় আদায়ের মাধ্যমে প্রযুক্ত হওয়ার চেয়ে বরং ছেদহীনভাবে নজরদারি কায়েম করার উপায়ের মধ্য দিয়ে প্রযুক্ত হয়। কোনও এক সার্বভৌমের দৈহিক অস্তিত্বের চেয়ে বরং নিবিড় বুনটসম্পন্ন এক বস্তুগত

নিষ্কাশনের জালের অস্তিত্ব তার জন্য দরকার। শেষ বিচারে তা এমন এক নীতির অপর নির্ভর করে যে নীতি প্রকৃতই অভিনব এক ক্ষমতার অর্থনীতি প্রবর্তন করে যেখানে যুগপৎভাবে দুটি বিষয় ঘটানো সম্ভব হবে: একদিকে যেমন আয়ত্তাধীন বলসমূহের বৃদ্ধি ঘটবে, অন্যদিকে তেমনই তাদের উপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখার বলের শক্তি ও কার্যকারিতাও ক্রমোন্নত হবে।

সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব যে ধরনের ক্ষমতার কলকৌশলের বর্ণনা করেছিল বা পরিলিখিত করতে চেয়েছিল, তার থেকে এই ধরনের ক্ষমতা প্রতিটি দিক থেকেই সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্বের ক্ষমতার ধরনটি ক্ষমতার এমন এক রূপের সঙ্গে যুক্ত যা মানবদেহ ও তার ক্রিয়াকর্মের চেয়ে অনেক বেশি পৃথিবী ও তার উৎপাদের উপর প্রযুক্ত হয়। সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব হল এমনকিছু যা সময় ও শ্রম নয়, বরং দ্রব্যাদি ও সম্পদের স্থানান্তর এবং আত্মসাৎকরণের কথা বলে। সময়পর্যায় জুড়ে অসন্তত ভাবে ছড়ানো বাধ্যতামূলক দায়সমূহকে আইনি রূপ দেওয়া চলত সেখানে, নিরবচ্ছিন্ন নজরদারির সংহিতাকরণ চলত না। ক্ষমতাকে তা সার্বভৌমের দৈহিক অস্তিত্বের উপর দাঁড় করাত, স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি ব্যবস্থার উপর দাঁড় করাত না। সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব ক্ষমতার পরম ব্যয়ের মধ্যেই পরম ক্ষমতার ভিত প্রোথিত করত। ন্যূনতম ব্যয়ের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ প্রাপ্তির হিসেবনিকেশ তার মধ্যে ছিল না।

ক্ষমতার নতুন রূপ, যা আর সার্বভৌমত্বের সূত্রে আর সূত্রায়িত করা যায় না, তা বুর্জোয়া সমাজের প্রধান উদ্ভাবনগুলোর অন্যতম বলে আমার বিশ্বাস। শিল্পোৎপাদনমূলক পুঁজিবাদ ও তার সহচর সামাজিক রূপের গঠনে অন্যতম মৌলিক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে ক্ষমতার এই নতুন রূপ। সার্বভৌমত্বের আদলের বাইরে অবস্থিত এই অ-সার্বভৌম ক্ষমতা হল শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা। সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের থেকে তা এতটাই আমূল আলাদা যে সেই তত্ত্বের পরিভাষায় এর বর্ণনাই অসম্ভব। তাই এই শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতার প্রভাব-পরিসরে সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের গড়ে তোলা বিরাট বিচারবিভাগীয় কাঠামো ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়ে যাবে এমনটাই ভাবা স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি, বাস্তবে সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব বহাল তবিয়তে টিকে থেকেছে কেবলমাত্র অধিকারের মতবাদ হিসেবেই নয়, বরং উনিশ শতকে নোপোলিয়নের কোড থেকে শুরু করে যত আইনি সংহিতা

ইউরোপ তৈরি করেছে তাদের সবার সাংগঠনিক নীতির যোগানদার হিসেবে।

এইসব গুরুত্বপূর্ণ আইনি সংহিতার সাংগঠনিক নীতি হিসেবে ও একটি মতবাদ হিসেবে এইভাবে সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব টিকে থাকল কেন? আমার মনে হয় এর কারণ দুটো। একদিকে, আঠারো শতকে তো বটেই, আবার উনিশ শতকেও তা শৃঙ্খলাদায়ক সমাজের দানা বাঁধায় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে এমন রাজতন্ত্র সহ সমস্ত বাধার বিরুদ্ধ-সমালোচনা করার স্থায়ী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। আবার একই সঙ্গে, সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব এবং তাকে কেন্দ্র করে সংগঠিত আইনি সংহিতা শৃঙ্খলাদায়ক কলকৌশলের উপর এক অধিকারতন্ত্রকে এমনভাবে আরোপ করা সম্ভবপর করে তুলেছে যা তার প্রকৃত কলকৌশল ও সে কলকৌশলের মধ্যে নিহিত আধিপত্যের উপাদানকে ঢেকে রাখে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সুবাদে প্রতিটি নাগরিকের যথাযথ সার্বভৌম অধিকার চর্চার নিশ্চয়তা প্রদান করে। আইনবিষয়ক ব্যবস্থাগুলো— তাদের সংহিতাকরণ এবং তাদের তত্ত্বায়ন, উভয়ের নিরিখেই— যৌথ সার্বভৌমত্বের উপর জন অধিকারের নির্মাণের মধ্য দিয়ে সার্বভৌমত্বের গণতান্ত্রিকীকরণ সম্ভব করে তুলেছে, আবার একই সঙ্গে সার্বভৌমত্বের এই গণতান্ত্রিকীকরণ শৃঙ্খলাদায়ক পীড়নের কলকৌশলে প্রোথিত হয়ে তার দ্বারাই মূলগতভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

আরও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে শৃঙ্খলাদায়ক বন্ধনসমূহ যখন আধিপত্যের কলকৌশলের মধ্য দিয়ে আরোপ করা দরকারী হয়ে উঠল এবং একইসঙ্গে তাদের ক্ষমতার কার্যকরী চর্চা আড়াল করে রাখাও প্রয়োজন হল, তখন আইনি ব্যবস্থাপত্রের স্তরে তার চেহারা দিতে সার্বভৌমত্বের এক তত্ত্বের দরকার পড়ল ও নব সংহিতায় তার পুনরাবির্ভাব ঘটল। তাই উনিশ শতক থেকে আজ অবধি আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে একদিকে এমন এক ধরনের আইনপ্রণয়ন, এক ধরনের প্রতর্ক, জন অধিকারের উপর ভিত্তি করা এমন এক ধরনের সংগঠন যার গ্রন্থনার নীতি সমাজদেহ ও প্রতিটি নাগরিকের প্রতিনিধিত্বমূলক অবস্থানের মধ্যে ন্যস্ত, আবার অন্যদিকে শৃঙ্খলাদায়ী পীড়নের এমন এক ঘন সংবদ্ধ জাল যার উদ্দেশ্যই হল এই সমাজদেহের সংসক্তি বজায় রাখা। এক ধরনের অধিকারের তত্ত্ব এই ঘন সংবদ্ধ জালের এক আবশ্যক সহচর হলেও, তা কোনওভাবেই এই জালের অনুমোদনের শর্ত যোগান দিতে পারে না। তাই এই দুটি সীমা—

সার্বভৌমত্বের অধিকার এবং শৃঙ্খলার কলকৌশল— ক্ষমতাচর্চার পরিসরকে সংজ্ঞায়িত করে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু এই দুটি সীমা এতই অসদৃশ যে সম্ভবত তাদের একে অন্যতে লঘুকরণ করা যায় না। সার্বভৌমত্বের জন অধিকার এবং বহুরূপীয় শৃঙ্খলাদায়ক কলকৌশলের মধ্যের এই বিসদৃশতার মধ্য দিয়েই, তার ভিত্তিতেই এবং তার সুবাদেই আধুনিক সমাজের ক্ষমতাসমূহ প্রযুক্ত হয়। তার মানে অবশ্য এটা বলা হচ্ছে না যে একদিকে সার্বভৌমত্বের রূপে অধিকারের একটি স্পষ্ট বিশদ ও পণ্ডিতোচিত ব্যবস্থা আছে, আর অন্যদিকে আছে অস্পষ্ট অব্যক্ত এমন কিছু নিয়মশৃঙ্খলা যা কোনও অতল গভীরে তাদের ছায়াময় কাজকর্ম চালিয়ে যায় এবং তার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার মহান কলকৌশলের শক্তপোক্ত ভিত তৈরি করে। বাস্তবত, এই নিয়মশৃঙ্খলাগুলোর নিজস্ব প্রতর্ক আছে। আগেই আলোচনা করেছি এমন নানা কারণে তারা জ্ঞান(*savoir*)-য়ের ব্যবস্থাপত্র এবং উপলব্ধির বহু নতুন পরিসর তৈরি করে। এহেন জ্ঞান-উৎপাদনকারী ব্যবস্থাপত্রের জগতে তারা অসাধারণ উদ্ভাবনীশক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করে। নিয়মশৃঙ্খলাগুলো প্রতর্কের বাহক, কিন্তু সেই প্রতর্ক অধিকারের প্রতর্ক হতে পারে না। শৃঙ্খলার প্রতর্কের মধ্যে আইন, শাসন বা সার্বভৌম অভিপ্রায়ের প্রতর্কের সঙ্গে মিলে যায় এমন কিছুই নেই। নিয়মশৃঙ্খলাগুলো বরং এমন প্রতর্কের বাহক হতে পারে যা একটি নিয়মের কথা বলে, কিন্তু সেই নিয়ম সার্বভৌমত্ব থেকে উদ্ভূত কোনও বিচারবিভাগীয় নিয়ম নয়, বরং তা হল স্বভাবী নিয়ম বা স্বমিতি। যে সংহিতা তারা তৈরি করে তা কোনও আইনকানুনের সংহিতা নয়, বরং তা হল স্বাভাবিকীকরণের সংহিতা। এমন এক তত্ত্বদিগন্তের দিকে তা নির্দেশ করে যার সঙ্গে অধিকারের সৌধের কোনও আবশ্যিক মিল নেই। তাদের পরিসর নির্মিত হয় মানব বিজ্ঞান দিয়ে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রীয় জ্ঞান হল তাদের ব্যবহারশাস্ত্র।

সংক্ষেপে বললে, গত কয়েক বছর ধরে আমি যা দেখাতে চেয়েছি তা এমন কোনও ধারা নয় যে ধারায় যথাযথ বিজ্ঞানের অগ্রবর্তী স্তরে মানব আচরণের অনিশ্চয়তাপূর্ণ অদম্য বিশৃঙ্খল পরিসর অল্প অল্প করে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে: এমনটা নয় যে যথাযথ বিজ্ঞানের যুক্তিবদ্ধতার কোনও অগ্রগতির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মানব বিজ্ঞানকে গড়ে তোলা হয়েছে। আমার মনে হয় যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানব বিজ্ঞানের প্রতর্ক আসলে সম্ভবপর হয়ে উঠেছে তা হল দুটি যাত্রাপথের, দুটি কলকৌশলের,

দুটি সম্পূর্ণ অসদৃশ ধরনের প্রতর্কের সন্নিধি ও সাক্ষাৎ, যে দুটির একটি হল অধিকারের এমন পুনর্সংগঠন যা সার্বভৌমত্ব বিনিয়োগ করে এবং অপরটি হল এমন পীড়নকারী বলের গতিবিধি যার চর্চা শৃঙ্খলারক্ষাকারী রূপ ধারণ করে। আর আমার মনে হয় যে আমাদের এই সময়ে যুগপৎভাবে এই অধিকার ও এইসব কৌশলের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় এবং নিয়মশৃঙ্খলার জন্ম দেওয়া এইসব কৌশল ও প্রতর্ক অধিকারের পরিসরে ঢুকে আক্রমণ চালায় যার ফলে আইনের পদ্ধতিসমূহ নিরন্তর আরো বেশি বেশি করে স্বাভাবিকীকরণের পদ্ধতিসমূহ দ্বারা উপনিবেশীকৃত হয়। এই সবের মধ্য দিয়েই যাকে আমি বলব *স্বাভাবিকীকরণের সমাজ*, তার সামগ্রিক কার্যপদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করা যায় বলে আমার বিশ্বাস। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, আমি বলতে চাইছি যে শৃঙ্খলাদায়ী স্বাভাবিকীকরণ ক্রমশ আরও বেশি বেশি করে সার্বভৌমত্বের বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সংঘাতে আসে: তাদের পরস্পর বেমানান চরিত্র আরও তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ্য হয়ে ওঠে; কোনও না কোনও ধরনের মধ্যস্থতাকারী প্রতর্কের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ আরও বাড়তে থাকে, প্রয়োজন বাড়তে থাকে এমন এক ধরনের ক্ষমতার ও এমন এক ধরনের জ্ঞানের যাকে বিজ্ঞানের পবিত্রতা দিয়ে নিরপেক্ষ রূপে হাজির করা যাবে। এক অর্থে খোদ ঔষধ ও চিকিৎসাব্যবস্থার প্রসারণের মধ্যেই যত না সংযুক্তির প্রকাশ হয় তার চেয়ে নিয়মশৃঙ্খলার কলকৌশলের সঙ্গে অধিকারের নীতির অবিরত সাক্ষাৎ ও বিনিময় অনেক বেশি প্রকাশিত হয়। নিয়মশৃঙ্খলা ও সার্বভৌমত্বের অসদৃশ দুটি স্তরের ছেদরেখা জুড়ে ঔষধ ও চিকিৎসাব্যবস্থার সম্প্রসার এবং আচরণ-ব্যবহার-প্রতর্ক-আকাঙ্খা-ইত্যাদিকে সাধারণভাবে রোগচিকিৎসার গণ্ডিতে বেঁধে ফেলার প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে। এই কারণেই শৃঙ্খলাদায়ী কৌশলগুলো যখন এহেন জবরদখল করে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ ক্ষমতা যখন উদিত হয়, আমরা দেখি যে কেবলমাত্র সার্বভৌমত্বের সেই প্রাচীন নীতির ভিত্তিতে ব্যক্ত সার্বভৌমত্বের ধারণাকে ঘিরে গড়ে তোলা অধিকারের তত্ত্বে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও শক্তপোক্ত অবলম্বনই আমাদের কাছে অবশিষ্ট নেই। আজ যখন নিয়মশৃঙ্খলা এবং তার সঙ্গে যুক্ত ক্ষমতা ও জ্ঞানের সমস্ত প্রভাবের বিরুদ্ধে কেউ আপত্তি করতে যায়, বাস্তব জীবনে মূর্তভাবে সে ঠিক কী করে, ম্যাজিস্ট্রেটস ইউনিয়ন (১৯৬৮-র পর এই ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। নাগরিক অধিকার, আইন এবং কারাগার বিষয়ে বৈপ্লবিক নীতির

সওয়াল করা ছিল এর উদ্দেশ্য।— অনুবাদক) বা ওই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোই বা কী করে? 'বুর্জোয়া' বলে কথিত সেই বিখ্যাত পোষাকী অধিকারনিচয়, যা বাস্তবত সার্বভৌমত্বের অধিকার ছাড়া আর কিছু নয়, তার জন্য আবেদন জানানো ছাড়া আর কিছু করতে পারে কি? কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা এখানে একটা অন্ধগলির মধ্যে নিজেদের ঢুকিয়ে ফেলেছি: নিয়মশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে সার্বভৌমত্বের অবলম্বনে মাথা গুঁজে শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না, কারণ সার্বভৌমত্ব ও শৃঙ্খলাদায়ক কলকৌশল হল আমাদের সমাজের ক্ষমতার সাধারণ কলকৌশলের সম্পূর্ণরূপে অবিভাজ্য দুটি উপাদান।

ক্ষমতার কোনও শৃঙ্খলাবিরোধী রূপের অনুসন্ধান যদি কেউ করতে চায়, বা অন্যথায়, শৃঙ্খলা ও শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চায়, তবে তার জন্য সার্বভৌমত্বের প্রাচীন অধিকারের মুখাপেক্ষী হওয়া ঠিক হবে না, বরং অধিকারের এমন এক নতুন রূপের সন্ধান করতে হবে যা আবশ্যিকভাবে শৃঙ্খলাবিরোধী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একই সাথে সার্বভৌমত্বের নীতি থেকেও মুক্ত হবে। এখানেই আবার অবদমনের ধারণার কথা উঠে আসে, এ প্রসঙ্গে যার ব্যবহার দুই দিক থেকে দুর্ভাগ্যজনক বলে আমার মনে হয়। এক দিক থেকে, তার মধ্যে সার্বভৌমত্বের এক প্রকার তত্ত্বের অস্পষ্ট উল্লেখ থেকে যায়, যা হল ব্যক্তিবিশেষের সার্বভৌম অধিকারের সার্বভৌমত্ব। অপরদিকে, তার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মনঃসমীক্ষণ সংক্রান্ত এমন কিছু উল্লেখপঞ্জীর যোগ তৈরি হয়ে যায় যা মানববিজ্ঞান থেকে ধার নেওয়া এবং মানববিজ্ঞান হল শৃঙ্খলাদায়ক শাসনবৃত্তের মধ্যেই অবস্থিত প্রতর্ক ও চর্চা। অবদমনের ধারণাটিকে যত বিশ্লেষণাত্মক বা সমালোচনাত্মক ভাবেই কেউ ব্যবহার করুক না কেন, তা বিচারবিভাগীয়-শৃঙ্খলাদায়ক একটি ধারণাই থেকে যায় বলে আমার বিশ্বাস। অবদমনের ধারণার মধ্যে হাজির একদিকে সার্বভৌমত্ব ও অন্যদিকে স্বাভাবিকীকরণের প্রতি দ্বিভাঁজ বিচারবিভাগীয় ও শৃঙ্খলাদায়ক উল্লেখের ফলে এই ধারণার যে কোনও বিশ্লেষণাত্মক বা সমালোচনাত্মক প্রয়োগ সেই মাত্রাতেই শুরু থেকে দূষিত ও ব্যর্থ হয়ে যায়।

উৎস: বক্তৃতাটির লিপ্যন্তর করেন আলেসান্দ্রো ফন্তানা এবং পাসকুয়াল পাসকুইনো। কলিন গর্ডন সম্পাদিত মিশেল ফুকো-র *পাওয়ার/নলেজ* বইয়ে গ্রন্থিত ইংরেজি অনুবাদ থেকে এখানে বাংলায় ভাষান্তর করা হয়েছে।

জৈবক্ষমতা

কলেজ দি ফ্রাসঁ-য় ১৯৭৬ সালের পাঠপ্রস্তাবনার
অন্তিম ভাষণ: ১৭ই মার্চ, ১৯৭৬

তাহলে আজই অন্তিম ভাষণ, এই বছর আমি যা বলে আসছি তা এক জায়গায় নিয়ে এসে জড়ো করার চেষ্টা করাই আজকের কাজ। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বোঝার সহায়ক ঝাঁঝরি হিসেবে যুদ্ধকে দেখার সমস্যাটিকে আমি উত্থাপন করে এসেছি এখনও পর্যন্ত। আমার মনে হয়েছে যে প্রথমদিকে এবং কার্যত গোটা আঠারো শতক জুড়েই, যুদ্ধকে দেখা হত জাতিদের মধ্যে যুদ্ধ হিসেবে। সেই জাতিদের মধ্যে যুদ্ধকেই আমি আগের কিছু ভাষণে পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করেছি। আর এর আগের ভাষণে আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি কীভাবে বিপ্লবের সময়ে জাতীয় সার্বজনীনতার নীতি অবলম্বন করে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ থেকে যুদ্ধের ধারণাটিকেই অবশেষে বাতিল করা হয়েছিল। আমি এখন দেখাতে চাইব যে জাতির প্রসঙ্গ উবে যায়নি, তা বরং অত্যন্ত আলাদা কিছুর অংশ হয়ে উঠেছে। সেই অত্যন্ত আলাদা কিছুটি হল রাষ্ট্রীয় জাতিবাদ। সুতরাং আজকে আমি আপনাদের রাষ্ট্রীয় জাতিবাদ নিয়ে অল্প কিছু বলার চেষ্টা করব, বা আপনাদের সামনে রাষ্ট্রীয় জাতিবাদ সম্পর্কে অন্তত একটা ধারণা হাজির করার চেষ্টা করব।

আমার মনে হয় যে উনিশ শতকের অন্যতম মৌলিক প্রতীতি হল যাকে বলা যায় জীবনের উপর ক্ষমতার মুঠো চেপে বসা। এর মধ্য দিয়ে আমি যা বোঝাতে চাইছি তা হল: যে যে মাত্রায় মানুষ একটি জীবিত প্রাণী তার সকল দিক থেকেই মানুষের উপর ক্ষমতা অর্জন, জৈব পরিসরের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম হওয়া। যাকে বলা যায় জৈব পরিসরের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ

কায়েম, সেইদিকে গতিমুখসম্পন্ন এক নির্দিষ্ট প্রবণতা অন্তত ছিল। আর আমার মনে হয় যে কী ঘটে চলেছিল তা বুঝতে হলে সার্বভৌমত্বের ধ্রুপদী তত্ত্ব বলে যা পরিচিত ছিল তাকে ফিরে দেখা সহায়ক হবে। সার্বভৌমত্বের এই ধ্রুপদী তত্ত্বই শেষাবধি যুদ্ধ, জাতি ইত্যাদি বিষয়ে এইসব বিশ্লেষণের পটভূমিকা বা একধরনের ছবি হাজির করে। আপনারা জানেন যে সার্বভৌমত্বের ধ্রুপদী তত্ত্বে সার্বভৌমের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল মৃত্যু ও জীবনের অধিকার। এখন, জীবন ও মৃত্যুর অধিকার একটি বেশ অদ্ভূত অধিকারবিশেষ। এমনকি তাত্ত্বিক স্তরেও তা এক অদ্ভূত অধিকার। জীবন ও মৃত্যুর অধিকার থাকার অর্থ ঠিক কী ? এক অর্থে ধরলে, সার্বভৌমের জীবন ও মৃত্যুর অধিকার আছে বলার মানে হল এই যে সেই সার্বভৌম মূলগতভাবে মানুষকে মেরে ফেলতে পারে বা বেঁচে থাকতে দিতে পারে— এর যেটাই সে করুক না কেন তার মানে হল যে জীবন ও মৃত্যু এমন কোনও প্রাকৃতিক বা আশু প্রতীতি নয় যার চরিত্র আদিম বা মৌলিক এবং যা ক্ষমতার ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে না। এই তর্ককে যদি আমরা আরও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাই তবে তা এই আপাতবিরোধ বা কূটাভাসে গিয়ে পৌঁছবে যে সার্বভৌমের সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে অধীনস্থ প্রজা জীবিতও নয় আবার মৃতও নয়। জীবন ও মৃত্যুর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রজাটি উভয় নিরপেক্ষ এবং সার্বভৌমের সুবাদেই সে জীবিত থাকার অধিকার প্রাপ্ত হয় বা, সম্ভবত, মরার অধিকার পায়। যাই হোক না কেন, প্রজাদের জীবন বা মৃত্যু কেবলমাত্র সার্বভৌমের অভিপ্রায়ের ফলস্বরূপই অধিকার হয়ে ওঠে। যদি জানতে চান, তাহলে এই হল সেই তাত্ত্বিক আপাতবিরোধ বা কূটাভাস। আর অবশ্যই এহেন তাত্ত্বিক কূটাভাসের স্বাভাবিক ফল হিসেবে এক ধরনের ব্যবহারিক স্থিতিহীনতা পাওয়া যায়। জীবন ও মৃত্যুর অধিকার বলতে আসলে ঠিক কী বোঝায়? নিশ্চিতভাবেই এমনটা বোঝায় না যে সার্বভৌম যেভাবে মৃত্যু ঘটাতে পারে ঠিক সেভাবেই জীবন দিতে পারে। সর্বদাই জীবন ও মৃত্যুর অধিকার অসমভাবেই প্রযুক্ত হয়: মৃত্যুর দিকেই সবসময় পাল্লাটা ঝুঁকে থাকে। জীবনের উপর সার্বভৌম ক্ষমতার প্রভাব তখনই প্রযুক্ত হয় যখন মৃত্যু ঘটানোর পারঙ্গমতা সার্বভৌমের থাকে। আসলে জীবন ও মৃত্যুর অধিকারের সারবস্তুই হল মৃত্যু ঘটানোর অধিকার বা মারার অধিকার: যে মুহূর্তে সার্বভৌম মারতে পারে সেই মুহূর্তেই সে জীবনের উপর অধিকার প্রয়োগ করে। মূলতঃ এ হল অসির অধিকার। তাই জীবন ও মৃত্যুর

অধিকারের মধ্যে কোনও প্রকৃত প্রতিসাম্য নেই। মানুষকে মারা বা মানুষের জীবনকে স্বীকৃতি দেওয়ার অধিকার এ নয়। মানুষকে বেঁচে থাকতে দেওয়া বা তাদের মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দেওয়ার অধিকারও এ নয়। এ হল জীবন নেওয়ার বা বাঁচতে দেওয়ার অধিকার। আর স্পষ্টতই তা এক চমকপ্রদ অসামঞ্জস্য তৈরি করে।

আর আমার মনে হয় যে উনিশ শতকে রাজনৈতিক অধিকার যেসব রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে তার অন্যতম প্রধানটি হল ঠিক এইখানে যে সার্বভৌমত্বের এই পুরানো অধিকার— জীবন নেওয়ার বা বাঁচতে দেওয়ার অধিকার— এক নতুন অধিকারের দ্বারা পরিপূরিত হয়েছে। এই নতুন অধিকার পুরানো অধিকারটিকে একেবারে মুছে ফেলে প্রতিস্থাপিত করেছে এমনটা বলব না, তা পুরানো অধিকারটির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। পুরানোটির ঠিক বিপরীত এই নতুন অধিকারটি হল বাঁচতে 'বাধ্য করা' বা মরার 'অনুমতি দেওয়ার' ক্ষমতা। সার্বভৌমত্বের অধিকার ছিল জীবন নেওয়ার বা বাঁচতে দেওয়ার অধিকার। আর তারপর এই নতুন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল: বাঁচতে বাধ্য করার বা মরার অনুমতি দেওয়ার অধিকার।

এই রূপান্তরটি অবশ্যই একদিনে ঘটে যায়নি। অধিকারের তত্ত্বেই আমরা এর চিহ্ন খুঁজে পাব (কিন্তু আমি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আলোচনা সারব)। আপনারা দেখতে পাবেন যে সতেরো শতক ও বিশেষ করে আঠারো শতকের ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞরা জীবন ও মৃত্যুর অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞরা প্রশ্ন তুলেছিলেন: যখন আমরা কোনও চুক্তিতে প্রবেশ করি, সামাজিক চুক্তির সেই স্তরে একটি সার্বভৌম প্রাধিকার গঠন করার জন্য ও নিজেদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সেই সার্বভৌমের হাতে সঁপে দেওয়ার জন্য একসঙ্গে জড়ো হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা ঠিক কী করি? কোনও বিপদের আশঙ্কা বা কোনও চাহিদা দ্বারা চালিত হয়েই তা করা হয়। সুতরাং নিজেদের জীবনকে রক্ষা করার জন্যই নিশ্চয় এ কাজ করা হয়। বাঁচার অভিপ্রায় থেকেই একটি সার্বভৌমকে খাড়া করা হয়। যে মাত্রায় এ কথা সত্যি, সেই মাত্রায় জীবন কি আদৌ সার্বভৌমের অধিকারভুক্ত হতে পারে? জীবনই কি সার্বভৌমের অধিকারের ভিত্তি নয়? একজন সার্বভৌম কি আদৌ এই দাবি করতে পারে যে তার প্রজাদের উপর জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতা বা সোজাকথায় বললে প্রজাদের মারার ক্ষমতা

প্রয়োগ করার অধিকার,তার প্রজারাই তার হাতে তুলে দেবে ? জীবন কি এহেন চুক্তির বাইরে থাকা উচিত নয় যেহেতু ও যে মাত্রায় জীবনই হল এই চুক্তির প্রথম, প্রাথমিক ও ভিত্তিমূলক কারণ ? রাজনৈতিক দর্শনে এ নিয়ে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। সেই বিতর্ক যদি আমরা এখনকার জন্য সরিয়েও রাখি, তা হলেও এইটুকু অন্তত বোধগম্য হতে অসুবিধা হয়না যে কীভাবে রাজনৈতিক চিন্তা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিশ্লেষণের পরিসরে জীবনের সমস্যাটি জটিল হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক তত্ত্বের স্তরে নয়, বরং ক্ষমতার কলকৌশল, ক্ষমতার প্রয়োগকৌশল ও ক্ষমতার প্রযুক্তির স্তরে এই রূপান্তরের গতিপথকে চিহ্নিত করার চেষ্টা আমি করব। আর তা আমাদের ফিরিয়ে আনবে পরিচিত একটি প্রসঙ্গে: সতেরো ও আঠারো শতকে আমরা দেখেছি যে দেহ, ব্যক্তিবিশেষের দেহকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার প্রয়োগকৌশল উঠে এসেছিল। এই সব প্রয়োগকৌশলের মধ্যে পড়ে সেই সমস্ত ব্যবস্থাপত্র যা ব্যক্তিবিশেষদের দেহের স্থানিক বিন্যাস (তাদের পৃথক্করণ, তাদের একরেখীকরণ, তাদের ক্রমভুক্তিকরণ এবং তাদের উপর নজরদারি) এবং এই ব্যক্তিবিশেষদের ঘিরে দৃশ্যমানতার একটি গোটা ক্ষেত্র সংগঠিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। দেহগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার প্রয়োগকৌশলও ছিল সেগুলো। ব্যায়াম, শারীরিক কসরত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দেহদের উৎপাদনী শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। সবচেয়ে কম ব্যয়সাপেক্ষভাবে ব্যবহার করতে হবে এমন ক্ষমতার যুক্তিসঙ্গতকরণ ও কঠোর পরিমিতকরণের প্রয়োগকৌশলও ছিল সেসব এবং তা প্রযুক্ত হয়েছিল নজরদারি, ধাপবন্দি বিন্যাস, পরিদর্শন, হিসাবরক্ষা এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনার একটি গোটা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যাকে শ্রমের শৃঙ্খলাদায়ক প্রয়োগকৌশল বলে বর্ণনা করা যায়। সতেরো শতকের শেষে ও আঠারো শতক জুড়ে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এরপর আঠারো শতকের দ্বিতীয় অর্ধে নতুন কিছু দেখা দিল বলে আমার মনে হয়। নতুন কিছু বলতে ক্ষমতার এক নতুন প্রয়োগকৌশল যা কিন্তু শৃঙ্খলাদায়ক চরিত্রের নয়। ক্ষমতার এই নতুন প্রয়োগকৌশল পূর্ববর্তী শৃঙ্খলাদায়ক প্রয়োগকৌশলকে বাদ দিয়ে তৈরি নয়, বরং তা ওই পূর্ববর্তী প্রয়োগকৌশলের সঙ্গে আঁটসাটভাবে যুক্ত, তাকে কিছুটা মাত্রায় বদলে নিয়ে নিজের মধ্যে সন্নিহিত করে নিয়েছে, সর্বোপরি তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাকে ব্যবহার করছে, বর্তমান শৃঙ্খলাদায়ক প্রয়োগকৌশলগুলোর গভীরে

ঢুকে থেকে নিজেকে প্রয়োগ করছে। এই নতুন প্রয়োগকৌশল সোজাসাপটাভাবে শৃঙ্খলাদায়ক প্রয়োগকৌশলকে মুছে দিচ্ছে না বা প্রতিস্থাপিত করছে না কারণ আলাদা স্তরে আলাদা মাত্রা নিয়ে তা বিরাজ করছে, তার প্রয়োগ-পরিসর ভিন্ন এবং অত্যন্ত আলাদা রকমের হাতিয়ারপত্র সে ব্যবহার করছে। এ হল অশৃঙ্খল ক্ষমতা।

দেহগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলবৎ হয় শৃঙ্খলা, কিন্তু নতুন অশৃঙ্খল ক্ষমতা দেহ-রূপ-মানুষের উপর প্রযুক্ত হয়না, বরং জীবনযাপনকারী মানুষের উপর বা জীবিত-প্রাণী-রূপ-মানুষের উপর, বা শেষাবধি, বলা যায়, প্রজাতি-রূপ-মানুষের উপর প্রযুক্ত হয়। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, শৃঙ্খলা বিবিধ মানুষকে সেই মাত্রাতেই শাসন করতে চায় যে মাত্রায় তাদের বিবিধত্ব এক একটি দেহের মধ্যে দ্রবীভূত করে দেওয়া যায় বা করা হয় এবং সেই ব্যক্তিগত দেহগুলোকে নজরবন্দি রাখা যায়, প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, ব্যবহার করা যায় এবং দরকার হলে শাস্তিও দেওয়া যায়। আর এই অশৃঙ্খল ক্ষমতার যে নতুন প্রয়োগকৌশল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে তা বিবিধ মানুষের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত সেই মাত্রায় নয় যে মাত্রায় তারা তাদের ব্যক্তিগত দেহ ছাড়া আর কিছু নয়, বরং সেই মাত্রায় যে মাত্রায় তারা জন্ম, মৃত্যু, উৎপাদন, রোগ ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত সাধারণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত এক সামূহিক পিণ্ড। সুতরাং, ব্যক্তিরূপে বিভাজনকারী প্রণালীর মধ্য দিয়ে দেহের উপর ক্ষমতার দখল প্রথমবার নেওয়ার পর, দ্বিতীয় এক ক্ষমতার দখল আমরা প্রত্যক্ষ করছি যা ব্যক্তিরূপে বিভাজনকারী নয়, বরং যাকে পিণ্ডরূপে একীভূতকারী বলা যায়, যা দেহ-রূপ-মানুষকে উদ্দেশ্য করে নয়, বরং প্রজাতি-রূপ-মানুষকে উদ্দেশ্য করে বিন্যস্ত। আঠারো শতক জুড়ে মানবদেহের শরীরস্থানীয় রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ওই শতকের শেষে এসে আমরা এমন ভিন্ন কিছুর উদ্ভব হতে দেখি যাকে আর মানবদেহের শরীরস্থানীয় রাজনীতি বলা সাজে না, তাই যাকে আমি মানবপ্রজাতির 'জৈবরাজনীতি' বলব।

এই জৈবরাজনীতি, এই জৈবক্ষমতা, ক্ষমতার এই নতুন প্রয়োগকৌশল যা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে, তার মধ্যে আসলে কী আছে? খুব সংক্ষেপে আমি কিছু প্রক্রিয়ার কথা একটু আগে উল্লেখ করেছি, যেমন: জন্মের সঙ্গে মৃত্যুর অনুপাত, পুনরুৎপাদনের হার, কোনও জনগোষ্ঠীর উর্বরতার হার, ইত্যাদি। জন্মহার, মৃত্যুহার, গড় আয়ু ইত্যাদির মতো এই প্রক্রিয়াগুলো তাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এক সারি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

সমস্যার (যাদের নিয়ে এই আলোচনায় এই মুহূর্তে যাচ্ছি না) সঙ্গে যুক্তভাবে আঠারো শতকের দ্বিতীয় অর্ধে জৈবরাজনীতির কাছে জ্ঞানের প্রথম বিষয় হয়ে উঠেছে ও এই সংক্রান্ত লক্ষ্য বেঁধে দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করাই তার অভিপ্রায় হয়ে উঠেছে। এই সময়েই প্রথম জনপরিসংখ্যানবিদরা (demographer) এই প্রতীতিগুলোকে পরিসংখ্যানের মাপে মাপতে শুরু করে। জনগোষ্ঠীগুলো জন্মহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কমবেশি স্বতঃস্ফূর্ত, কমবেশি বাধ্যতামূলক যেসব কৌশল অবলম্বন করত সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে তারা। এককথায় বলা যায়, আঠারো শতকের জন্মনিয়ন্ত্রণ অভ্যাসের প্রতীতিকে চিহ্নিত করতে শুরু করে। জন্মহার সংক্রান্ত সমস্ত প্রতীতিতে হস্তক্ষেপ করার পরিকল্পনা নিয়ে শিশুজন্ম সংক্রান্ত নীতির সূচনা হতেও আমরা দেখি। এই জৈবরাজনীতি কেবলমাত্র উর্বরতা নিয়েই চিন্তিত নয়। তা ব্যাধিগ্রস্ততা নিয়েও চিন্তিত। কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ততা নিয়ে এই চিন্তা তার পূর্ববর্তী সময়ের সেই সোজাসাপটা রূপে সীমাবদ্ধ নেই যে রূপে বিখ্যাত মহামারীগুলোর স্তরে সেই মধ্যযুগের গোড়া থেকেই তা রাজনৈতিক ক্ষমতাগুলোকে বারবার ব্যতিব্যস্ত করে এসেছে (এই বিখ্যাত মহামারীগুলো ছিল বহুসংখ্যক মৃত্যু ঘটানো অস্থায়ী ধরনের বিপর্যয় যখন প্রতিটি মানুষই আশু মৃত্যুর বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আছে বলে বোধ হতো)। আঠারো শতকের শেষে এসে ব্যাধিগ্রস্ততা নিয়ে চিন্তা মহামারীকে ঘিরে ছিল না, ছিল অন্যকিছুকে ঘিরে। সেই অন্যকিছুকে মোটাদাগে মহামারীর সর্বব্যাপকতার বিপরীতার্থে ব্যাধির আঞ্চলিকতা বলা যেতে পারে, বা অন্যভাবে বললে, তা হল একটি জনসমষ্টির মধ্যে বিরাজমান ব্যাধিগুচ্ছের রূপ, চরিত্র, বিস্তৃতি, স্থায়িত্বকাল ও তীব্রতা নির্ণয়। এই ব্যাধিগুচ্ছ এমন যা নির্মূল করা খুবই কঠিন এবং যা তেমন ঘন ঘন মৃত্যু ঘটায় না বলে মহামারী রূপেও চিহ্নিত নয়, বরং তা জনসমষ্টির মধ্যে এমন স্থায়ী উপস্থিতি হিসেবে পরিগণিত — এবং সেভাবেই তাদের নিয়ে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়ে থাকে— যা জনসমষ্টির শক্তিসামর্থ্যে ক্ষয় ধরায়, শ্রমের সময়কে কমিয়ে দেয়, উদ্যম নষ্ট করে আর খরচ বাড়ায় কারণ তাদের ফলে উৎপাদন হ্রাস ঘটে এবং তাদের চিকিৎসাও ব্যয়বহুল। এক কথায় বললে, ব্যাধিগ্রস্ততা হল একটি জনসমষ্টিকে ছেয়ে রাখা একটি প্রতীতি। মহামারীতে যেমন ছিল, মৃত্যু আর তেমন কিছু নয় যা হঠাৎ ছোঁ মেরে জীবনশিকারে নেমে আসে। এখন মৃত্যু হল স্থায়ী এক

উপস্থিতি, যা জীবনের মধ্যেও চুঁইয়ে ঢুকে যায়, প্রতিনিয়ত ক্ষয় ধরাতে থাকে জীবনে, জীবনকে আরো ছোট আরো দুর্বল করতে থাকে।

এই প্রতীতিগুলো গুরুত্ব পেতে শুরু করে আঠারো শতকের শেষ থেকে এবং তার ফলে গণস্বাস্থ্যকে কেন্দ্র করে এমন এক ঔষধব্যবস্থা বিকশিত হয় যার হাত ধরে গড়ে ওঠে চিকিৎসা পরিষেবার সমন্বয় করা, ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করা ও জ্ঞানের স্বমিতিকরণ করার প্রতিষ্ঠানসমূহ। আর তা স্বাস্থ্যসচেতনতা শেখানোর জন্য ও জনসমষ্টিকে চিকিৎসাব্যবস্থাভুক্ত করার জন্য প্রচার অভিযানের রূপও ধারণ করে। পুনরুৎপাদন ও জন্মহারের সমস্যা, এমনকি মৃত্যুহারের সমস্যাও তার চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। তাছাড়াও এমন এক প্রতীতিগুচ্ছ ক্রমে হয়ে ওঠে জৈবরাজনীতির হস্তক্ষেপের বিষয় যার কিছু সার্বজনিক চরিত্রের, আবার অপর কিছু আপতিক চরিত্রের হলেও এমন যা কখনওই পুরোপুরি নির্মূল করা যায় না। তাদের সবগুলোর প্রভাব এখানেই একরকম যে তারা ব্যক্তিবিশেষদের অসমর্থ করে তোলে, নিয়মিত চলাচলের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে বা নিষ্ক্রিয় করে দেয়। উনিশ শতকের গোড়ায় (শিল্পায়নের পর্যায়ে) অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বৃদ্ধ বয়সের এই সমস্যা যার ফলে ব্যক্তিরা বয়সভারের কারণে তাদের সক্ষমতা ও সক্রিয়তার ক্ষেত্রের বাইরে ঝরে পড়ে। দুর্ঘটনা, দৌর্বল্য, ও আরো নানা অস্বাভাবিকতাও জৈবরাজনীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আর এইসব প্রতীতির মোকাবিলা করতেই জৈবরাজনীতি কেবলমাত্র দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে (দাতব্য প্রতিষ্ঠান ছিল বহু দিন আগে থেকেই) আরো সূক্ষ্ম নানা কলকৌশল নিয়ে এল। দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নির্বিচার দানধ্যান যেমন দূরপ্রসারী, তেমনই জোড়াতালিমার্কা, আর তা আবশ্যিকভাবে গির্জার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। কিন্তু জৈবরাজনীতির নিয়ে আসা অন্য সূক্ষ্ম কলকৌশলগুলো অনেক বেশি অর্থনীতির যুক্তিসঙ্গত পথে বাঁধা। বীমা, ব্যক্তিগত বা যৌথ সঞ্চয়, নিরাপত্তা বন্দোবস্ত ইত্যাদি নানা সূক্ষ্মতর ও আরো যুক্তিসঙ্গত কলকৌশলের উদ্ভব এই সময়ে আমরা দেখতে পাই।

জৈবরাজনীতির প্রধান দিকগুলোই আমি এখানে বর্ণনা করছি, বা সেইদিকগুলোই বর্ণনা করছি যা আঠারো শতকের শেষদিকে বা উনিশ শতকের প্রথমদিকে আবির্ভূত হয়েছিল। আরো বহু দিকই পরে আবির্ভূত হবে। সেইদিক থেকে, জৈবরাজনীতির শেষতম দিকটি হল মানব জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সম্পর্কের উপর নিয়ন্ত্রণ, বা, মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ

যে মাত্রায় তারা একটি প্রজাতি, যে মাত্রায় তারা জীবিত প্রাণী, এবং যে পরিবেশ বা সমাজজগতের সে বাসিন্দা তার উপর নিয়ন্ত্রণ। ভৌগোলিক, আবহাওয়াগত বা বারিমণ্ডলগত পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাবগুলোও এর মধ্যে পড়ে: উদাহরণস্বরূপ বলা যায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে সামনে আসা জলাভূমি ও জলাভূমির অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত মহামারীর সমস্যার কথা। তাছাড়াও আছে সেই পরিবেশের সমস্যার কথা যে মাত্রায় তা প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়, বরং তা কোনও জনসমষ্টি দ্বারা সৃষ্ট এবং সেই সুবাদেই ওই জনসমষ্টির উপর প্রভাববিস্তারকারী। মূলগতভাবে একে বলা যায় পৌরসমস্যা।

আমি কেবলমাত্র জৈবরাজনীতির শুরুর বিন্দুগুলোকেই চিহ্নিত করছি, তার কিছু প্রয়োগক্ষেত্রকে দেখাতে চাইছি, আর তার প্রথমতম হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র, জ্ঞান ও ক্ষমতার ক্ষেত্রগুলোকে দেখাতে চাইছি: জন্মহার, মৃত্যুহার, বিবিধ জৈবিক অসামর্থ্য এবং পরিবেশের প্রভাবের সাপেক্ষেই জৈবরাজনীতি তার জ্ঞানের রূপ লাভ করেছে এবং তার ক্ষমতার হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছে।

এই সবের মধ্যে কয়েকটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়। তাদের মধ্যে প্রথমটি হল: এমন একটি নতুন উপাদানের— একটি নতুন বৈশিষ্ট্য-ই প্রায় বলে ফেলছিলাম— আবির্ভাব যার সম্পর্কে অধিকারের তত্ত্বের ও শৃঙ্খলাদায়ক প্রয়োগচর্চার কোনও ধারণাই ছিল না। অধিকারের তত্ত্ব মূলগতভাবে কেবল ব্যক্তিবিশেষ ও সমাজের কথা জানত: একদিকে ছিল চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবিশেষ ও অন্যদিকে ব্যক্তিদের মধ্যে স্বেচ্ছামূলক বা অপ্রকাশ্য চুক্তির দ্বারা গঠিত সমাজদেহ। শৃঙ্খলা তার দিক থেকে ব্যক্তিবর্গ ও তাদের দেহর উপর কাজ করত প্রায়োগিক স্তরে। কিন্তু ক্ষমতার এই নতুন প্রয়োগকৌশলে আমরা যার মুখোমুখি হচ্ছি তা ঠিক সমাজ নয় (অন্তত ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞদের দ্বারা বর্ণিত সমাজদেহ নয়), দেহ-রূপ-ব্যক্তিবিশেষও নয়। তা হল একটি নতুন দেহ, একটি বহুত্বময় দেহ, এমন এক দেহ যার এতগুলো মাথা যে তা অনন্তসংখ্যক না হলেও অগণিত তো বটেই। জৈবরাজনীতি জনসমষ্টি নিয়ে কাজ করে, জনসমষ্টিকে একটি রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে নিয়ে কাজ করে, এমন এক সমস্যা যা একইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক সমস্যা, জৈবিক সমস্যা ও ক্ষমতার সমস্যা। আর আমার মনে হয় এই-ই হল জৈবরাজনীতির আবির্ভাবের ক্ষণ।

স্বয়ং 'জনসমষ্টি' উপাদানটির আবির্ভাব ছাড়াও অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিবেচনাধীন প্রতীতিগুলোর চরিত্র। আপনারা দেখবেন যে সেগুলো এমন সমষ্টিগত প্রতীতি যারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবসম্পন্ন এবং যারা একমাত্র সমষ্টির স্তরেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। যদি তাদের বিচ্ছিন্ন করে আলাদাভাবে ধরা হয়, মনে হতে পারে যে তারা আকস্মিক ও পূর্বানুমান-অযোগ্য, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে ধরলে তারা এমন ধারাবাহিকতা দেখায় যা সহজেই, বা, অন্তত চেষ্টা করলে, চিহ্নিত করা যায়। আর, শেষত, তারা এমন পর্যায়ক্রমিক প্রতীতি যাদের একটা সময়পর্যায় জুড়ে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। জৈবরাজনীতির প্রতীতিগুলো মূলগতভাবে এমন আকস্মিক ঘটনা যা একটি জনসমষ্টির মধ্যে একটি সময়পর্যায় জুড়ে ঘটে থাকে।

এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই— এবং এটাই আমার মতে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়— ক্ষমতার এই প্রয়োগকৌশল, এই জৈবরাজনীতি এমন কিছু কলকৌশল চালু করে যেগুলোর কাজকর্মের ধরন শৃঙ্খলাদায়ক কলকৌশলের কাজের ধরনের থেকে খুবই আলাদা। জৈবরাজনীতির নিয়ে আসা কলকৌশলগুলোর মধ্যে পড়ে পূর্বাভাস, পরিসাংখ্যিক প্রাক্‌কলন এবং সর্বাত্মক ব্যবস্থাপত্র। আর তাদের উদ্দেশ্য কোনও প্রদত্ত প্রতীতিতে সেভাবে কিছুটা বদল ঘটানো নয় বা কোনও ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ হিসেবেই কোনও বদল আনা নয়, বরং মূলগতভাবে তাদের উদ্দেশ্য হল সাধারণিকরণের যে স্তরে এই সাধারণ প্রতীতিগুলো নির্ণিত হয় সেই স্তরে গিয়ে হস্তক্ষেপ করা, প্রতীতিগুলোর সাধারণত্বের স্তরে হস্তক্ষেপ করা। মৃত্যুহারে বদল ঘটাতে হবে বা কমাতে হবে, গড় আয়ু বাড়াতে হবে, জন্মহারে ইন্ধন যোগাতে হবে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, নিয়ন্ত্রণের কলকৌশল প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে সুস্থিতি কায়েম করা যায়, একটা গড়মানকে ধরে রাখা যায়, পরস্পর-নির্ভরশীল বস্তুদের মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য ধরে রাখা যায়, আর এই সাধারণ জনসমষ্টির মধ্যে বিদ্যমান পরিবর্তনগুলোর প্রভাবকে পুষিয়ে দিয়ে আকস্মিকতাকে নাকচ করা যায়। এককথায়, জীবিত প্রাণীদের জনসমষ্টির মধ্যে নিহিত অক্রম বা আকস্মিক উপাদানের চারদিকে রক্ষণকৌশলের কড়া বেষ্টনী তুলে রেখে জীবনের একটি প্রদত্ত অবস্থার স্থিতির জন্য সর্বাপেক্ষা অনুকূলাবস্থা তৈরি করতে হবে। শৃঙ্খলাদায়ক কলকৌশলের মতো এই কলকৌশলগুলোও বল

নিষ্কাশন করে যতটা সম্ভব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হলেও এদের কাজ করার ধরন অত্যন্ত আলাদা। শৃঙ্খলা স্বয়ং দেহের স্তরে সক্রিয় হয়ে ব্যক্তিবিশেষকে প্রশিক্ষণ দেয়, কিন্তু এই কলাকৌশলগুলো তা করেনা। শৃঙ্খলা যেমন ব্যক্তিদেহ নিয়ে প্রশ্ন তোলে, এই কলাকৌশলগুলোর ক্ষেত্রে তেমন কোনও প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং, ব্যক্তিবিশেষকে ব্যক্তিগত স্তরে গণ্য করার বিষয় এ নয়, বরং, তার বিপরীতে, এ হল সর্বাত্মক কলকৌশলকে ব্যবহার করে এমন ভাবে কাজ করার বিষয় যাতে সর্বাত্মক সুস্থিতি ও নিয়মানুবর্তিতার অবস্থা অর্জন করা যায়। এক কথায়, এ হল জীবন ও প্রজাতি-রূপ-মানুষের জৈবিক প্রক্রিয়াসমূহের উপর এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার বিষয় যাতে তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়, বরং সাধারণ নিয়মোচিত হয়ে ওঠাকে নিশ্চিত করা যায়।

সার্বভৌমত্বের সেই নাটকীয় ছায়াচ্ছন্ন পরম ক্ষমতা জীবন নেওয়ার অর্থাৎ মারার ক্ষমতা দিয়ে গড়া হয়েছিল। তার নিচে আজ আবির্ভূত হয়েছে এই জৈবক্ষমতার প্রয়োগকৌশল যা জনসমষ্টির উপর সামূহিকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, জীবিত প্রাণী হিসেবে মানুষের সমস্ত দিকের উপর যা প্রভাব বিস্তার করেছে। জৈবক্ষমতার এই প্রয়োগকৌশল ছেদহীন, বৈজ্ঞানিক এবং তা হল একভাবে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা। সার্বভৌমত্ব মেরে ফেলত অথবা বেঁচে থাকতে দিত। আর বিপরীতপক্ষে এখন এমন এক আবির্ভাব ঘটেছে, যাকে আমি সাধারণ নিয়মোচিতকরণের ক্ষমতা বলব, যা বাঁচিয়ে রাখা বা মরে যেতে দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে তৈরি।

আমার মনে হয় যে এই ক্ষমতার একটি মূর্ত অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই মৃত্যুর সেই বহু-আলোচিত ক্রমিক অবগুণিতকরণের মধ্য দিয়ে যা নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদরা প্রায়শই আলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণাসন্দর্ভের কল্যাণে সকলেই জানেন যে আঠারো শতকের শেষদিক থেকে মৃত্যুকে ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে বা অন্তত ক্রমম্রিয়মান হতে শুরু করে এবং সে প্রক্রিয়া আজও জারি আছে। তা এই মাত্রায় ঘটেছে যে একসময় যে মৃত্যু এমন এক নজরকাড়া আচার-অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল যেখানে ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, কার্যত গোটা সমাজই অংশ নিত, তা এখন বিপরীতে লুকিয়ে রাখার মতো এক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তা সবচেয়ে গোপনীয় ও সবচেয়ে লজ্জাকর বিষয় হয়ে উঠেছে (আর শেষাবধি এখন মৃত্যু যৌনতার চেয়েও বেশি

নিষেধারোপিত আড়ালের বিষয় হয়ে উঠেছে)। আমার মনে হয় যে মৃত্যু লুকিয়ে রাখার বিষয়ে পরিণত হয়েছে এই কারণে নয় যে কোনও এক ভাবে উদ্বেগ তার জায়গা হারিয়েছে বা অবদমনমূলক কলকৌশলগুলো কিছুটা বদলে গেছে। একদা (আঠারো শতকের শেষ অবধি) মৃত্যু এত নজরকাড়া ও এত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-পূর্ণ হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে তা ছিল এক ক্ষমতা থেকে আরেক ক্ষমতার মধ্যে উৎক্রমণের অভিব্যক্তি। মৃত্যুই ছিল সেই মুহূর্ত যখন আমরা ইহজগতের সার্বভৌমের ক্ষমতার অধীন থেকে পরজগতের সার্বভৌমের ক্ষমতার অধীনে উৎক্রান্ত হতাম। বিধির এক দরবার থেকে আরেক দরবারে পাড়ি দিতাম— জীবন-মরণের উপর দেওয়ানী বা বারোয়ারি অধিকার থেকে হয় অনন্ত জীবন নয়তো অনন্ত নরকভোগের অধিকারে পৌঁছতাম। এক ক্ষমতা থেকে আরেক ক্ষমতায় উৎক্রমণ ঘটত এভাবে। মৃত্যু মানে মৃত্যুপথযাত্রীর ক্ষমতার হাতবদলও বোঝাত বটে, সেই ক্ষমতা তার বেঁচে-থাকা পরিজনদের মধ্যে শেষ উক্তি, শেষ সুপারিশ, শেষ ইচ্ছাপত্র ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হতো। ক্ষমতার এই সমস্ত প্রতীতিগুলোকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের রূপ দেওয়া হয়েছিল।

এখন ক্ষমতা বলতে প্রাণ নেওয়ার অধিকারের ক্ষমতা যত কম বোঝাচ্ছে ও একইসঙ্গে একভাবে বাঁচতে বাধ্য করার জন্য হস্তক্ষেপের অধিকার হিসেবে যত বেশি দেখা দিচ্ছে, বা, এই স্তরে ক্ষমতা যতই জীবন থেকে দুর্ঘটনা, অক্রম বা আকস্মিক উপাদান এবং দোষত্রুটিকে নির্মূল করে উন্নতিসাধন করার জন্য হস্তক্ষেপ করছে, ততই মৃত্যু— যেমতাবধি তা জীবনের অন্ত — ক্ষমতারও অন্ত বা সীমা হয়ে উঠছে। মৃত্যু ক্ষমতাসম্পর্কের বাইরে। মৃত্যু ক্ষমতার নাগালের বাইরে। ক্ষমতা মৃত্যুকে কেবলমাত্র সাধারণ, সর্বাত্মক, পরিসংখ্যানগত রাশির মধ্য দিয়ে ধরতে পারে। মৃত্যুর উপর ক্ষমতার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু তা নশ্বরতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর সেই জন্যই এটা অতি স্বাভাবিক যে মৃত্যুকে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয় করে তোলা হবে এবং মৃত্যু সবচেয়ে গোপনীয় বিষয় হয়ে উঠবে। সার্বভৌমত্বের অধিকারের ক্ষেত্রে মৃত্যু ছিল সার্বভৌমের পরম ক্ষমতার সবচেয়ে স্পষ্ট ও সবচেয়ে নজরকাড়া অভিব্যক্তি; পক্ষান্তরে এখন মৃত্যু হয়ে উঠেছে সেই মুহূর্ত যখন সব ক্ষমতার নাগালের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কোনও ব্যক্তি নিজের মধ্যেই পতিত হয় বা, বলা যায়, নিজস্ব গোপনীয়তার বৃত্তে

ফিরে আসে। ক্ষমতা আর মৃত্যুকে কোনও স্বীকৃতি দেয় না। আক্ষরিক অর্থেই ক্ষমতা মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে চলে।

এসবের প্রতীক হিসেবে আমরা স্পেনের একনায়ক ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর কথা ধরতে পারি যাকে সব বিচারেই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একটি ঘটনা বলা যায়। তা চিত্তাকর্ষক তার প্রতীকী তাৎপর্যের জন্য, কারণ যে ব্যক্তিটি মরেছে, আপনারা সবাই জানেন যে সে ছিল সবচেয়ে রক্তপিপাসু এক একনায়ক, জীবন-মৃত্যুর সার্বভৌম ক্ষমতা সে অতি বর্বরতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছিল, চল্লিশ বছর ধরে জীবন-মৃত্যুর পরম অধিকারের নির্মম আস্ফালন করেছিল, আর তার নিজের মৃত্যুর মুহূর্তে, সে প্রবেশ করল জীবনের উপর এই নতুন ক্ষমতার এমন এক প্রভাবক্ষেত্রে যা কেবল জীবনের ব্যবস্থাপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে বরং মৃত্যুর পরও ব্যক্তিবিশেষকে জীবিত করে রাখতে চায়। আর কেবলমাত্র বিজ্ঞানের পরাক্রমে নয়, আঠারো শতকে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক জৈবক্ষমতার প্রয়োগবলেও বলীয়ান এহেন ক্ষমতার কল্যাণে আমরা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে এত দক্ষ হয়ে উঠেছি যে জৈবিক বিচারে দীর্ঘদিন মৃত একটি মানুষকেও বাঁচিয়ে রাখতে আমরা সফল হচ্ছি। অতএব লাখ লাখ মানুষের উপর জীবন-মরণের পরম অধিকার ফলানো মানুষটিকেও সেই ক্ষমতার প্রভাবাধীনে পড়তে হল যে ক্ষমতা এতই ভালোভাবে জীবনের ব্যবস্থাপনা করে যে মৃত্যুকে থোরাই তোয়াক্কা করে। সেই মানুষটি বুঝতেও পরল না যে তার মরণ ঘটেছে এবং মরণের পরেও তাকে জীবিত করে রাখা হয়েছে। আমার মনে হয় যে এই তুচ্ছ কিন্তু আহ্লাদজনক ঘটনাটি ক্ষমতার দুই ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে সংঘাতের প্রতীক হয়ে ওঠে: একদিকে মৃত্যুর উপর সার্বভৌমত্ব ও অন্যদিকে জীবনের সাধারণ নিয়মোচিতকরণ।

এখন আমি ফিরে যাব কিছু পূর্বে উল্লিখিত একটি প্রসঙ্গে, অর্থাৎ, জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োগকৌশলের সঙ্গে দেহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার প্রয়োগকৌশলের প্রতিতুলনার প্রসঙ্গে। আঠারো শতক থেকে (বা অন্তত আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে) আমরা তাহলে ক্ষমতার দুটো প্রয়োগকৌশলকে দেখতে পাই যেদুটো ভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও একে অপরের উপর অধ্যারোপিত হয়ে থেকেছে। এদের মধ্যে একটি হল শৃঙ্খলাদায়ক প্রয়োগকৌশল যা দেহকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিবিশেষরূপে বিভাজনকারী প্রভাব তৈরি করে এবং একইসঙ্গে দরকারী ও বাধ্য করে তোলা যেতে পারে এমন বলসমূহের উৎস হিসেবে দেহকে চালনা করে।

আর দ্বিতীয়টি হল সেই প্রয়োগকৌশল যা দেহের উপর কেন্দ্রীভূত না হয়ে বরং জীবনের উপর কেন্দ্রীভূত: এমন এক প্রয়োগকৌশল যা জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্যসূচক গণপ্রভাবগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে, একটি প্রাণময় সমষ্টির মধ্যে ঘটমান অক্রম বা আকস্মিক ঘটনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে, অক্রম ঘটনাগুলোর সম্ভাব্যতা পূর্বাভাস করার চেষ্টা করে (তার জন্য দরকার হলে ঘটনাগুলোর উপর প্রভাব খাটিয়ে বদল ঘটাতেও চায়), বা অন্ততপক্ষে আকস্মিকতার প্রভাবকে পুষিয়ে দিয়ে নাকচ করতে চায়। এ হল এমন এক প্রয়োগকৌশল যা এক ধরনের স্থিতাবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় ব্যক্তিবিশেষদের কোনও প্রশিক্ষণ দেওয়ার মধ্য দিয়ে নয়, বরং এমন এক সর্বাত্মক ভারসাম্য অর্জনের মধ্য দিয়ে যা আভ্যন্তরীণ বিপদ থেকে সমগ্রের রক্ষাকবচ হয়ে উঠবে। সুতরাং এই দুটি প্রয়োগকৌশলের প্রথমটিকে বলা যেতে পারে নিয়মিত অনুশীলনের প্রয়োগকৌশল, যার বিপরীতে এবং যার থেকে আলাদা দ্বিতীয়টিকে বলা যায় নিরাপত্তার প্রয়োগকৌশল। প্রথমটি হল শৃঙ্খলাদায়ক প্রয়োগকৌশল, আর তার থেকে ভিন্ন দ্বিতীয়টি হল আশ্বাসদায়ক বা নিয়ামক প্রয়োগকৌশল। উভয় প্রয়োগকৌশলই স্পষ্টত দেহ সংক্রান্ত প্রয়োগকৌশল, কিন্তু একটিতে সামর্থ্য-সমন্বিত যান্ত্রিক গঠন হিসেবে দেহের স্বতন্ত্রীকরণ করা হয়, আর অন্যটিতে সাধারণ জৈবিক প্রক্রিয়াসমূহ দিয়ে দেহগুলোকে প্রতিস্থাপিত করা হয়।

বলা যায় যে সার্বভৌমত্বকে তার প্রকার বা সাংগঠনিক নকশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল যে ক্ষমতা তা জনসংখ্যা-বিস্ফোরণ ও শিল্পায়ন এই উভয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রারত সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দেহ পরিচালনা করতে অক্ষম হয়ে পড়ল। এতটাই অক্ষম হয়ে পড়ল যে অতিরিক্ত মাত্রায় বহু কিছু সার্বভৌমত্বের ক্ষমতার পুরানো কলকৌশলের নাগাল এড়িয়ে যেতে লাগল। তা ঘটতে লাগল উপরে যেমন, তেমন নিচেও; পুঙ্খানুপুঙ্খতার স্তরে যেমন, তেমন গণস্তরেও। প্রথমে পুঙ্খানুপুঙ্খতার স্তরে সমস্যা মেটানোর উপযোগী বদল ঘটানো হল। শৃঙ্খলার অর্থ ছিল নজরদারি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতার কলকৌশলকে ব্যক্তিদেহের উপযোগী করে তোলা। তা তুলনায় সহজতর ও বেশি সুবিধার ছিল। সেইজন্যই তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলও প্রথমে। সতেরো শতক থাকতে থাকতেই বা আঠারো শতকের গোড়াতেই আঞ্চলিক স্তরে স্বজ্ঞাত, প্রায়োগিক ও খণ্ডিত রূপে এবং স্কুল, হাসপাতাল, ব্যারাক, কর্মশালা ইত্যাদি ধরনের প্রতিষ্ঠানের

সীমাবদ্ধ কাঠামোয় তার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এরপর আঠারো শতকের শেষে এসে দ্বিতীয় দফার উপযোগীকরণের উদ্যোগ দেখা গেল যখন ক্ষমতার কলকৌশলকে জনসমষ্টির প্রতীতির উপযোগী বা মানবসমষ্টির বৈশিষ্ট্যসূচক জৈবিক বা জৈবসামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের উপযোগী করে তোলা হল। স্পষ্টতই এই দ্বিতীয় দফার উপযোগীকরণ ছিল অনেক বেশি কঠিন যেহেতু সহযোজন ও কেন্দ্রীকরণের জটিল ব্যবস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা সম্পন্ন হয়েছিল।

সুতরাং আমরা দুটি প্যারম্পর্যধারা পাই: একটি হল দেহ–যান্ত্রিক গঠন–শৃঙ্খলা–প্রতিষ্ঠানসমূহ পারম্পর্যধারা ও অন্যটি হল জনসমষ্টি–জৈবপ্রক্রিয়াসমূহ–নিয়ামক কলকৌশলসমূহ–রাষ্ট্র পারম্পর্যধারা। প্রথমটির সঙ্গে সংযুক্ত হল যান্ত্রিক গঠনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রশৃঙ্খলা। অন্যপক্ষে, দ্বিতীয়টির সঙ্গে সংযুক্ত হল একটি জৈবিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামো বা রাষ্ট্রের দ্বারা জৈবিক নিয়ামকের ভূমিকা পালন করা। আমি এখানে রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি খাড়াখাড়ি বিভাজন হাজির করতে চাইছি না কারণ কার্যত সবসময়ই শৃঙ্খলা তাকে বেষ্টন করে রাখতে চাওয়া প্রাতিষ্ঠানিক বা আঞ্চলিক কাঠামোকে ছাপিয়ে যেতে চায়। তাছাড়াও, তারা সহজেই রাষ্ট্রিক মাত্রা ধারণ করে পুলিশের মতো এমন নানা ব্যবস্থাপত্রে যা একইসঙ্গে শৃঙ্খলাদায়ক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলে ধরা যেতে পারে। (এর থেকে প্রমাণ হয় যে শৃঙ্খলা সর্বদা প্রাতিষ্ঠানিক নাও হতে পারে।) একইরকমভাবে, উনিশ শতক জুড়ে দ্রুত বংশবিস্তার করা গুরুত্বপূর্ণ সর্বাত্মক নিয়মিতকরণগুলো অতি স্পষ্টতই রাষ্ট্রীয় স্তরে পাওয়া গেলেও, রাষ্ট্রের নিচের স্তরেও তারা অমিল নয়— চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, কল্যাণ তহবিল, বীমা ইত্যাদির মতো রাষ্ট্রীয় স্তরের নিচের স্তরে থাকা একসারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও তাদের পাওয়া যায়। এই ব্যাপারটি প্রথমত সবাইকে খেয়াল করতে বলব।

অধিকন্তু খেয়াল করতে বলব যে এই দুই গোছের কলাকৌশল— একটি শৃঙ্খলাদায়ক ও অন্যটি নিয়ামক— একই স্তরে বিরাজ করে না। যার মানে অবশ্যই এই যে তারা পরস্পর-বহির্ভূত নয় এবং একে অপরের সঙ্গে একযোগে প্রযুক্ত হতে পারে। একটা-দুটো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথম উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক নগরের উদাহরণ, বা, আরও নির্দিষ্ট করে বললে, উনিশ শতকে যে যৌক্তিকভাবে পরিকল্পিত আদর্শ নগরী, কৃত্রিম

নগরী, কল্পিত বাস্তবতাকে রূপ দেওয়ার নগরী কেবলমাত্র কল্পনার স্তরেই না রেখে কার্যত বাস্তবে গড়ে তোলা হয়েছিল। উনিশ শতকের শ্রমিকশ্রেণির আবাসন নগরীগুলো কী ছিল ? সহজেই দেখা যায় যে আবাসন নগরীগুলোর খোপকাটা ঝাঁঝরির মতো নকশা ও লম্বকোণে বিন্যস্ত এক ধরনের বিন্যাস একেকটি বাড়িতে একেকটি পরিবারের ও একেকটি ঘরে একেকটি ব্যক্তির স্থানসীমা নিরূপণ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে দেহ বা দেহসমষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাওয়া শৃঙ্খলাদায়ক কলকৌশলের প্রকাশ ঘটায়। ব্যক্তিবিশেষদের সদাদৃশ্যমান করে রাখা বিন্যাস এবংব্যক্তি-আচরণের নিয়মানুগকরণ বোঝায় যে আবাসন নগরীর স্থানিক বিন্যাসের মধ্য দিয়েই এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত নজরদারি বা নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণির আবাসন নগরীর মধ্যে এক সারি শৃঙ্খলাদায়ক কলকৌশলের উপস্থিতি সহজেই চিহ্নিত করা যায়। আর তার উপর থাকে আর এক সারি কলকৌশল যাকে পূর্বোক্ত কলকৌশলের বিপরীতে নিয়ামক কলকৌশল বলা যায়। এই নিয়ামক কলকৌশলগুলো জনসমষ্টির উপর সমষ্টিগতভাবে প্রযুক্ত হয়। আবাসন সংক্রান্ত সঞ্চয়, ভাড়া দেওয়া-নেওয়া ও ক্ষেত্রবিশেষে আবাসন বেচা-কেনা সংক্রান্ত ছাঁচ তারা গড়ে তোলে। স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা, বৃদ্ধ বয়সের অবসরভাতা, জনসমষ্টির গড় আয়ু সর্বোচ্চ কাম্য মানে নিয়ে যাওয়ার জন্য গণস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা, যৌনতার উপর ও তৎসূত্রেই সন্তানোৎপাদনের উপর নিয়মানুগকরণের যে চাপ নগরী-সংগঠন কায়েম করে, শিশুর যত্ন, শিক্ষা, ইত্যাদি— এসবের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই কিছু শৃঙ্খলাদায়ক ও কিছু নিয়ামক কলকৌশল।

এবার যৌনতার মতো বেশ আলাদা— যদিও সম্পূর্ণত আলাদা এমন নয়— অক্ষটির দিকে নজর দেওয়া যাক। উনিশ শতকে যৌনতার অত্যাবশ্যক গুরুত্বপূর্ণ এক কৌশলক্ষেত্র হয়ে ওঠার মূলগত কারণ কী ? আমার মনে হয় যে এক গুচ্ছ কারণে যৌনতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, যার মধ্যে বিশেষ করে কিছু কারণ আমি আলোচনা করব। এক দিক থেকে দেখলে, যৌনতা যেহেতু এমন এক ধরনের আচরণ যার সঙ্গে দেহ গুরুত্বপূর্ণভাবে জড়িত, সেহেতু তা স্থায়ী নজরদারির অধীন হয়ে ব্যক্তিবিশেষরূপে বিভাজনকারী শৃঙ্খলাদায়ক নিয়ন্ত্রণের বিষয় হয়ে ওঠে (আর আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতক অবধি হস্তমৈথুনকারী শিশু-কিশোরদের উপর বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে যে অতিপরিচিত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা

লাগু করা হয়েছিল তা যৌনতার উপর এই ধরনের শৃঙ্খলাদায়ক নিয়ন্ত্রণেরই উদাহরণ)। কিন্তু অন্যদিকে আবার যৌনতার যেহেতু সন্তানোৎপাদনকারী ভূমিকাও আছে, তাই তা কেবল ব্যক্তিবিশেষদের দেহ সংক্রান্ত বিষয় হয়ে না থেকে জনসমষ্টির বহুত্বের ঐক্য সংক্রান্ত বিস্তৃত জৈবিক প্রক্রিয়ার মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। দেহ ও জনসমষ্টির ছেদবিন্দুতে যৌনতার অবস্থান। আর সেইজন্যই তা যেমন শৃঙ্খলার বিষয়, তেমনই নিয়মোচিতকরণেরও বিষয় হয়ে ওঠে।

ব্যক্তি ও জনসমষ্টির মাঝ বরাবর, দেহ ও সাধারণ প্রতীতির মাঝ বরাবর এই বিশেষ অবস্থানে স্থিত হওয়ার কারণেই উনিশ শতকে যৌনতার উপর এত চূড়ান্ত রকমের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এর হাত ধরেই চিকিৎসাবিদ্যায় এই ধারণা তৈরি হয়েছিল যে শৃঙ্খলাহীন নিয়মহীন যৌনতার ফল দুটি স্তরে দেখা দেয়। একটি হল দেহের স্তরে— শৃঙ্খলাহীন দেহের উপর অচিরেই বিবিধ রোগের খাঁড়া নেমে আসে যা যৌন লম্পটের নিজ কৃতকর্মের ফল। যে শিশু বা কিশোর যথেচ্ছ হস্তমৈথুন করে জীবনভর তাকে অসমর্থ হয়ে কাটাতে হবে: দেহের স্তরে শৃঙ্খলাদায়ক নিষেধাজ্ঞার এও এক নমুনাবিশেষ। কিন্তু এরই সঙ্গে যুগপৎভাবে জনসমষ্টির স্তরেও লম্পট বিকৃত যৌনতার প্রভাব দেখা হয় যেহেতু যৌন লাম্পট্য বংশগতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে ধরা হয়। যৌন লম্পটের বংশজরাও সাত প্রজন্ম অবধি লাম্পট্যধারা বহন করবে, তার পরের সাত প্রজন্মেও তা প্রবাহিত হবে, পরের পরের সাত প্রজন্মেও... ইত্যাদি। এ হল অধঃপতনের তত্ত্ব। এভাবে যদি ধরে নেওয়া হয় যে শৃঙ্খলাহীন যৌনতা হল একইসঙ্গে ব্যক্তিগত রোগের উৎস ও বংশগত অধঃপতনের উৎপত্তিকেন্দ্র, তাহলে যৌনতাই হয়ে ওঠে সেই অতি নির্দিষ্ট বিন্দু যেখানে শৃঙ্খলাদায়ক ও নিয়ামক, দেহ ও জনসমষ্টি একইসঙ্গে প্রতিভাত হয়। এমতাবস্থায় বুঝতে অসুবিধা হয় না কীভাবে ও কেন চিকিৎসাবিদ্যার মতো একটি কৌশলগত জ্ঞান, বা বলা ভালো চিকিৎসাবিদ্যা ও স্বাস্থ্যবিদ্যার একটি সম্মিলন উনিশ শতকে এসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যদি বা নাও হয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হয়ে উঠল। জৈব ও শরীরযন্ত্রীয় উভয় ধরনের প্রক্রিয়াসমূহের (বা অন্যভাবে বললে, জনসমষ্টি ও দেহ উভয়ের) মধ্যে যোগস্থাপন করা ও একই সঙ্গে নির্দিষ্ট ক্ষমতাপ্রভাবসম্পন্ন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রয়োগকৌশল হয়ে ওঠার মধ্য দিয়েই যে তা হল তাও বোঝা যায়। চিকিৎসাবিদ্যা হয়ে উঠল

এমন এক ক্ষমতা-জ্ঞান যা দেহ ও জনসমষ্টি, ব্যক্তি ও জৈব প্রক্রিয়া উভয়ের উপর প্রয়োগ করা যায় এবং সেই সুবাদেই শৃঙ্খলাদায়ক ও নিয়ামক উভয় ধরনের প্রভাবই তার আছে।

আরও সাধারণিকরণ করলে বলা যায় যে শৃঙ্খলাদায়ক ও নিয়ামক— এই দুই ধরনের প্রয়োগকৌশলের মধ্যে আবর্তিত হয় এমন একটি উপাদান যা দেহ ও জনসমষ্টি উভয়ের উপরই সমভাবে প্রযুক্ত হয় এবং যা দেহের শৃঙ্খলাদায়ক নিয়ম ও জৈব বহুত্বে ঘটমান অক্রম ঘটনাবলী উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর করে তোলে। দুইয়ের মধ্যে আবর্তনকারী এই উপাদানটি হল স্বমিতি। স্বমিতি হল এমন যা শৃঙ্খলাপরায়ন করার উদ্দেশ্যে একটি দেহের উপর প্রয়োগ করা যায়, আবার একটা জনসমষ্টির উপর নিয়মোচিতকরণের উদ্দেশ্যেও প্রয়োগ করা যায়। সুতরাং এমতাবস্থায় নিয়মোচিতকরণকারী সমাজ নেহাতই এমন এক সাধারণিকৃত শৃঙ্খলারোপকারী সমাজ নয় যার শৃঙ্খলাদায়ক প্রতিষ্ঠানগুলো ঝাঁক বেঁধে শেষাবধি সবকিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। এভাবে দেখলে তা নিয়মোচিতকরণকারী সমাজকে অত্যন্ত প্রাথমিক ও অপর্যাপ্ত ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। নিয়মোচিতকরণকারী সমাজ হল এমন এক সমাজ যেখানে শৃঙ্খলার স্বমিতি ও নিয়মোচিতকরণের স্বমিতি লম্ববিন্যস্ত গ্রন্থি বরাবর পরস্পরকে ছেদ করে। উনিশ শতকে ক্ষমতা জীবনের দখল নিয়ে নিয়েছে, বা, উনিশ শতকে ক্ষমতা জীবনকে তার দেখভালের অধীনে অন্তত নিয়ে নিয়েছে— এ কথা বলার মানে হল এই যে একদিকে শৃঙ্খলার প্রয়োগকৌশল ও অন্যদিকে নিয়মোচিতকরণের প্রয়োগকৌশলের কার্যকারিতার কল্যাণে ক্ষমতা যান্ত্রিক থেকে জৈবিক অবধি, দেহ থেকে জনসমষ্টি অবধি বিস্তৃত গোটা পৃষ্ঠদেশকে ঢেকে ফেলতে সফল হয়েছে।

আমরা তাই এমন এক ক্ষমতার মধ্যে আছি যা দেহ ও জীবন উভয়ের উপরই নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে, বা বলা যেতে পারে, যা দেহ ও জনসমষ্টিকে দুটি মেরুতে স্থাপন করে সাধারণভাবে জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। এই জৈবক্ষমতার চর্চা তার চূড়ান্ত সীমাবিন্দুগুলোতে যে কূটাভাসের জন্ম দেয় তাও আমরা অবিলম্বে চিহ্নিত করতে পারি। একদিকে পরমাণু শক্তির দিকে তাকালে এই কূটাভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে । যে কোনও সার্বভৌমের হাতে লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষকে মারার যে অধিকার গচ্ছিত হয় (যা খুব নতুন নয়, বরং পরম্পরাগত বলা যেতে পারে), এ কেবল সেই হত্যা

করার ক্ষমতা নয়। সমসাময়িক রাজনৈতিক ক্ষমতার কাজের ধরনধারণই এমন যে পরমাণু ক্ষমতা নামক কূটাভাসটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যদি বা অসম্ভব না হয় তো অত্যন্ত কঠিন তো বটেই। পরমাণু বোমা তৈরি করা ও ব্যবহার করার ক্ষমতা হত্যা করার সার্বভৌম ক্ষমতার নিয়োগ ঠিকই, কিন্তু তা তো স্বয়ং জীবনকেই হত্যা করার ক্ষমতাও বটে। সুতরাং এই পরমাণু বোমার মধ্য দিয়ে যে ক্ষমতার চর্চা হচ্ছে তা স্বয়ং জীবনকেই দমন করার সামর্থ্য নিয়ে প্রযুক্ত হচ্ছে। আর তাই জীবনকে আশ্বাস দিতে চাওয়া ক্ষমতা হিসেবে তাকে তাই নিজেকেই দমন করতে হবে। হয় সে সার্বভৌম রূপে পরমাণু বোমা ব্যবহার করবে এবং সেই সুবাদেই আর ক্ষমতা, জৈবক্ষমতা, জীবনকে আশ্বস্ত করার ক্ষমতা হিসেবে গণ্য হবে না; আর নয়তো বিপরীত চরমে গিয়ে জৈবক্ষমতাকে ছাপিয়ে যেতে পারে এমন কোনও সার্বভৌম অধিকার আর থাকতে পারে না, বরং সার্বভৌমকে ছাপিয়ে যাওয়া জৈবক্ষমতাই থাকতে পারে। জৈবক্ষমতার এই সবকিছুকে ছাপিয়ে যাওয়া দৃশ্যমান হয়ে ওঠে যখন কেবলমাত্র জীবনের ব্যবস্থাপনা করা নয়, অধিকন্তু দ্রুত জীবনবিস্তার ঘটানোও মানুষের পক্ষে প্রকৌশলগতভাবে ও রাজনৈতিকভাবে সম্ভবপর হয়ে ওঠে, প্রাণময় বস্তু তৈরি করা সম্ভব হয়ে ওঠে, দানব তৈরি করাও সম্ভব হয় এবং শেষাবধি সম্ভবপর হয় এমনসব ভাইরাস তৈরি যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরিয়ে সবকিছুকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। পরমাণু ক্ষমতা নিয়ে যা বলছিলাম তেমনটা নয়, জৈবক্ষমতার এই ভয়ানক বিস্তৃতিই তাকে মানুষের সার্বভৌমত্বের নাগালের বাইরে নিয়ে চলে যাবে।

জৈবক্ষমতা নিয়ে এই দীর্ঘ আলোচনা আপনাদের অপ্রাসঙ্গিক মনে হলে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে শুরুতে যে সমস্যার উত্থাপন আমি করতে চাইছিলাম তাতে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ধারণা আমরা এর মধ্য থেকেই পাব।

যদি এটা সত্যি হয় যে সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা আরো বেশি বেশি করে পিছনে সরে যাচ্ছে এবং শৃঙ্খলাদায়ক বা নিয়ামক শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা ক্রমশ সামনে এগিয়ে আসছে, তাহলে জীবনকে তার বিষয় ও লক্ষ্য উভয় হিসেবেই গ্রহণ করা ক্ষমতার এই প্রয়োগকৌশলে হত্যা করার ক্ষমতা ও হত্যাকার্য কীভাবে কার্যকরী থাকবে ? কীভাবে এই ধরনের ক্ষমতা হত্যা করতে পারে যদি এটাই সত্য হয় যে এই ক্ষমতার মূলগত ভূমিকা হল জীবনের উন্নতি ঘটানো, জীবনকাল প্রলম্বিত করা, জীবনের

সম্ভাবনাগুলোকে বাড়ানো, দুর্ঘটনা এড়িয়ে যাওয়া ও পদস্খলনগুলোর ক্ষতিপূরণ তৈরি রাখা ? কীভাবে এমতাবস্থায় কোনও রাজনৈতিক ক্ষমতার পক্ষে হত্যা করা, হত্যা করার ডাক দেওয়া, হত্যা দাবি করা, হত্যার নির্দেশ দেওয়া এবং তার শত্রু ও তার আপন নাগরিক উভয়কেই মৃত্যুর বিপদের সামনে ফেলে দেওয়া সম্ভবপর হতে পারে ? এহেন ক্ষমতার মৌলিক লক্ষ্য হল একভাবে বাঁচতে বাধ্য করা— এ কথা যদি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে কীভাবে তা মরতে দিতে পারে ? জৈবক্ষমতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মৃত্যুর ক্ষমতা, মৃত্যুর ভূমিকা পালন কীভাবে হতে পারে ?

আমার মনে হয় ঠিক এইখানেই জাতিবাদ তার ভূমিকা পালন করে। অবশ্যই আমি একথা বলছি না যে জাতিবাদ এই সময়ে এসে উদ্ভাবিত হয়েছিল। তার অতি দীর্ঘ কাল আগে থেকেই জাতিবাদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই সময়ে এসে তার ভূমিকায় বদল ঘটেছিল। জৈবক্ষমতার আবির্ভাবই জাতিবাদকে রাষ্ট্রের কলকৌশলের মধ্যে উৎকীর্ণ করেছিল। এই সময়ে এসেই জাতিবাদ ক্ষমতার মৌলিক কলকৌশল হিসেবে উৎকীর্ণ হয়েছিল, যেভাবে আধুনিক রাষ্ট্রগুলোয় তার ব্যবহার দেখা যায়। এর ফলে আধুনিক রাষ্ট্র কোনও না কোনও বিন্দুতে, নির্দিষ্ট সীমা মেনে ও নির্দিষ্ট শর্তাধীনে হলেও জাতিবাদের সঙ্গে লিপ্ত না হয়ে রাষ্ট্র হিসেবে তার ভূমিকাই প্রায় পালন করতে পারে না।

জাতিবাদ আসলে কী? প্রাথমিকভাবে জাতিবাদ হল ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণাধীন জীবনের পরিসরে একটি ছেদ নিয়ে আসা: কাকে বাঁচতে হবে ও কাকে মরতে হবে তার মধ্যে এই ছেদ। মনবপ্রজাতির জৈবিক অবিচ্ছিন্নতার মধ্যে জাতির উপস্থিতি ফুটিয়ে তোলা, জাতিদের মধ্যে পার্থক্যবিধান, উচ্চাবচ ধাপবন্দি কাঠামোয় জাতিদের সাজানো, কিছু জাতিকে ভালো বলে বর্ণনা করে তাদের বিপরীতে অপর জাতিদের নিকৃষ্ট বলে বর্ণনা করা: এহেন নানা উপায়ে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণাধীন জৈবিক পরিসরকে খণ্ডিত করা হয়। জনসমষ্টির মধ্যে অস্তিত্বশীল গোষ্ঠীগুলোকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে তোলা হয়। এ হল জৈবিক পরিসর হিসেবে প্রতিভাত জনসমষ্টির মধ্যে জৈবিক ধরনের যতি কায়েম করার এক উপায়বিশেষ। এর ফলে ক্ষমতা জনসমষ্টিকে বিভিন্ন জাতির একটি মিশ্রণ হিসেবে গণ্য করতে পারে, বা আরো যথার্থ ভাবে বললে, তার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রজাতির মধ্যের জানাশোনা

উপপ্রজাতিগুলোকে জাতি হিসেবে ভাগ-উপভাগে ভেঙে গণ্য করতে পারে। জৈবক্ষমতার উদ্দিষ্ট জৈবিক অবিচ্ছিন্নতারকে খণ্ডাংশে ভাঙা, তার মধ্যে যতি তৈরি করা— এই হল জাতিবাদের প্রথম ভূমিকা।

জাতিবাদের একটি দ্বিতীয় ভূমিকাও আছে। সেই ভূমিকা হল এমন এক সদর্থক সম্পর্ক স্থাপন করা যার ধরন হল: 'যত হত্যা করবে, ততই বেশি মৃত্যু ঘটাতে পারবে', বা, 'আরো বেশি মানুষকে মরতে দেওয়ার মধ্য দিয়েই তুমি আরো বেশি বাঁচতে পারবে'। 'যদি তুমি বাঁচতে চাও, তোমাকে হত্যা করতে হবে, তোমাকে হত্যা করতে সমর্থ হয়ে উঠতে হবে'— এই সম্পর্ক জাতিবাদ বা আধুনিক রাষ্ট্রই যে প্রথম উদ্ভাবন করেছে তা নয়। এ হল যুদ্ধের সম্পর্ক: 'বাঁচতে হলে তোমাকে শত্রুদের ধ্বংস করতে হবে'। কিন্তু যুদ্ধের এই সম্পর্ক, অর্থাৎ, 'তুমি বাঁচতে চাইলে অপরকে মরতে হবে'— ধরনের সম্পর্ককে জাতিবাদ সম্পূর্ণ নতুন উপায়ে এমনভাবে কার্যকর করে তুলেছে যা জৈবক্ষমতার চর্চার অতীব উপযোগী হয়ে উঠেছে। একদিকে জাতিবাদ আমার বেঁচে থাকা ও অপরের মরার মধ্যে সম্পর্কটিকে সামরিক বা যুদ্ধ-সংক্রান্ত সংঘাত-সম্পর্কের বাইরেও স্থাপন করা সম্ভবপর করে তুলেছে এহেন জৈবিক চরিত্রের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে: 'যত বেশি নিকৃষ্ট প্রজাতি মারা যাবে, অপ্রকৃতিস্থ বা ব্যতিক্রমমূলক ব্যক্তিবর্গকে যত বেশি বিনাশ করা যাবে, সামগ্রিকভাবে প্রজাতিতে তত কম অধঃপতিত বা অপজাত অংশ থাকবে, আর ততই আমি– ব্যক্তিবিশেষ হিসেবের থেকেও বেশি প্রজাতি হিসেবে— বাঁচতে পারব, আরও শক্তিশালী হতে পারব, আরও সতেজ হতে পারব এবং আরও বংশবিস্তার করতে পারব।' অপরের মারা যাওয়া নেহাত এই অর্থেই আমার বাঁচাকে প্রসারিত করছে না যে অপরের মৃত্যু আমার নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করছে, বরং এই অর্থেও প্রসারিত করছে যে খারাপ জাতি বা নিকৃষ্ট জাতির (বা অধঃপতিত, ব্যতিক্রমমূলক জাতির) মৃত্যু সাধারণভাবেই জীবনকে আরও স্বাস্থ্যকর, আরও খাঁটি করে তুলবে।

তাই এ আর কোনও সামরিক, যুদ্ধসদৃশ বা রাজনৈতিক সম্পর্ক নয়, বরং, এ হল একটি জৈবিক সম্পর্ক। আর বিনাশ করতে হবে এমন শত্রুরা রাজনৈতিক অর্থে প্রতিপক্ষ বলে ক্ষমতার কলকৌশল এখানে সক্রিয় হয়ে উঠছে না, বরং, সক্রিয় হয়ে উঠছে এই কারণে যে তারা জনসমষ্টির সাপেক্ষে বা জনসমষ্টির জন্য আভ্যন্তরীণ বা বহিঃস্থ আপদবিশেষ। অন্যভাবে বললে, জৈবক্ষমতার কাঠামোয় হত্যা করা বা হত্যা করার অনুজ্ঞা তখনই

গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে যখন তা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভের ফলাভিসারী নয়, বরং প্রজাতি বা জাতির সামনের জৈবিক আপদকে বিনাশ করে প্রজাতি বা জাতির উন্নতিসাধনের ফলাভিসারী হয়। দুইয়ের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান। নিয়মোচিতকরণকারী একটি সমাজে জাতি বা জাতিবাদই হল সেই পূর্বশর্ত যা হত্যা করাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। একটি নিয়মোচিতকরণকারী সমাজে অন্তত উপরিস্তরে, প্রাথমিক বিচারে বা সামনের সারিতে ক্ষমতার রূপ হল জৈবক্ষমতা এবং কারও হত্যা হতে দেওয়া বা অপরদের হত্যা হতে দেওয়ার অনুমতির পিছনে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে জাতিবাদ কাজ করে। রাষ্ট্র যখন জৈবক্ষমতার প্রণালীতে কাজ করতে শুরু করে, কেবলমাত্র জাতিবাদ দিয়েই রাষ্ট্রের হত্যাকারী ভূমিকার যাথার্থ্য উৎপাদন করা হয়।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন এই ধরনের ক্ষমতার চর্চার ক্ষেত্রে জাতিবাদের গুরুত্ব— বলা যায় অপরিহার্য গুরুত্ব— ঠিক কোথায়: হত্যা করার অধিকার চর্চার পূর্বশর্তই হল জাতিবাদ। নিয়মোচিতকরণের ক্ষমতা যদি হত্যা করার অধিকারের পুরানো সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক হয় তবে তাকে জাতিবাদী রূপ ধারণ করতে হয়। আর উল্টোদিক থেকে, কোনও সার্বভৌম ক্ষমতা, বা অন্যভাষায়, জীবন-মৃত্যুর অধিকারের অধিকারী কোনও ক্ষমতা যদি নিয়মোচিতকরণের হাতিয়ার, কলকৌশল ও প্রয়োগকৌশলকে কাজে লাগাতে চায়, তাকেও জাতিবাদী রূপ ধারণ করতে হয়। 'হত্যা করা' বলতে আমি কেবল সোজাসাপটা খুন করাই বোঝাচ্ছি না, তার সঙ্গে হত্যার সব ধরনের পরোক্ষ রূপকেও বোঝাচ্ছি, যেমন: কাউকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দেওয়া, কোনও জনগোষ্ঠীর মৃত্যুর বিপদকে বাড়িয়ে তোলা, বা নেহাতই রাজনৈতিক মৃত্যু, বিতাড়ন, বাতিল ঘোষণা করা, ইত্যাদি।

আমরা মনে হয় এখন বেশ কিছু জিনিস বোঝার মতো জায়গায় উপনীত হয়েছি। সর্বপ্রথম আমরা বুঝতে পারব উনিশ শতকের জীববিজ্ঞানের তত্ত্ব ও ক্ষমতার প্রতর্কের মধ্যে অতি দ্রুত বা প্রায় তৎক্ষণাৎ যে যোগটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপ্ত অর্থে ধরলে বিবর্তনবাদ, বা অন্যভাবে বললে, শুধুমাত্র ডারউইনের তত্ত্ব হিসেবে না দেখে এক গোছা ধারণার (যেমন: একই বিবর্তন শাখা থেকে উদ্ভূত প্রজাতিদের উচ্চাবচ ধাপবন্দি কাঠামো, প্রজাতিদের মধ্যে টিকে থাকার জন্য অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম, তুলনায় কম সমর্থদের বিনাশ

ঘটানোর মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক বাছাই প্রক্রিয়া) সমষ্টি হিসেবে দেখলে, উনিশ শতককালে কয়েক বছরের মধ্যেই তা আর কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতর্ককে জীববিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করার বা রাজনৈতিক প্রতর্ককে বিজ্ঞানের পোষাকে মুড়ে হাজির করার উপায় হিসেবে রইল না, বরং উপনিবেশস্থাপন, যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, অপরাধপ্রবণতা, পাগলামো বা মানসিক রোগের প্রতীতি, ভিন্নতর শ্রেণি সম্পন্ন সমাজদের ইতিহাস ও আরো কত কী সম্পর্কে ভাবার বাস্তব উপায় হয়ে উঠল। অন্যভাবে বললে, যখনই কোনও মুখোমুখি সংঘাত তৈরি হল, কোনও হত্যা বা মৃত্যুর বিপদ, উনিশ শতক বিবর্তনবাদের ধাঁচায় নিজের ভাবনাকে সঁপে দিয়ে সন্তুষ্ট রইল।

আর আমরা এটাও বুঝতে পারব যে জৈবক্ষমতার প্রণালীতে কার্যরত আধুনিক সমাজগুলোয় জাতিবাদ কেন ফুলেফেঁপে ওঠে; বুঝতে পারব কেন কিছু বিশেষ মুহূর্তে জাতিবাদের বিস্ফোরণ ঘটে, আর সেই মুহূর্তগুলো কেন এমন মুহূর্তই হয় যখন হত্যা করার অধিকার বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। জাতিবাদ প্রথম ফুলেফেঁপে উঠেছিল উপনিবেশস্থাপনের সহযোগী হয়ে, বা বলা ভালো, উপনিবেশস্থাপনের জন্য গণহত্যার সহযোগী হয়ে। যখন জৈবক্ষমতার প্রণালীতে কাজ করা হচ্ছে, তখন মানুষ, জনসমষ্টি বা সভ্যতাকে হত্যা করার প্রয়োজনীয়তার যাথার্থ্য কীভাবে নির্মাণ করা যায় ? নির্মাণ করা যায় জাতিবাদের শরণাপন্ন হয়ে বিবর্তনবাদের ধুয়ো তোলার মধ্য দিয়েই।

যুদ্ধ। কীভাবে কেবলমাত্র নিজের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধচালনা না করে, উপরন্তু নিজের নাগরিকদেরও যুদ্ধের মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় এবং তাদের লাখে লাখে খুন হতে দেওয়া যায় (উনিশ শতকের পর থেকে বা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে ঠিক এমনটাই তো ঘটে চলেছে) যদি না জাতিবাদের ধুয়োকে অতি সক্রিয় করে তোলা যায় ? এই মুহূর্ত থেকে যুদ্ধের লক্ষ্য হয়ে উঠল দ্বিবিধ: রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করা, আর কেবল তাই-ই নয়, উপরন্তু শত্রু জাতিকে ধ্বংস করা, অর্থাৎ, আমাদের জাতির সামনে জৈবিক বিপদ হিসেবে হাজির রয়েছে যে অপর জাতি, সেই অপর জাতির মানুষদের ধ্বংস করা। এক অর্থে এটা অবশ্য রাজনৈতিক শত্রুর ধারণার একটি সম্প্রসারণ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আসলে এর মধ্যে আরও অনেক কিছু ঢুকে আছে। তার মধ্যে সম্পূর্ণতই যা অভিনব তা হল এই যে উনিশ শতকে যুদ্ধকে আর কেবল শত্রু জাতিকে বিনাশ করে

নিজ জাতির উন্নয়নসাধনের (প্রাকৃতিক বাছাই ও অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের ধারণা অনুসারী) উপায় হিসেবে দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হল না, বরং নিজ জাতির পুনরুজ্জীবনের একটি উপায় হিসেবেও তুলে ধরা হল। নিজ জাতির মানুষই আরও আরও সংখ্যায় যত আরও মরবে, ততই আমাদের জাতি আরও পবিত্র, আরও খাঁটি হয়ে উঠবে।

তাই উনিশ শতকের শেষে এসে আমরা যুদ্ধের ধাঁচায় গড়ে তোলা এক জাতিবাদকে পাই। আমার মনে হয় যে তা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে যুদ্ধ জারি করতে ইচ্ছুক জৈবক্ষমতার শত্রুবিনাশের অভিপ্রায় ঘোষণা এই ঝুঁকি নিয়েই করতে হয় যে সংজ্ঞা অনুযায়ী যে মানুষদের সে রক্ষা, ব্যবস্থাপনা ও বংশবিস্তার করার আশ্বাস দেয়, তাদেরই হত্যা করার থেকে পিছপা হলে চলে না। অপরাধপ্রবণতা সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। অপরাধীদের দণ্ড দেওয়া বা নির্বাসিত করার জন্য জৈবঅপরাধের কলকৌশল প্রয়োগ হতে শুরু হওয়ার পর থেকেই অপরাধপ্রবণতাও জাতিবাদী ধারণার মাধ্যমে সংজ্ঞাত হয়েছে। পাগলামো ও অন্যান্য অস্বাভাবিকতা প্রসঙ্গেও একই কথা খাটে।

যে মাত্রায় একজন কোনও এক জাতি বা জনসমষ্টির সদস্য, যে মাত্রায় সে কোনও একক জীবিত বহুত্বের উপাদানবিশেষ, সেই মাত্রাতেই অপরের মৃত্যু তাকে জৈবিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তোলে— এই নীতির শরণ নিয়ে জাতিবাদ সাধারণভাবে জৈবক্ষমতার অর্থনীতিতে সাধারণভাবে মৃত্যুকৃত্যের যাথার্থ্য উৎপাদন করে বলে আমার মনে হয়। এর মধ্য দিয়ে তা জাতিদের মধ্যে পরস্পর অবমাননা বা ঘৃণার রূপ ধরে গড়ে ওঠা সাবেকি জাতিবাদের থেকে অনেক আলাদা হয়ে ওঠে। অনেক আলাদা হয়ে ওঠে সেই ধরনের জাতিবাদের থেকেও যা এক প্রকার মতবাদিক প্রক্রিয়া রূপে রাষ্ট্রদের বা কোনও শ্রেণিকে তাদের বা তার দিকে নিশানা করা শত্রুতাকে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করে, বা, কোনও এক অতিকথাজাত শত্রুর মুখে সমাজদেহের পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমার মনে হয় যে এই জাতিবাদ পুরানো কোনও পরম্পরার চেয়েও অনেক গভীর, নতুন কোনও মতবাদের চেয়েও অনেক গভীর, এ হল আলাদা কিছু। আধুনিক জাতিবাদের নির্দিষ্টতা, বা যা এই আধুনিক জাতিবাদকে নির্দিষ্টতা দান করে, তা কোনও মানসিকতা, মতবাদ বা ক্ষমতার মিথ্যাচারণের সঙ্গে যুক্ত নয়। তা যুক্ত ক্ষমতার কৌশলের সঙ্গে, ক্ষমতার প্রয়োগকৌশলের সঙ্গে। এই যার সঙ্গে তা যুক্ত তা জাতিযুদ্ধ

এবং ইতিহাসের বোধগম্যতার অনেক দূরে আমাদের সরিয়ে নিয়ে যায়। জৈবক্ষমতাকে কাজ করতে দেয় যে কলকৌশল, আমরা এখানে তার মোকাবিলা করছি। সুতরাং এই জাতিবাদ অবধারিতভাবে এমন এক রাষ্ট্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে যে রাষ্ট্র তার সার্বভৌম ক্ষমতার চর্চায় জাতি, জাতিদের বিনাশ এবং জাতির শুদ্ধিকরণের ব্যবহার ঘটায়। জীবন ও মৃত্যুর পুরানো সার্বভৌম ক্ষমতার যে সন্নিধির মধ্য দিয়ে জৈবক্ষমতা কাজ করে, তা জাতিবাদের কার্যপদ্ধতি প্রবর্তন ও সক্রিয়করণ দাবি করে। আর এখানেই জাতিবাদের আসল শিকড়গুলোকে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সবচেয়ে খুনে হত্যাপ্রবণ রাষ্ট্রগুলো কেন আবশ্যিকভাবে সবচেয়ে বেশি জাতিবাদী হয়। এখানে অবশ্যই আমাদের নাজিবাদের উদাহরণকে বিবেচনা করতে হবে। আঠারো শতক থেকে ক্রমশ ক্ষমতার যে নতুন কলকৌশলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোরই এক প্রকোপতাড়িত বিকাশের রূপ হল নাজিবাদ। সন্দেহ নেই যে নাজি জমানার থেকে অধিক শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা আর কোনও রাষ্ট্রের ছিল না। আবার এমন আর কোনও রাষ্ট্রও ছিল না যেখানে জৈবউপাদানকে এত নাছোড়ভাবে ও কড়াহাতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। নাজি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গিয়ে তার গাঁথনির মশলা হয়ে উঠেছিল শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা ও জৈবক্ষমতা (জৈবউপাদানের উপর নিয়ন্ত্রণ, সন্তানোৎপাদন ও বংশধারার উপর নিয়ন্ত্রণ, এমনকি রোগ ও দুর্ঘটনার উপর নিয়ন্ত্রণ)। যে সমাজ নাজিরা প্রতিষ্ঠা করেছিল, বা অন্তত প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেছিল, এমন কোনও সমাজ ছিল না যা তার থেকে বেশি শৃঙ্খলাদায়ক বা বীমা প্রদান করতে তার থেকে বেশি তৎপর। জৈব প্রক্রিয়াসমূহের অন্তর্গত অক্রম বা আকস্মিক উপাদানগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বাঁধা ছিল ওই জমানার অন্যতম আশু লক্ষ্য।

কিন্তু বীমা ও আশ্বাসজ্ঞাপনকে সার্বিক রূপ দেওয়া এই সার্বিক শৃঙ্খলাদায়ক ও নিয়ামক সমাজই আবার খুনে রক্তপিপাসু ক্ষমতাকে, বা অন্যভাবে বললে, খুন করার পুরানো সার্বভৌম অধিকারকে বল্গাহীন করে দিয়েছিল। নাজি সমাজদেহের সর্বাঙ্গ জুড়ে দাপিয়ে বেড়ানো এই খুন করার ক্ষমতা প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ পেল যখন খুন করার ক্ষমতা বা জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের হাতে না রেখে বেশ বড় সংখ্যার এক সারি ব্যক্তিবিশেষের (যেমন: এস এ, এস এস, ইত্যাদি) হাতেও তুলে দেওয়া

হল। শেষাবধি, নাজি রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের হাতেই তার পড়শির জীবন ও মৃত্যুর উপর ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছিল, যদি বা তা কেবল নজরদারি ও চরগিরি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে পাশের বাড়ির পড়শিকে কার্যত নিকাশ করা বা নিকাশের জন্য তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়েও হয়।

এইভাবে খুনে হত্যাপ্রবণ ক্ষমতা ও সার্বভৌম ক্ষমতা গোটা সমাজদেহ জুড়ে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তা লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধকে একটা রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে সংজ্ঞায়িত করার মধ্য দিয়েও। এই রাজনৈতিক লক্ষ্য নেহাত কোনও প্রাথমিক চরিত্রের বা উপায়স্বরূপ নয়, বরং তা সমস্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার এক প্রকার অন্তিম ও নির্ধারক পর্বস্বরূপ যার মধ্য দিয়ে সবকিছু পূর্ণতা লাভ করবে। অপরাপর জাতিদের ধ্বংস করাই তাই নাজি জমানার আসল লক্ষ্য ছিল না। অপর জাতিদের ধ্বংসসাধন গোটা পরিকল্পনার একটা দিক ছিল মাত্র, অন্য দিকটা ছিল নিজের জাতিকে মৃত্যুর চরম ও সার্বিক হুমকির সামনে দাঁড় করানো। নিজের জীবনকে বাজি রাখা, সার্বিক ধ্বংসের ভ্রূকুটির মুখোমুখি দাঁড়ানো ছিল অনুগত নাজিদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম, আর নাজিবাদের নীতিসমূহের মৌলিক লক্ষ্যের মধ্যেও তা ছিল। তার যাত্রার চূড়ান্ত লক্ষ্যবিন্দু ছিল সেই অবস্থা যেখানে গোটা জনসমষ্টিই খোলাখুলি মৃত্যুর ভ্রূকুটির সামনে এসে দাঁড়াবে। গোটা জনসমষ্টিকে সার্বিক মৃত্যুর সামনে উন্মোচিত করে দেওয়াই ছিল তার ভাবনায় এক এবং একমাত্র পথ যার মধ্য দিয়ে সে নিজেকে প্রকৃতই একটি শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে সংগঠিত করতে পারে এবং অপরাপর জাতিগুলোর বিনাশসাধন বা দাসত্ববরণের পর নিজ জাতির চূড়ান্ত পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারে।

সুতরাং, নাজি সমাজের মধ্যে আমরা এমনকিছু পাই যা সত্যিই অসাধারণ, তা হল: এ হল এমন এক সমাজ যেখানে জৈবক্ষমতা একটি চরম সাধারণিকৃত রূপ ধারণ করেছে, আবার খুন করার সার্বভৌম ক্ষমতার সাধারণিকরণও সেখানে ঘটেছে। যে প্রাচীন ধ্রুপদী কলকৌশল রাষ্ট্রের হাতে তার নাগরিকদের জীবন ও মৃত্যুর অধিকার ন্যস্ত করে এবং শৃঙ্খলা ও নিয়মোচিতকরণের উপর সংগঠিত যে নতুন কলকৌশল বা এককথায় বললে জৈবক্ষমতার নয়া কলকৌশল— এই দুই কলকৌশল এখানে যুগপৎ মিলিত হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি: নাজি রাষ্ট্র জীবনের যে পরিসরের ব্যবস্থাপনা করে, রক্ষা করে, নিশ্চয়তাপ্রদান করে ও অনুশীলন করে, সেই

পরিসরকেই সে জৈবিক অর্থে যে কোনও কাউকে— কেবল অপর মানুষদের নয়, তার নিজের মানুষদেরও— খুন করার সার্বভৌম অধিকারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত করে তোলে। নাজিবাদের মধ্যে সাধারণিকৃত জৈবক্ষমতার সঙ্গে যুগপৎ সম্মিলন ঘটেছিল এমন এক একনায়কতন্ত্রের যা একই সঙ্গে যেমন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল, তেমনই হত্যা করার অধিকার ও মৃত্যুভ্রূকুটির সরাসরি মুখোমুখি হওয়ার অবিশ্বাস্য সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে গোটা সমাজদেহের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সামনে হাজির হয় একটি চরম খুনি বা হত্যাপ্রবণ রাষ্ট্র, যা আবার একটি চরম আত্মহত্যাপ্রবণ রাষ্ট্রও বটে। জাতিবাদী রাষ্ট্র, খুনি রাষ্ট্র ও আত্মঘাতী রাষ্ট্র— এই তিনের আবশ্যকীয় অধ্যারোপের ফলে একদিকে যেমন রূপ পেয়েছিল ১৯৪২-১৯৪৩ সালের 'চূড়ান্ত সমাধান' (ইহুদিদের বিনাশসাধন করার মধ্য দিয়ে ইহুদিরা যাদের প্রতীক ও অভিব্যক্তি, সেই সমস্ত অপর জাতির বিনাশসাধনের প্রয়াস), তেমনই অন্যদিকে সম্ভবপর হয়েছিল ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে হিটলারের 'তারবার্তা-৭১' যার মধ্য দিয়ে জার্মান জাতির মানুষদের নিজেদের জীবনশর্তগুলোকেই ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

অপর জাতিগুলোর জন্য চূড়ান্ত সমাধান আর নিজ (জার্মান) জাতির জন্য চূড়ান্ত আত্মহনন— আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপে নিহিত কলকৌশলগুলো এই পথেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সন্দেহ নেই যে নাজিবাদ একাই হত্যা করার সার্বভৌম অধিকার এবং জৈবক্ষমতার কলকৌশলের মধ্যে আন্তঃক্রীড়াকে এই প্রকোপতাড়িত সীমা অবধি টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই আন্তঃক্রীড়া কার্যত সমস্ত রাষ্ট্রের কাজের মধ্যেই বর্তমান। সমস্ত রাষ্ট্র মানে কি সব আধুনিক রাষ্ট্র, সব পুঁজিবাদী রাষ্ট্র? হয়তো বা না। কিন্তু আমার মনে হয়— আর এই মনে হওয়া একটি নতুন বক্তব্যেরই সূচনা করছে— যে আধুনিক রাষ্ট্র বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কার্যক্রম জাতিবাদ দিয়ে যতটা চিহ্নিত, ঠিক ততটাই চিহ্নিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা সমাজতন্ত্রও। এখনই আমরা যে পরিস্থিতির কথা আলোচনা করছিলাম, সেখানে রাষ্ট্রীয় জাতিবাদ বিকশিত হওয়ার পাশাপাশি এক ধরনের সামাজিক-জাতিবাদেরও উদ্ভব ঘটেছে এবং তা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর আবির্ভাব অবধি অপেক্ষা করে থাকেনি। শুরু থেকেই সমাজতন্ত্র ছিল এক প্রকার জাতিবাদ, এমনটি উনিশ শতকেও এর থেকে বাদ নয়। ওই শতকের গোড়ার দিকের ফুরিয়েরকে ধরা হোক, বা

শতকশেষের নৈরাষ্ট্রবাদীদের ধরা হোক, সমাজতন্ত্রের মধ্যে সর্বদাই একটা জাতিবাদী উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে।

এই বিষয়ে আলোচনা করা খুব কঠিন। বিশাল বিশাল সব দাবি করে ফেলার ঝুঁকি থেকে যায়। বিষয়টিকে সপ্রমাণে হাজির করতে আলাদা একটি গোটা বক্তৃতামালাই প্রয়োজন (অন্য কোনও সময়ে আমি তেমন এক বক্তৃতামালা অবশ্যই করতে চাইব)। কিন্তু এখন অন্তত এইটুকু বলা যাক: কিছুটা অনুমাননির্ভর ভাবে বলেও সাধারণভাবে আমার মনে হয় যে সমাজতন্ত্র প্রথমত যে মাত্রায় সম্পত্তি মালিকানা বা উৎপাদনপদ্ধতির বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক বা আইনকানুন সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর উত্থাপন করে না, বা, যে মাত্রায় ক্ষমতার গতিবিধি বা ক্ষমতার কলকৌশলকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে না, সেই মাত্রাতেই সমাজতন্ত্রও অবধারিতভাবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বা শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের গঠন করা ক্ষমতার কলকৌশলগুলোকে পুনর্বার বহাল ও সক্রিয় করে তোলে। অন্তত একটা বিষয় অনস্বীকার্য: আঠারো শতকের শেষ থেকে ও গোটা উনিশ শতক জুড়ে বিকাশলাভ করা জৈবক্ষমতার বিষয়গুলোর কোনও বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা সমাজতন্ত্র করেনি; বরং এই জৈবক্ষমতাকে যে নিজেই গ্রহণ করেছে, আরও বিকশিত করেছে, নতুনভাবে রোপণ করেছে এবং কিছু রূপান্তরসাধনও করেছে, কিন্তু এর ভিত্তি বা কার্যপ্রণালীকে পুনর্বিচার করে দেখেনি। শেষাবধি, জৈবক্ষমতার এমত ধারণা যে সমাজ হোক, রাষ্ট্র হোক, বা, রাষ্ট্রের জায়গায় যা প্রতিস্থাপন করা হবে তা হোক, তার অতি আবশ্যক কাজ হল জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা, জীবনের ব্যবস্থাপনা করা, জীবনের অক্রম বা আকস্মিক চরিত্রকে বশ মানানো, জৈব দুর্ঘটনা ও সম্ভাবনাগুলোকে হিসাবনিকাশ করে বেঁধে ফেলা... আমার মনে হয় যে সমাজতন্ত্র এ ধারণাকে পুরোপুরি আত্মসাৎ করে নিয়েছে। আর এর ফলে অচিরেই আমরা এমন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেখতে পাই যা বাধ্যতামূলকভাবে খুন করার অধিকার, ছাঁটাই বা বাদ দেওয়ার অধিকার এবং অযোগ্য বলে দেগে দেওয়ার অধিকারকে পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করে চলে। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই আমরা দেখি যে (সোভিয়েত ইউনিয়ন ধাঁচার) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো যেভাবে মানসিক রোগী, অপরাধী, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, ইত্যাদিদের ব্যবস্থা নেয়, তার মধ্যে জাতিবাদ— একেবারে ঠিক নৃগোষ্ঠীগত জাতিবাদ নয়, বরং বিবর্তনমূলক ধারার জাতিবাদ, জৈব জাতিবাদ— পূর্ণমাত্রায় কাজ করে।

আর একটি জিনিস যা আমার কাছে বেশ কৌতূহলের বিষয় বলে মনে হয়েছে এবং যা দীর্ঘকাল ধরে আমার সামনে একটি সমস্যা হিসেবে খাড়া হয়ে থেকেছে তা হল আবারও এই প্রতীতি যে জাতিবাদ কেবল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্তরেই কাজ করছে এমনটা নয়, বিভিন্ন ধরনের সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণ বা উনিশ শতক জুড়ে হাজির হওয়া বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক প্রকল্পের মধ্যেও আমরা জাতিবাদকে কাজ করতে দেখি। আমার মনে হয় যে এর সঙ্গে যা জড়িত তা হল: যখনই কোনও সমাজতন্ত্র জোর দিয়ে দাবি করে যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎক্রমণের পূর্বশর্ত হল অর্থনৈতিক অবস্থার রূপান্তরসাধন (বা অন্যভাবে বললে, যখনই কোনও সমাজতন্ত্র রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহ দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে), তখন তার জাতিবাদকে দরকার পড়ে না, বা, অন্তত আশু অর্থে দরকার পড়ে না। অন্যদিকে, যখনই সমাজতন্ত্র বাধ্য হয়েছে সংগ্রামের সমস্যায়— শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমস্যায়, পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যেই শত্রুকে নিকাশ করার সমস্যায়— জোর ফেলতে, আর সেই সুবাদেই পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যে শ্রেণিশত্রুর দৈহিক মোকাবিলার বিষয়ে ভাবতে বাধ্য হয়েছে, তখনই জাতিবাদ মাথাচাড়া দিয়েছে কারণ একমাত্র এই জাতিবাদের পথেই জৈবক্ষমতার বিষয়াদিকে অঙ্গীভূত করে নেওয়া সমাজতান্ত্রিক চিন্তা তার শত্রুদের হত্যা করার বিষয়টিকে যুক্তিসিদ্ধ রূপে হাজির করতে সমর্থ হয়েছে। বিষয়টি যখন নেহাতই অর্থনৈতিক বিচারে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার বিষয়, বা প্রতিপক্ষের সুবিধা কেড়ে নেওয়ার বিষয়, তখন জাতিবাদের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু যখনই বিষয়টি হয়ে দাঁড়ায় একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে সম্মুখসমরে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার বিষয়, দৈহিকভাবে লড়াই করার বিষয়, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে চেষ্টা করার বিষয়, তখনই জাতিবাদের প্রয়োজন পড়ে।

তাই যখনই সমাজতন্ত্রের এই রূপগুলো বা এই মুহূর্তগুলো এসে হাজির হয় যেখানে সংগ্রামের উপর জোর ফেলা হচ্ছে, তখনই জাতিবাদও এসে হাজির হচ্ছে। তাই সমাজ-গণতন্ত্র, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বা স্বয়ং মার্কসবাদ যতটা না জাতিবাদী, তারচেয়ে অনেক বেশি জাতিবাদী চরিত্রের সমাজতন্ত্রগুলো হল: অবশ্যই ব্লাঁকিবাদ, তারপর কম্যুন, তারপর নৈরাষ্ট্রবাদ। ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক জাতিবাদের অবসান ঘটেছিল উনিশ শতকের শেষে একদিকে সমাজ-গণতন্ত্রের আধিপত্যের মধ্য দিয়ে (আর এও বলা বাহুল্য যে

তার সঙ্গে যুক্ত সংস্কারবাদের মধ্য দিয়ে) আর অন্যদিকে ফ্রান্সের দ্রেইফুস মামলার মতো একাধিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। দ্রেইফুস মামলার আগে অবধি সব সমাজতন্ত্রী, বা অন্তত সিংহভাগ সমাজতন্ত্রী, মূলগতভাবে জাতিবাদী ছিল। আর আমার মনে হয় যে তারা সেই মাত্রাতেই জাতিবাদী ছিল (আর এই মন্তব্যের মধ্য দিয়েই আমি আপাতত শেষ করব) যে মাত্রায় তারা আঠারো শতক থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকাশ জৈবক্ষমতার যে কলকৌশলগুলোকে প্রতিষ্ঠা করেছে সেগুলোর কোনও পুনর্মূল্যায়ন না করে স্বয়ংসিদ্ধ রূপেই তাদের গ্রহণ করেছে। জাতিবাদী না হয়ে উঠে কীভাবে কেউ জৈবক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, যুদ্ধের অধিকার, খুনের অধিকার, মৃত্যু কার্যকরী করার অধিকার চর্চা করতে পারে? সমস্যাটা এখানে দাঁড়িয়ে ছিল এবং আমার মনে হয় আজও এখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

উৎস: ১৯৭৬ সালের ৭ই জানুয়ারি থেকে ১৭ই মার্চ অবধি প্রতি সপ্তাহে একটি করে মোট ১১টি বক্তৃতা কলেজ-দি-ফ্রাঁস-য় শিক্ষার্থী-গবেষকদের উদ্দেশ্যে মিশেল ফুকো দিয়েছিলেন। এইটি তার শেষ বক্তৃতা। ১৯৭০-য়ের দশকে ফ্রান্সে ক্যাসেট-টেপ-রেকর্ডার প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি ও বিস্তার ঘটেছিল। তারই ফলস্বরূপ শ্রোতাদের অনেকেই ফুকোর এই বক্তৃতামালা ক্যাসেট-টেপ-রেকর্ডারে ধরে রেখেছিলেন। গিলবার্ট বুরলেট ও জাক লাগরানজ নামক দুই গবেষকের করা রেকর্ডিং পরবর্তীকালে কলেজ-দি-ফ্রাঁস-তে সংরক্ষণ করা হয়। তার থেকে লিপ্যন্তর করে ফরাসি পাঠ প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে। ২০০৩ সালে ডেভিড মেসি কৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'সোসাইটি মাস্ট বি ডিফেন্ডেড' বইয়ের আকারে। সেই বইয়ের ২৩৯ পৃষ্ঠা থেকে ২৬৩ পৃষ্ঠা অবধি অংশ এখানে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জীবনশিল্প

‘অ্যান্টি-ঈদিপাস’বইয়ের ভূমিকা

১৯৪৫—১৯৬৫ সালগুলোয় সঠিকভাবে ভাবার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল, রাজনৈতিক প্রতর্কের একটা নির্দিষ্ট আদবকায়দা ছিল, বুদ্ধিবৃত্তির নির্দিষ্ট নীতি-নৈতিকতা ছিল (আমি ইউরোপের কথা বলছি)। মার্কস-য়ের সঙ্গে জানাবোঝার সম্পর্ক রাখতে হতো এবং নিজ স্বপ্নকে ফ্রয়েডের থেকে খুব একটা দূরাচারী হতে দেওয়া যেত না। আর দ্যোতক অর্থাৎ চিহ্ন-ব্যবস্থাগুলোকে সর্বোচ্চ সম্ভ্রম দেখাতে হতো। এই তিনটি ছিল আবশ্যিক পূর্বশর্ত যা পালিত হলে তবেই নিজ সম্বন্ধে ও নিজের সময় সম্বন্ধে খানিক সত্যকে বলার বা লেখার অদ্ভূত বৃত্তি গ্রহণযোগ্য হতো।

এর পর এল সংক্ষিপ্ত, আবেগদীপ্ত, উচ্ছ্বসিত ও প্রহেলিকাময় পাঁচটি বছর। আমাদের জগতের দুয়ারে এসে দাঁড়াল ভিয়েতনাম, আর, অবশ্যই, প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার ধ্বজাগুলোর উপর প্রথম বড়সড় আঘাত নেমে এল। কিন্তু এখানে, আমাদের চার দেওয়ালের ভিতরে তখন ঠিক কী ঘটছিল? বিপ্লবী ও দমনবিরোধী রাজনীতির একটা মিশ্রণ ঘটছিল কি? সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে ও মানসিক অবদমনের বিরুদ্ধে— এই দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ জারি হয়েছিল? শ্রেণিসংগ্রামের টানে কামশক্তির জোয়ার উঠেছিল? হয়ত বা তাই। যাই হোক না কেন, সেই বছরগুলোর ঘটনার ব্যাখ্যায় এই ধরনের পরিচিত দ্বৈতবাচক ব্যাখ্যাই মান্যতা পেয়েছে। ইউরোপের সবচেয়ে স্বপ্নাতুর দুটি অংশে— উইলহেম রিখ-য়ের জার্মানি আর পরাবাস্তববাদীদের ফ্রান্সে— প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যবর্তী সময়ে যে স্বপ্ন মায়াবিস্তার করেছিল,

তা পুনর্বার ফিরে এসে খোদ বাস্তবতার গায়েই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, সে গনগনে আগুনের শিখায় মার্কস ও ফ্রয়েড ঝলসে উঠেছিল।

কিন্তু সত্যি কি তাই-ই ঘটেছিল? সত্যিই কি তিরিশ দশকের কল্পরাজ্য-গঠনের প্রকল্পগুলোকে আবার নতুন করে শুরু করা হয়েছিল, এবং এবারে তা ঐতিহাসিক চর্চার মাত্রা ধারণ করেছিল? নাকি তার উল্টোটাই ঘটেছিল— মার্কসীয় পরম্পরাজাত কোনও ধাঁচাতেই খাপ খায় না এমন রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে যাত্রা শুরু হয়েছিল? যাত্রা শুরু হয়েছিল এমন এক অভিজ্ঞতা ও কামনার প্রয়োগবিদ্যার দিকে যাকে আর ফ্রয়েডিয় বলা সম্ভব নয়? একথা সত্য যে পুরানো নিশানগুলো তোলা হয়েছিল, কিন্তু সংগ্রাম সরে গিয়েছিল ও ছড়িয়ে গিয়েছিল নতুন নতুন অঞ্চলে।

কতটা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তা *অ্যান্টি-ঈদিপাস* প্রথমত দেখায়। কিন্তু তা এর চেয়ে আরো অনেক বেশি কিছু করে। পুরানো দেবমূর্তিগুলোকে অপদস্থ করায় তা সময় নষ্ট করেনি, যদিও ফ্রয়েডকে নিয়ে প্রচুর মজা করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, তা আমাদের আরো দূরে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়।

অবশ্য, *অ্যান্টি-ঈদিপাস*-কে নতুন তাত্ত্বিক নির্দেশ (সেই বহু-কাঙ্খিত তত্ত্ব যা শেষাবধি সবকিছুকে ধারণ করছে, যা শেষাবধি সর্বাত্মক সোপর্দ হাজির করছে এবং ভরসা যোগাচ্ছে, যে তত্ত্বের জন্য আমাদের এই তথাকথিত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া খণ্ডিত বিশেষজ্ঞকরণের 'আশা'-হীন যুগে আমরা 'হাপিত্যেশ করে বসে ছিলাম') হিসেবে পড়া ভুল হবে। *অ্যান্টি-ঈদিপাস* এক চমকদার অভিনব হেগেল নয়: এর অন্তর্গত নতুন ধারণা ও অবাক-করা প্রত্যয়গুলোর ছড়াছড়ির মধ্যে 'দর্শন' খুঁজতে যাওয়া ভুল হবে। আমার মনে হয় *অ্যান্টি-ঈদিপাস*-কে পড়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হল তাকে একটা 'শিল্প' গণ্য করে পড়া, যে অর্থে, উদাহরণস্বরূপ, 'কামাত্মক শিল্প' শব্দবন্ধে 'শিল্প' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বহুত্ব, প্রবাহ, বিন্যাস ও সংযোগের মত আপাত বিমূর্ত ধারণা ব্যবহার করে বাস্তবতার সঙ্গে ও পুঁজিবাদী 'যন্ত্র'-য়ের সঙ্গে কামনার সম্পর্কের বিশ্লেষণ মূর্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর হাজির করেছে। সেসব প্রশ্ন যত না এটা বা ওটা *কেন* তা নিয়ে ভাবিত, তার চেয়ে বেশি ভাবিত *কীভাবে* করা যায় তা নিয়ে। চিন্তা, প্রতর্ক, ক্রিয়া-র মধ্যে কেউ কামনার প্রবর্তন করে কীভাবে? রাজনৈতিক পরিসরের মধ্যে কীভাবে কামনা তার

বলসমূহকে বিন্যস্ত করতে পারে এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে উলটে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় আরও প্রগাঢ় ও তীব্র হয়ে উঠতে পারে বা হয়ে ওঠা আবশ্যকীয়? *কামের শিল্প, তত্ত্বের শিল্প, রাজনীতির শিল্প।*

আর এই সুবাদেই অ্যান্টি-ঈদিপাস তার তিন বিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছে। এই তিন বিপক্ষ, যাদের শক্তি সমান নয়, বিপদ সমান নয়, এবং বইটি যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামও আলাদা আলাদা উপায়ে করেছে, তারা হল:

১. রাজনৈতিক যোগীবাবারা, করুণ মুখের মিলিট্যান্টরা, তত্ত্বের সন্ত্রাসবাদীরা, যারা রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রতর্কের একটা খাঁটি বংশধারা বজায় রাখতে মরীয়া, যারা বিপ্লবের আমলা ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম সত্য'-য়ের দপ্তরি-করণিক।

২. কামনার অভাগা প্রকৌশলীগণ— সর্ববিধ চিহ্ন ও লক্ষণ-উপসর্গের জন্য ওত পেতে থাকা বিবিধ মনোবিশ্লেষক ও সেমিওলজিস্ট— যারা কামনার বহুত্বকে কাঠামো ও অভাবের দ্বৈত নিয়মে বেঁধে ফেলতে চান।

৩. শেষত তবে মোটেই সবচেয়ে ছোট নয়, বরং সবচেয়ে বড় শত্রু, সামগ্রিক পরিকল্পনার স্তরেও শত্রু যে, সে হল ফ্যাসিবাদ (*অ্যান্টি-ঈদিপাস*-য়ে বাকি প্রতিপক্ষদের বিরোধিতা করা হয়েছে প্রধানত কৌশলী বিতণ্ডার মাধ্যমে)। ঐতিহাসিক ফ্যাসিবাদ বা হিটলার-মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ কত না কার্যকরী ভাবে জনগণকে সমাবেশিত করতে পেরেছিল ও জনগণের কামনাকে ব্যবহার করতে পেরেছিল, তবে এখানে ফ্যাসিবাদ বলতে শুধু ওই ফ্যাসিবাদকেই বোঝানো হচ্ছে না, বোঝানো হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে বাসা গেড়ে থাকা ফ্যাসিবাদকেও। এই ফ্যাসিবাদ আমাদের মগজে বর্তমান, আমাদের প্রাত্যহিক আচরণের মধ্যে বর্তমান, যা আমাদের ক্ষমতার প্রতি অনুরক্ত করে তোলে, আমাদের দমন ও শোষণ করে যাকিছু তার জন্যই কামনা জাগিয়ে তোলে।

অ্যান্টি-ঈদিপাস বইয়ের লেখকদের কাছে মার্জনা চেয়ে নিয়ে আমি বইটিকে একটি নীতিবিদ্যার বই বলব। দীর্ঘ বহু বছর সময়পর্যায়ে ফ্রান্সে লিখিত হওয়া প্রথম নীতিবিদ্যার বই (সম্ভবত এই কারণেই বইটির সাফল্য কোনও এক প্রকার পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, অ্যান্টি-ঈদিপিয় হওয়া এক প্রকার জীবনশৈলী, চিন্তা করার ও জীবনযাপনের এক প্রকার উপায় হয়ে

উঠছে)। কীভাবে কেউ ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠা থেকে নিজেকে বিরত করতে পারে? আমাদের কথাবার্তা, আমাদের কাজ, আমাদের হৃদয়, আমাদের আমোদ-আহ্লাদকে কীভাবে আমরা ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্ত করতে পারি? আমাদের আচরণের মধ্যে দৃঢ়প্রোথিত হয়ে থাকা ফ্যাসিবাদকে কীভাবে টুঁড়ে বের করে বিদায় করতে পারি? খৃস্টিয় নীতিকাররা আত্মার গভীরে প্রোথিত দেহমাংসের চিহ্ন টুঁড়ে বের করেছিলেন। দেল্যুজ ও গুয়াতারি দেহের মধ্যে ফ্যাসিবাদের সামান্যতম চিহ্নটিকেও টুঁড়ে ফিরেছেন।

সন্ত ফ্রানসিস ডি সালেস[২]-কে পরিমিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলা যায় যে *অ্যান্টি-ঈদিপাস হল অফ্যাসিবাদী জীবনযাপনের একটি ভূমিকা*।

এই মহান বইটিকে প্রাত্যহিক জীবনযাপনের একটি সারগ্রন্থ বা নির্দেশিকায় পরিণত করতে হলে ইতিমধ্যে বর্তমান বা ক্রম আসন্ন সমস্ত ধরনের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধাচরণ করে জীবনযাপনের শিল্পকে আমি কয়েকটি আবশ্যকীয় নীতির সঙ্গে যুক্ত বলে সারসংকলন করব:

- একমেবাদ্বিতীয়ম হওয়ার দাবি করে এমন সব ধরনের সর্বাত্মকতার ভ্রম-বাতুলতা থেকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকে মুক্ত কর।
- নিয়ত বিস্তারলাভ, অপরাপরকে পাশাপাশি স্থাপন করা ও পৃথককরণের মধ্য দিয়ে ক্রিয়া, ভাবনা ও কামনাকে বিকশিত কর। অধীনস্থের শৃঙ্খলে বিন্যাস বা পিরামিডের চেহারার ধাপবন্দি কাঠামো পরিহার কর।
- আইন, সীমা, নির্বীজকরণ, অভাব, ছায়া-গহ্বর ইত্যাদির মতো পুরানো নঙর্থক প্রতীতি, যেগুলোকে এতাবধিকাল ক্ষমতার একটি রূপ ও বাস্তবকে পাঠ করার উপায় হিসেবে পবিত্র জ্ঞান করা হয়েছে, তাদের প্রতি বশ্যতা কাটিয়ে ওঠ। সদর্থক ও বহুত্বব্যঞ্জক প্রতীতি পছন্দ কর, দৃঢ়নির্মিত কাঠামোর বদলে গতিশীল ব্যবস্থাপনা পছন্দ কর। বিশ্বাস কর যে যা সৃজনশীল তা যাযাবরী চরিত্রের, তা কখনই স্থাণু হতে পারেনা।
- এমনটা ভেব না যে মিলিটান্ট হতে গেলে দুঃখী বিরসবদন হতে হয়। এমনকি অতি ঘৃণ্য বীভৎসার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়েও নয়। বাস্তবের সঙ্গে কামনার সংযোগরেখাই বিপ্লবী বলের অধিকারী (বিবিধ রূপে প্রতিমূর্তিকরণের পশ্চাদগমন বিপ্লবী বলের অধিকারী নয়)।
- একমেবাদ্বিতীয়ম সত্যের উপর রাজনৈতিক চর্চার ভিত স্থাপন করার বাসনায় চিন্তাশক্তি অপব্যয় কোরো না। অপর চিন্তাধারাকে ফাঁপা

দূরকল্পনা হিসেবে হেয় করার জন্য রাজনৈতিক সক্রিয়তার অপব্যয় কোরো না। চিন্তাশক্তিকে আরও তীব্র করার জন্য রাজনৈতিক চর্চাকে ব্যবহার কর। রাজনৈতিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হস্তক্ষেপের কাজে ক্ষেত্র ও রূপের বহুত্ববিধান করার জন্য বিশ্লেষণকে ব্যবহার কর।

- দর্শনে সংজ্ঞাত ব্যক্তিসত্তার 'অধিকারবলী' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার দাবি রাজনীতির কাছে কোরো না। ব্যক্তিসত্তা ক্ষমতার হাতে নির্মিত। যা প্রয়োজন তা হল বহুত্বকরণ, বিবিধ সমবায় ও স্থানান্তরকরণের মধ্য দিয়ে 'ব্যক্তিসত্তাকে নাকচ করা'। ধাপবন্দি কাঠামোর বিভিন্ন ধাপে বিন্যস্ত ব্যক্তিসত্তাদের জৈব ঐক্যবন্ধন হিসেবে যেন কোনও গোষ্ঠী কাজ না করে, বরং ব্যক্তিসত্তা নাকচের প্রক্রিয়াকে যেন অনবরত বহমান রাখা যায়।
- ক্ষমতার আসক্তিতে ডুবে যেও না।

এমনকি এটাও বলা যায় যে দেল্যুজ ও গুয়াতারির ক্ষমতার আসক্তি এতই কম যে তাঁরা তাঁদের নিজেদের প্রতর্কভাষ্যের সঙ্গে যুক্ত ক্ষমতার প্রভাবকেও নিষ্ক্রিয় করতে চেয়েছেন। সেইজন্যই গোটা বই জুড়ে ছড়িয়ে আছে অজস্র কৌতুকরঙ্গ ও ফাঁদ, যা এর অনুবাদকে অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছে। কিন্তু এসব মোটেই অলংকারবাগিশ বাগ্মিতার চেনা ফাঁদ নয় যা তার কৌশল সম্পর্কে পাঠককে সচেতন হতে না দিয়েই বশ করে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত পাঠকের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাকে জিতে নেয়। *অ্যান্টি-ঈদিপাস*-য়ের ফাঁদগুলো রসিকতাজাত— প্রতিটি যেন পাঠককে নিমন্ত্রণ করছে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য, পাঠবস্তু পরিত্যাগ করে দরজাটা সজোরে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। বইটি প্রায়শই সবকিছুকে মজা আর খেলা হিসেবে নিতে প্ররোচিত করে, কিন্তু আদপে খুব প্রয়োজনীয় ও অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আন্তরিকতার সঙ্গে চর্চিত হয়, যা হল: সমস্ত ধরনের ফ্যাসিবাদকে টুঁড়ে বের করা— আমাদের ঘিরে ধরে চূর্ণ করে যে বিপুলাকার ফ্যাসিবাদ, তা থেকে শুরু করে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অত্যাচারী তিক্ততা হয়ে ওঠে যে ক্ষুদ্র পাতি ফ্যাসিবাদ তা অবধি।

১। সন্ত ফ্রানসিস ডি সালেস : সতেরো শতকের জনৈক ধর্মযাজক, জেনেভার বিশপ ছিলেন। উৎ*সর্গীকৃত জীবনযাপনের ভূমিকা*-র লেখক হিসেবে খ্যাত।

উৎস: দেল্যুজ ও গুয়াতারি রচিত অ্যান্টি-ঈদিপাস বইয়ের ভূমিকা। ফরাসি ভাষায় ১৯৭৬ সালে প্রথম প্রকাশিত।

রাজকতা

১৯৭৭ সালে কলেজ দি ফ্রাসঁ-য় দেওয়া ভাষণ

'নিরাপত্তার ব্যবস্থাপত্র' সম্পর্কে পূর্ববর্তী একটি ভাষণে আমি জনসমষ্টি সংক্রান্ত একগুচ্ছ নির্দিষ্ট সমস্যার আবির্ভাব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলাম। আরও খুঁটিয়ে ভাবার পর মনে হয়েছে যে শাসনপ্রণালীর সমস্যাকেও আমাদের বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। সংক্ষেপে বললে, নিরাপত্তা, জনসমষ্টি, শাসনপ্রণালী— এই ক্রম ধরে আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে।

গোটা মধ্যযুগ ও ধ্রুপদী প্রাচীনযুগ ধরে আমরা এমন বহু নিবন্ধের হদিস পাই যেগুলোকে 'রাজপুরুষের প্রতি পরামর্শ' হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। সেই সব নিবন্ধের আলোচনার বিষয় হল: রাজপুরুষের উপযোগী যথাযথ আচরণ, ক্ষমতার চর্চা, সেই রাজপুরুষের দ্বারা তাঁর প্রজামণ্ডলীর কাছ থেকে স্বীকৃতি ও সম্মান আদায় করার উপায়, ঈশ্বরপ্রেম ও ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য, মানুষদের বসতির উপর ঈশ্বরিক বিধি প্রয়োগের বিষয়, ইত্যাদি। কিন্তু আরও চিত্তাকর্ষক বিষয় হল এই যে ষোল শতকের মাঝ বরাবর থেকে আঠারো শতকের শেষ অবধি এমন এক সারি রাজনৈতিক নিবন্ধের বিকাশ ও সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় যেগুলোকে আর 'রাজপুরুষের প্রতি পরামর্শ'-য়ের গোত্রে ফেলা যায় না, আবার ঠিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিবন্ধও তখনও বলা যায় না। এই রাজনৈতিক নিবন্ধগুলো বরং নিজেদেরকে 'শাসনপ্রণালীর কলা' হিসেবে হাজির করেছিল। আমার মনে হয় যে ষোল শতকেই বিবিধ প্রশ্নে আলোচনা থেকে উঠে আসা একটি সাধারণ সমস্যা হিসেবে শাসনপ্রণালীর প্রশ্নটি বড় হয়ে সামনে এসেছিল। যেমন ধরা যাক,

ষোল শতকের স্টোইক (Stoic) পুনরুত্থানের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ ব্যক্তিগত আচরণের প্রশ্নটিকে ধর্মাচরণ-অভ্যাসের সমস্যা হিসেবে দেখার প্রবণতা নিজেকে শাসন করার প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে এল। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট ঘরানার গোটা যাজকীয় মতবাদটা তো আত্মাকে শাসন করা ও জীবনকে শাসন করার প্রশ্নগুলোকে হাজির করে রেখেছিলই। ষোল শতক জুড়ে আবির্ভূত হয়ে ক্রমশ বিকশিত হয়েছিল শিশুদের শাসন করা ও শিক্ষিত করার বহুবিস্তৃত সমস্যাবলী। আর সম্ভবত এই ধারাপ্রবাহে শেষতম যে প্রশ্নটি বিবেচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছিল, তা হল রাজপুরুষের দ্বারা রাজ্যের শাসনের প্রশ্ন। কীভাবে নিজেকে শাসন করতে হয়, কীভাবে শাসন মানতে হয়, কীভাবে অপরদের শাসন করতে হয়, কার দ্বারা শাসন জনগণ মেনে নেবে, সবচেয়ে ভালো শাসক কীভাবে হওয়া যায়— এই সমস্ত প্রশ্ন তাদের নিজস্ব বহুত্ব ও তীব্রতা নিয়ে ষোল শতকের বৈশিষ্ট্য গড়ে দিয়েছিল বলে আমার মনে হয়। বলা যায় যে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়ার নির্বাহপথের সন্ধিক্ষণে এই ষোল শতক দাঁড়িয়ে ছিল। সেই দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমটি হল সামন্ততন্ত্রের কাঠামোকে চূর্ণ করে প্রধান প্রধান এলাকাভিত্তিক, প্রশাসনিক ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর প্রতিষ্ঠা; আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি ধর্মসংস্কার (Reformation) ও ধর্মসংস্কার-বিরোধিতার (Counter-reformation) আবর্তের মধ্য দিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শাসন কীভাবে সম্পন্ন হলে ও ইহজগতে সে কীভাবে চালিত হলে তবে সে চিরতরে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে।

তাহলে আমরা একটা দ্বিমুখী যাত্রা দেখতে পাচ্ছি, যার একটা মুখ হল রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীভবনের দিকে, আর অন্যদিকের মুখটা হল ছড়িয়ে যাওয়া ও ধর্মীয় বিসংবাদের দিকে। আমার বিশ্বাস যে এই দুটি প্রবণতার ছেদবিন্দুতেই কতোটা কঠোরভাবে, কার দ্বারা, কী জন্য, কী কী পদ্ধতিতে শাসন হওয়া উচিত ও কীভাবে শাসনাধীন হওয়া উচিত ইত্যাদি প্রশ্নগুলো এই অদ্ভুত তীব্রতা নিয়ে হাজির হয়েছিল। তার মধ্য দিয়ে শাসনপ্রণালীর সমস্যার সাধরণ রূপটি আমরা পাই।

শাসনপ্রণালী সংক্রান্ত এই বিপুল ও একস্বরীয় সাহিত্য আঠারো শতকের শেষ অবধি বিস্তৃত হয়েছিল। তার মধ্যের রূপান্তরগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টায় আমি অবিলম্বেই যাব, তবে তার আগে খেয়াল করার মতো কিছু বিষয় আমি নজরে আনতে চাই। কারণ এই বিষয়গুলো আজকে আমরা যাকে

শাসনপ্রণালীর রাজনৈতিক রূপ বলি সেই প্রশ্নের সঙ্গে, অর্থাৎ রাষ্ট্রশাসন বলতে কী বোঝায় সেই বাস্তবিক সংজ্ঞা নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এটা করার সরলতম উপায় হল এই সমস্ত সাহিত্যকে একটিমাত্র পাঠবস্তু—মাকিয়াভেলি-র 'দি প্রিন্স'-য়ের বিপরীতে রেখে তুলনা করার পথ অবলম্বন করা। এই শেষোক্ত পাঠবস্তুটি ষোল শতক থেকে আঠারো শতক অবধি সময়কালে কখনওই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যানের বস্তু হয়ে ওঠা থেকে রেহাই পায়নি এবং এর বিপরীতে দাঁড়িয়েই শাসনপ্রণালী সংক্রান্ত গোটা সাহিত্যধারা আপন অবস্থান নির্দিষ্ট করেছিল। এই পাঠবস্তুটির সঙ্গে পরবর্তীকালে তাকে সমালোচনা ও খণ্ডন করে গড়ে ওঠা কাজগুলোর সম্পর্ক চিহ্নিত করার চেষ্টা করা বেশ আগ্রহোদ্দীপক হবে বলেই মনে হয়।

সর্বপ্রথম আমাদের স্মরণ করতে হবে যে মাকিয়াভেলি-র 'দি প্রিন্স' আগাগোড়াই শাপশাপান্তের বস্তু হয়ে থাকেনি, বরং তার সমসাময়িকরা ও অব্যবহিত উত্তরসূরীরা যেমন তাকে সম্মান দিয়েছিল, তেমনই আবার আঠারো শতকের শেষে (বা হয়ত বলা ভাল, উনিশ শতকের গোড়ায়) যখন ওই পূর্বোল্লেখিত শাসনপ্রণালী বিষয়ক সাহিত্যধারা ক্ষীণ হয়ে শুকিয়ে আসছে, সেই মুহূর্তেও তা কদর পেয়েছিল। উনিশ শতকের গোড়ায় 'দি প্রিন্স'-য়ের পুনরাবির্ভাব ঘটল। তা ঘটল বিশেষ করে জার্মানিতে, যেখানে এ. ডবলু. রেহবের্গ, এইচ. লিও, লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কে, কেলেরমান-দের মতো লেখকেরা এই পাঠবস্তুটিকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করার ও ভূমিকা-টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করার কাজ করলেন। ইতালিতেও তার পুনরাবির্ভাব ঘটল। এই ইতালিয় পুনরাবির্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতটি বিশেষভাবে বিশ্লেষণের যোগ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে যেমন একদিকে ছিল নেপোলিয়নের প্রভাব, তেমনই অন্যদিকে ছিল ফরাসী বিপ্লব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপ্লবের সমস্যাবলী দ্বারা উত্থাপিত এই প্রশ্ন যে রাষ্ট্রের উপর শাসকের সার্বভৌমত্ব কীভাবে এবং কী শর্তাধীনে বজায় রাখা যায়। কিন্তু আবার এই পরিপ্রেক্ষিতেই ক্লসউইৎজ-য়ের হাত ধরে রাজনীতি ও কৌশলের মধ্যে সম্পর্কের সমস্যা (যার রাজনৈতিক গুরুত্ব ১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল) এবং বলসম্পর্ক ও বোধগ্রাহ্য যুক্তিসিদ্ধ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতি রূপে বলসম্পর্ককে দেখার সমস্যাও উঠে এসেছিল। আর শেষত, এর যোগ ছিল ইতালিয় ও জার্মান অঞ্চলগত ঐক্যের সমস্যার সঙ্গে, যেহেতু মাকিয়াভেলি তাঁদের একজন ছিলেন যাঁরা ইতালির আঞ্চলিক

ঐক্যকে কী শর্তের দ্বারা পুনরুদ্ধার করা যায় তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছিলেন।

এই ছিল মাকিয়াভেলির পুনরাবির্ভাবের পরিপ্রেক্ষিত। কিন্তু ষোল শতকে মাকিয়াভেলির প্রথম সম্মান-অর্জন এবং আবার উনিশ শতকের গোড়ায় তাঁকে পুনরাবিষ্কারের মধ্যবর্তী সময়পর্যায়ে তাঁর কাজকে ঘিরে যে জটিল ও বহুরূপধারী বিবিধ 'কাণ্ড' ঘটেছিল তাও তো অজানা নয়। কেউ কেউ মাকিয়াভেলির স্পষ্ট প্রশংসা করেছিলেন (যেমন, নওদে, মাচন), অসংখ্যজন তাঁকে সরাসরি আক্রমণ করেছিলেন (ক্যাথলিক উৎস থেকে অ্যামব্রোজিও পলিটি-র Disputationes de Libris a Christiano detestandis, আর প্রোটেস্টান্ট উৎস থেকে ইনোসেন্ট জেন্টিলেট-য়ের লেখা ১৫৭৬ সালে প্রকাশিত Discours sur les moyens de bien gouverner contre Nicolas Machiavel), আর তার সঙ্গে ছিল কিছু পরোক্ষ সমালোচনাও (গুইলম ডি লা পেরিয়ের-য়ের লেখা ১৫৬৭ সালে প্রকাশিত Miroir Politique, ১৫৮০ সালে প্রকাশিত এলিয়ট-য়ের The Governor, ১৫৭৯ সালে প্রকাশিত পি. পারুতা-র Della Perfezione della Vita politica)।

মাকিয়াভেলির লেখা পাঠবস্তু ও সেই পাঠবস্তুর মধ্যে আপত্তিকর ও আমূল বর্জনীয় কী পাওয়া গিয়েছিল— এই গোটা বিতর্কটিকে কেবল তার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখলে হবে না। বিতর্কটি যার সংজ্ঞাকে নির্দিষ্ট রূপে নির্ধারণের চেষ্টা ঘিরে আবর্তিত হচ্ছিল. সেই শাসনপ্রণালীর কলার প্রেক্ষিতে বিতর্কটিকে দেখতে হবে। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের যুক্তিকে কেন্দ্রে রেখে নতুন এক শাসনপ্রণালীর কলার ধারণাকে বেশকিছু লেখক প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং মাকিয়াভেলিবাদ নামে দুর্নাম করেছিলেন। আবার অন্য কিছু লেখক মাকিয়াভেলিকে বর্জন করেছিলেন এটা দেখানোর মধ্য দিয়ে যে শাসনপ্রণালীর এমন এক কলার অস্তিত্ব আছে যা একইসঙ্গে যুক্তিসঙ্গত ও বৈধ আর মাকিয়াভেলি-র 'দি প্রিন্স' সেই অস্তিত্বমান কলার একটা খুঁতময় জাবদা ছবি বা ব্যঙ্গচিত্রই তুলে ধরেছে কেবল। আর সবশেষে ছিল তারা যারা একটি বিশেষ শাসনপ্রণালীর কলার বৈধতা প্রমাণ করার তাগিদে মাকিয়াভেলির লেখার কিছু কিছু অংশকে অন্তত যথার্থ প্রতিপন্ন করার পক্ষে ছিলেন (যেমন লিভি বিষয়ক Discourses সম্পর্কে বলেছিলেন নওদে; আর বাইবেল অনুযায়ী স্বয়ং ঈশ্বর ও তাঁর প্রত্যদিষ্ট দূতরা যেভাবে ইহুদি

জনগণকে পথ দেখিয়েছিলেন, তার থেকে বেশি মাকিয়াভেলিয় আর কিছু হতে পারে না বলে দাবি করা পর্যন্ত গিয়েছিলেন মাচন)।

এই সমস্ত লেখকদের মধ্যে একটা সাধারণ উদ্বেগ কাজ করছিল। সেই উদ্বেগ জন্ম নিয়েছিল শাসনপ্রণালীর কলা সম্পর্কিত এমন এক ধারণা থেকে দূরত্ব তৈরি করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে যে ধারণা থেকে ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি ও ধর্মীয় সমর্থন সরিয়ে নিলে কেবলমাত্র রাজপুরুষের স্বার্থই একমাত্র উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতাবিধানের নীতি হিসেবে পড়ে থাকে। এই সমস্ত বিতর্কে মাকিয়াভেলিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল তা যথাযথ ছিল কিনা সেই প্রশ্ন সরিয়ে রাখা যাক। আমাদের কাছে যা জরুরী তা হল এটাই যে বিতর্কগুলোর মধ্যে শাসনপ্রণালীর কলার অন্তর্নিহিত এমন এক যৌক্তিকতাকে ব্যক্ত করতে চাওয়া হয়েছিল যা শাসনপ্রণালীকে রাজপুরুষ ও অধীনস্থ রাজ্যের সঙ্গে রাজপুরুষের সম্পর্কের সমস্যার অধীন করে তুলবে না।

সুতরাং শাসনপ্রণালীর কলাকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল যাতে তা যেন রাজপুরুষের কোনও বিশেষ সক্ষমতার থেকে আলাদা হয়। কেউ কেউ মাকিয়াভেলির লেখার মধ্যেই তা খুঁজে পেয়েছিল, আবার কেউ তা সেখানে খুঁজে পায়নি। অপর কেউ কেউ আবার এই শাসনপ্রণালীর কলাকেই মাকিয়াভেলিবাদের নয়া রূপ বলে সমালোচনা করেছিল।

'দি প্রিন্স'-য়ের রাজনীতি, তা কাল্পনিক হোক বা না হোক, যা থেকে এই ব্যক্তিরা নিজেদের দূরে রাখতে চাইছিল, তার বৈশিষ্ট্যসূচক হিসেবে বিবেচিত নীতিটি কী? অভিযোগ করা হচ্ছিল যে মাকিয়াভেলির মত অনুযায়ী, রাজপুরুষ তাঁর রাজত্বের সাপেক্ষে বহিঃস্থ ও স্বতন্ত্র অবস্থানে স্থিত, অর্থাৎ তাঁর রাজত্বের নাগালের বাইরের শ্রেষ্ঠতা বা উৎকর্ষের অবস্থানে স্থিত। উত্তরাধিকার অথবা জয়ের মাধ্যমে রাজপুরুষ তাঁর রাজত্ব লাভ করেন, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তিনি তাঁর রাজত্বের অংশ হয়ে যান না, তিনি রাজত্বের নাগালের বাইরে অবস্থান করেন। হিংসা বা পারিবারিক উত্তরাধিকার বা চুক্তি বা অন্যান্য রাজপুরুষদের সঙ্গে মৈত্রীগঠন বা রফা— যেভাবেই রাজত্বের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রটি বাঁধা হয়ে থাকুক না কেন, সেই যোগসূত্রটি নিখাদ কৃত্রিম চরিত্রেরই থেকে যায়, অর্থাৎ, রাজপুরুষের সঙ্গে তাঁর রাজত্বের কোনও মৌলিক, আবশ্যিক, স্বাভাবিক ও বিধিবৈধ যোগসূত্র থাকে না। এর থেকে এই অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে বহিঃস্থ হওয়ার কারণেই যোগসূত্রটি

ভঙ্গুর ও প্রতিনিয়তই বাইরের থেকে সেই রাজত্ব জয় বা পুনর্দখল করতে চাওয়া শত্রুদের আক্রমণের মুখে আর ভিতর থেকে সেই রাজপুরুষের শাসন মেনে চলার কোনও কার্য-কারণ-সম্পর্কে আবদ্ধ না হওয়া প্রজাদের বিদ্রোহের মুখে তা ভেঙে পড়ার ভয় থাকে। শেষত, এই নীতি ও তার অনুসারী অনুসিদ্ধান্ত একটি আবশ্যিক নিষ্পত্তির দিকে ঠেলে দেয়, যা হল: ক্ষমতার চর্চার লক্ষ্য হল রাজত্বকে রক্ষা করা, আরো শক্তিশালী করা ও কায়েম রাখা। এই শেষোক্ত বাক্যটিতে রাজত্ব বলতে প্রজাবৃন্দ ও সীমায়িত অঞ্চলের বস্তুগত যোগকে বোঝাচ্ছে না, বরং রাজপুরুষ তাঁর সম্পত্তি, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বা নিজের জয় করা শাসনের অঞ্চল এবং তাঁর প্রজাদের সঙ্গে যে সম্পর্কে স্থিত, সেই সম্পর্কটিকেই রাজত্ব বলা হচ্ছে। এই ভঙ্গুর সম্পর্ক বা যোগসূত্রটিই হল মাকিয়াভেলি দ্বারা সূত্রায়িত শাসনপ্রণালীর কলা বা রাজপুরুষ হওয়ার কলার কেন্দ্রীয় বিষয়। ফলত, মাকিয়াভেলির পাঠবস্তুতে বিশ্লেষণপ্রক্রিয়া দুটি খাতে বহমান: প্রথমটি হল বিপদগুলোকে শনাক্ত করা (বিপদের উৎস কী, বিপদ কোথায়, বিপদের গুরুত্ব কতটা: কোন বিপদগুলো বড়, কোনগুলো ছোট), আর দ্বিতীয়টি হল বলসম্পর্কগুলোকে প্রভাবিত করা ও কাজে লাগানোর এমন এক শিল্প গড়ে তোলা যা রাজপুরুষকে তাঁর রাজত্ব রক্ষার, অর্থাৎ, তাঁর শাসন-অঞ্চল ও প্রজাদের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষার নিশ্চয়তা দেবে।

মোদ্দা কথায় বলা যায় যে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাকিয়াভেলি-বিরোধী প্রবন্ধ-নিবন্ধে মাকিয়াভেলির 'দি প্রিন্স' আবশ্যিকভাবে রাজপুরুষের রাজত্ব রক্ষা করার ক্ষমতার আলোচনা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আর এই সুপ্রজ্ঞা(savoir-faire)-কেই মাকিয়াভেলি-বিরোধী সাহিত্য শাসনপ্রণালীর কলা নামক নতুনতর কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে চেয়েছে। নিজের রাজত্ব রক্ষা করার সক্ষমতা থাকা এবং শাসনপ্রণালীর কলায় রপ্ত হওয়া মোটেই এক কথা নয়। কিন্তু শাসনপ্রণালীর কলায় রপ্ত হওয়া মানে তাহলে কী? এই প্রশ্নের বিবেচনা, যা তখনও প্রাথমিক ও অপরিপক্ক, আমরা পেতে পারি এই মাকিয়াভেলি-বিরোধী সাহিত্যের সবচেয়ে প্রথমদিককার একটি পাঠবস্তুতে যার লেখক গুইলম ডি লা পেরিয়ের আর নাম Miroir Politique।

মাকিয়াভেলির নিবন্ধের তুলনায় আশাহত করার মতো কৃশতনু এই পাঠবস্তুটিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধারণার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। সবার

প্রথমে ধরা যাক এই প্রশ্নটি যে লা পেরিয়ের'শাসন করা' ও 'শাসক' বলতে ঠিক কী বুঝিয়েছেন? কীভাবে তিনি এগুলোর সংজ্ঞা নির্মাণ করেছেন? তিনি লিখেছেন: 'শাসক বলতে অদ্বিতীয় অধিপতি, সম্রাট, রাজা, রাজপুরুষ, প্রভু, প্রশাসক, প্রধান ধর্মাচার্য, বিচারপতি, বা এমনই আর কিছু বোঝা যেতে পারে।' লা পেরিয়ের-য়ের মতোই অন্যরা যাঁরা শাসনপ্রণালীর কলা নিয়ে লিখেছেন, তাঁরাও প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে 'শাসন করা' বলতে গৃহবাসীজনকে শাসন করা, আত্মাকে শাসন করা, শিশুদের শাসন করা, একটি ভৌগোলিক অঞ্চলকে শাসন করা, ধর্মীয় মঠ শাসন করা, ধর্মীয় গোষ্ঠীকে শাসন করা ও পরিবারকে শাসন করা বোঝায়।

সরল শব্দগত অর্থ সংক্রান্ত এই পর্যবেক্ষণগুলোর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দ্যোতনা আছে। অন্তত এই লেখকেরা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা অনুযায়ী মাকিয়াভেলির রাজপুরুষ সংজ্ঞানুযায়ী তাঁর রাজত্বে অদ্বিতীয় এবং সেই রাজত্বের সাপেক্ষে বহিঃস্থ ও নাগালছাড়া শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থানে স্থিত। অন্যদিকে আমরা দেখছি যে শাসনপ্রণালীর চর্চা যেমন বহুবিধ ও তার সঙ্গে বহু ধরনের মানুষ জড়িত— যেমন, পরিবারের মাথা, ধর্মীয় মঠের গুরু, শিশু বা শিক্ষার্থীর শিক্ষক বা প্রশিক্ষক জড়িত— যার ফলে শাসনপ্রণালী বহুবিধ রূপ ধরে কাজ করে, যেগুলোর মধ্যে রাজপুরুষের সঙ্গে তাঁর রাজত্বের সম্পর্ক কেবলমাত্র একটি বিশেষ ব্যবস্থার বিষয়; আর এই শেষোক্ত রাজপুরুষ-রাজত্ব সম্পর্ক ছাড়া শাসনপ্রণালীর বাকি সবগুলো রূপই রাষ্ট্র বা সমাজের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সমাজের অভ্যন্তরেই পিতা পরিবারকে শাসন করে, গুরু ধর্মীয় মঠকে শাসন করে, ইত্যাদি। সুতরাং একই সঙ্গে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে শাসনপ্রণালীর রূপের বহুত্ব এবং এই রূপগুলো যে সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট সেই চরিত্র: শাসনপ্রণালীগত ক্রিয়ার এই বহুত্ব ও অন্তর্নিবিষ্ট চরিত্র মাকিয়াভেলির রাজপুরুষের শ্রেষ্ঠত্বমণ্ডিত স্বাতন্ত্র্যের চরিত্রের থেকে মৌলিকভাবেইআলাদা।

রাষ্ট্র ও সমাজের অভ্যন্তরে অন্তর্বুনন তৈরি করা শাসনপ্রণালীর এই সকল রূপগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ যথাযথ রূপ থাকে যা গোটা রাষ্ট্রের উপর সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য শাসনের বিশেষ রূপটি নির্ধারণ করে দিতে চায়। তাই শাসনপ্রণালীর কলার বিভিন্ন রূপের স্থানিক সম্পর্কের একটি বিবরণ দেওয়ার চেষ্টায় ঠিক এর পরের শতকেই লা মথে লে ভেয়ার তাঁর রচিত একটি পাঠবস্তুতে (ফরাসী রাজপরিবার দওফাঁ-র জন্য তৈরি করা

শিক্ষামূলক নিবন্ধে) বলেছিলেন যে মৌলিকভাবে তিন ধরনের শাসনপ্রণালী হয়, যার প্রতিটি ধরন একটি বিশেষ বিজ্ঞান বা জ্ঞানশাখার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে, সেগুলো হল: স্বশাসনের কলা যা সদাচার-সুনীতির সঙ্গে যুক্ত, পরিবারকে উপযুক্ত শাসন করার কলা যা অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত, আর শেষতম হল রাষ্ট্রশাসন করার কলা যা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। সদাচার-সুনীতি বা অর্থনীতির তুলনায় নিশ্চিতভাবেই রাজনীতির কিছু নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র চরিত্র আছে, লা মথে লে ভেয়ার সেগুলোকেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন। স্থানিক সম্পর্ক-বিবরণের এই নকশা নিরপেক্ষ ভাবেই যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে শাসনপ্রণালীর এই তিনটি ধরন একে অপরের সঙ্গে একটি আবশ্যিক অবিচ্ছেদ্যতা তৈরি করে এবং তার মধ্য দিয়েই শাসনপ্রণালীর কলার চরিত্র নির্ধারিত হয়।

এর মানে হল এই যে রাজপুরুষের মতবাদ এবং সার্বভৌমত্বের বিচারবিধি-সংক্রান্ত তত্ত্ব রাজপুরুষের ক্ষমতার সঙ্গে ক্ষমতার অন্যান্য রূপের পার্থক্যরেখা টানার নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে কারণ তাদের কাজই হল এই পার্থক্যকে ব্যাখ্যাসমেত যুক্তিসিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠা করা ও তার মধ্য দিয়ে ক্ষমতারূপগুলোর মধ্যে একটি আবশ্যিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা। আর ঠিক তখনই ক্ষমতারূপগুলোর মধ্যে উপর ও নিচ উভয় দিকেই একটি অবিচ্ছিন্নতা বা অবিচ্ছেদ্যতা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে শাসনপ্রণালীর কলার আবশ্যকীয় কাজ।

উপর দিকে অবিচ্ছিন্নতার অর্থ হল: যে ভালো ভাবে রাষ্ট্রশাসন করতে চায়, তাকে আগে শিখতে হবে কীভাবে নিজেকে শাসন করতে হয়, নিজের জিনিষপত্র ও পৈতৃক সম্পত্তি শাসন করতে হয়, যার পর সে রাষ্ট্রশাসনে সাফল্য পেতে পারে। এই ঊর্ধগামী রেখা রাজপুরুষের শিক্ষাক্রমের চরিত্র ঠিক করে দেয়, যা সেই সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য হতো, লা মথে লে ভেয়ার-য়ের রচিত পাঠবস্তুও যার সাক্ষ্য দিচ্ছে। দওফাঁ-দের জন্য তিনি প্রথমে সদাচার-সুনীতি বিষয়ে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন, তারপর যথাক্রমে অর্থনীতির উপর একটি বই ও রাজনীতি বিষয়ে নিবন্ধ লেখেন। সুতরাং, রাজপুরুষের শিক্ষাগত প্রশিক্ষণই ক্ষমতারূপগুলোর ঊর্ধমুখী অবিচ্ছিন্নতাকে রক্ষা করবে বলে ধরা হয়েছিল। অপরদিকে, আমরা নিম্নমুখী অবিচ্ছিন্নতাকে এই অর্থে বুঝতে পারি যে একটি সুশাসিত রাষ্ট্রে পরিবারের মাথার জানা থাকবে কীভাবে পরিবারের দেখভাল করতে হয় এবং নিজ

জিনিষপত্র ও পৈতৃক সম্পত্তির দেখভাল করতে হয়, যার ফলস্বরূপ আবার প্রতিটি ব্যক্তিও সদাচারমতে আচরণ করবে। নিম্নগামী এই রেখা যা ব্যক্তিগত আচরণ ও পরিবার-পরিচালনার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র-সুশাসনের মতো একই নীতি সঞ্চারিত করে, তাকে ঠিক এই সময় থেকেই 'পুলিশ' নামে ডাকা শুরু হয়। সুতরাং, শাসনপ্রণালীর রূপগুলোর মধ্যে ঊর্ধ্বমুখী অবিচ্ছিন্নতা রাজপুরুষের শিক্ষাগত প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করা হবে আর নিম্নমুখী অবিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করা হবে পুলিশের মধ্য দিয়ে। আর এই অবিচ্ছিন্নতার মাঝামাঝি অবস্থানে ছিল পরিবারের শাসনপ্রণালী, যাকে 'অর্থনীতি' নামে অভিহিত করা হয়েছিল।

এই পাঠবস্তুতে প্রতিভাত শাসনপ্রণালীর কলা আবশ্যকীয়ভাবে যে প্রশ্নটিকে ঘিরে বিস্তারিত হয়েছে তা হল: কীভাবে এই অর্থনীতিকে—অর্থাৎ, পরিবারের মধ্যের ব্যক্তিবর্গ, জিনিষপত্র ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করার সঠিক উপায়কে (যা একজন ভালো পিতার তাঁর স্ত্রী, সন্তান ও দাস-দাসীদের সাপেক্ষে করার কথা) ও পরিবারের সৌভাগ্যবৃদ্ধির উপায়কে—এবং পরিবারের প্রতি পিতার অতি যত্নবান মনোযোগকে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার কাজেও প্রবর্তন করা যায়।

আমার মতে, রাজনৈতিক চর্চার মধ্যে অর্থনীতির প্রবর্তনার এই বিষয়টিই হল শাসনপ্রণালীকলা প্রতিষ্ঠার আবশ্যকীয় বিচার্য বিষয়। আর তা যেমন ষোল শতকের জন্য প্রযোজ্য, তেমনই আঠারো শতকেও তার অন্যথা হয়নি। রুশো-র এনসাইক্লোপিডিয়াতেও 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' শীর্ষক লিপিবদ্ধকরণে সমস্যাটিকে একই পারিভাষিক অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এখানে তিনি মোদ্দায় বলেছিলেন যে সবার সাধারণ হিতার্থে পরিবারকে বিচক্ষণ ভাবে শাসন করা বোঝাতেই 'অর্থনীতি' শব্দটি যথার্থ অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেটাই এই শব্দের প্রকৃত আদি অর্থ। রুশো লিখেছিলেন, কীভাবে তাকে প্রয়োজনীয় অদল-বদল করে নিয়ে এবং সবরকম বিচ্ছিন্নতা (যা আমরা এর পরে আলোচনা করব) সত্ত্বেও রাষ্ট্রের সাধারণ পরিচালনাকাজে প্রবর্তিত করা যায়, সমস্যাটা সেখানেই। সুতরাং একটি রাষ্ট্রকে পরিচালনা করার মানে দাঁড়ায় অর্থনীতির প্রয়োগ করা, গোটা রাষ্ট্রের স্তরে অর্থনীতির একটা রূপ খাড়া করা। তার অর্থ হল সেই রাষ্ট্রের সকল অধিবাসী, তাদের সম্পদ ও তাদের আচরণকে এমন এক ধরনের নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে নিয়ে আসা যা সতর্ক মনোযোগ নিয়োগের

বিচারে একজন পরিবারের মাথার তার পরিবার ও জিনিষপত্রের উপর নিয়োজিত মনোযোগের সমতুল হবে।

আঠারো শতকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত একটি শব্দবন্ধ এই ভাবনাকে বেশ ভালোভাবে প্রকাশ করে: ফ্রাঁসোয়া কুয়েসনে বলেছিলেন যে ভালো শাসনপ্রণালীর মানেই হল 'অর্থনৈতিক শাসনপ্রণালী'। এই 'অর্থনৈতিক শাসনপ্রণালী' শব্দবন্ধটি পুনরুক্তিমূলক হয়ে ওঠে কারণ শাসনপ্রণালীর কলা তো অর্থনীতির ধাঁচা অনুযায়ী ও অর্থনীতির রূপগুলোকে অবলম্বন করে ক্ষমতাচর্চার কলা বৈ আর কিছু নয়। তাহলে কুয়েসনে 'অর্থনৈতিক শাসনপ্রণালী'-র কথা বলছেন কেন? এই কারণের বিশদ ব্যাখ্যায় আমরা একটু পরে যাব, কিন্তু কারণটি হল এই যে 'অর্থনীতি' শব্দটি তখন একটি আধুনিক অর্থ আহরণ করার প্রক্রিয়ায় আছে, আর সেই মুহূর্তেই ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে অর্থনীতির রূপগুলোকে অবলম্বন করে ক্ষমতাচর্চার যে কলাকে শাসনপ্রণালীর নিখাদ সারবস্তু বলা যায়, তার প্রধান লক্ষ্য হল সেটাই যাকে আমরা বর্তমানে 'অর্থনীতি' বলে বুঝতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি।

ষোল শতকে যে 'অর্থনীতি' শব্দটা শাসনপ্রণালীর একটি রূপকে বোঝাত, সেই শব্দটাই আঠারো শতকে এসে জটিল এক সারি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবতার একটি স্তর বা হস্তক্ষেপ করার একটি ক্ষেত্রকে বোঝাতে শুরু করল। এই এক সারি জটিল প্রক্রিয়া আমাদের ইতিহাসে মৌলিক গুরুত্বের অবস্থান নিয়ে আছে বলে আমি মনে করি।

গুইলম ডি লা পেরিয়ের-য়ের বই থেকে দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমি আলোচনা করতে চাই তা এই বাক্যবন্ধটিতে বিধৃত: 'শাসনপ্রণালীর মানে হল বস্তুসমূহকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করা, এমনভাবে সাজানো যাতে তা সুবিধাদায়ী হয়।'

এই বাক্যটিকে আমি আরেকটি পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যুক্ত করে বিচার করতে চাই। শাসনপ্রণালী হল বস্তুসমূহকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করা। এই 'বস্তুসমূহ' শব্দটির কাছে আমি খানিক্ষণ থামতে চাইব। মাকিয়াভেলির ভাবনায় রাজপুরুষের ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যসূচক হিসেবে বস্তুসমূহের যে সমাহার চিহ্নিত হয়েছিল তার কথা ভাবলে আমরা দেখব যে মাকিয়াভেলির মতে এই বস্তু (ও এক অর্থে ক্ষমতার নিশানা) হল দুটি— একদিকে সীমায়িত অঞ্চল, আর অন্যদিকে সেই অঞ্চলের অধিবাসীরা। এই দিক থেকে দেখলে, সেই মধ্যযুগ থেকে ষোল শতক অবধি জনবিধির পরিসরে সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা

নির্মাণ করেছিল বিচারবিধি সংক্রান্ত যে নীতি মাকিয়াভেলি কেবলমাত্র তাকে তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য বিধান করার উপযোগী করে নিয়েছিলেন। সেই নীতি অনুযায়ী সার্বভৌমত্ব বস্তুসমূহের উপর প্রযুক্ত হয় না, বরং, সর্বোপরি তার প্রয়োগ ঘটে একটি সীমায়িত অঞ্চলের উপর এবং তার মধ্য দিয়ে সেই অঞ্চলে বসবাসকারী প্রজাদের উপর। এই অর্থে আমরা বলতে পারি যে অধিকার বিষয়ক দার্শনিক ও তাত্ত্বিকদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত বিচারবিধিগত সার্বভৌমত্ব এবং মাকিয়াভেলি-বর্ণিত রাজত্ব, উভয়ের ক্ষেত্রেই সীমায়িত অঞ্চল হল মৌল উপাদান। অবধারিতভাবেই এই সীমায়িত অঞ্চল উর্বর হতে পারে বা অনুর্বর হতে পারে, জনবসতি ঘন বা বিরল-বিক্ষিপ্ত হতে পারে, বাসিন্দারা ধনী বা দরিদ্র, কর্মঠ বা অলস হতে পারে, কিন্তু এই সব উপাদানই সীমায়িত অঞ্চলের সাপেক্ষে কিছু চলরাশি মাত্র; সীমায়িত অঞ্চলটিই রাজত্ব বা সার্বভৌমত্বের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এর বিপরীতে, লা পেরিয়ের-য়ের পাঠবস্তুতে আমরা দেখি যে শাসনপ্রণালীর সংজ্ঞায় সীমায়িত অঞ্চলের কোনও উল্লেখই নেই, 'বস্তুসমূহকে' শাসন করার কথা আছে। কিন্তু এর মানে কী? এর মানে কি মানুষের বিপরীতে বস্তুকে উপস্থাপিত করা? আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয় যে এর মধ্য দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে শাসনপ্রণালীর কাজ সীমায়িত অঞ্চলকে নিয়ে নয়, বরং মানুষ ও বস্তুকে নিয়ে গঠিত এক জটিল সমাহারকে নিয়েই তার কাজ। এই অর্থে শাসনপ্রণালীর ভাবনার বিষয় হল মানুষরা, কিন্তু কী ধরনের মানুষ তারা? এই মানুষরা এমন যারা পারস্পরিক সম্পর্কে বা যোগসূত্রে বাঁধা। তারা সম্পদ, সংগতি, জীবনধারণের উপায়, আবহাওয়া-সেচ-উর্বরতার মতো বিবিধ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমন্বিত সীমায়িত অঞ্চল ইত্যাদি বস্তুসমূহের সঙ্গে গায়ে-লাগালাগি করে বিন্যস্ত। প্রথা, অভ্যাস, ভাবার ও কাজ করার রীতির মতো অন্যান্য বস্তুসমূহের সঙ্গে তারা সম্পর্কযুক্ত। আর শেষত, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মৃত্যু ইত্যাদি দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যের মতো আরও অন্যান্য বস্তুসমূহের সঙ্গেও তারা সম্পর্কিত। মানুষ ও বস্তুসমূহের এই পরস্পরের উপর চেপে থাকা বিন্যাসই যে শাসনপ্রণালীর ভাবনার বস্তু তা শাসনপ্রণালী সংক্রান্ত এই নিবন্ধসমূহে ব্যবহৃত একটি রূপকের মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় বলে আমার মনে হয়। এই রূপক হলো একটি জাহাজের রূপক। একটি জাহাজ শাসন করার মানে কী? স্পষ্টতই তার মানে হল যেমন একদিকে নাবিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখা, তেমনই অন্যদিকে জাহাজ ও তাতে বাহিত মালপত্রের উপর

নিয়ন্ত্রণ রাখা। জাহাজের দেখভাল করা মানেই বাতাস, পাথর ও ঝড়ের হিসাব রাখা ও মোকাবিলা করা। নাবিকের দল (যাদের তত্ত্বাবধান করতে হবে); জাহাজ (যার তত্ত্বাবধানে ফাঁক রাখা চলবে না) জাহাজের মাল (যা নিরাপদে বন্দরে পৌঁছে দিতে হবে); আর বাতাস, পাথর, ঝড়ের মতো আকস্মিকতায় ভরা সব সম্ভাব্যতা— এই সবকিছুকে সম্পর্কের বাঁধনে বাঁধার কাজ জাহাজ-শাসনের অঙ্গ। একটি পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। একটি গার্হস্থ্য বা পরিবারকে শাসন করা মানেই আবশ্যিকভাবে পারিবারিক সম্পত্তিকে রক্ষা করা নয়; পরিবার-শাসনের বিষয় হল সেই পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তি, তাদের সম্পদ ও সচ্ছলতা। জন্ম বা মৃত্যুর মতো প্রভাব ফেলে যেতে পারে এমন যে কোনও বিষয়কে হিসেবের মধ্যে রাখা ও মোকাবিলা করা, অন্য কোনও পরিবারের সঙ্গে সম্ভাব্য যোগস্থাপনের মতো আরও যা সব করণীয় বা করা যেতে পারে তার খেয়াল রাখা, এহেন সাধারণ ব্যবস্থাপনার রূপই শাসনপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য। এর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে, পরিবারের ক্ষেত্রে ভূমিসম্পদের প্রশ্ন আর রাজপুরুষের কাছে সীমায়িত অঞ্চলের উপর সার্বভৌমত্ব আহরণের প্রশ্ন আপেক্ষিকভাবে গৌণ প্রশ্ন হয়ে যায়। মানুষ ও বস্তুসমূহের জটিল সমাহার আবশ্যিক গুরুত্ব নিয়ে সামনে উঠে আসে; আর তার একাধিক পরিবর্তমান দিকের কেবলমাত্র অন্যতম একটি হিসেবেই সম্পত্তি ও সীমায়িত অঞ্চল প্রতিভাত হয়।

এই যে বস্তুসমূহের শাসনপ্রণালীর ভাবনা লা পেরিয়ের-য়ের মধ্যে আমরা পাই, সতেরো ও আঠারো শতকেও তার দেখা মেলে। ফ্রেডেরিক দি গ্রেট তাঁর 'অ্যান্টি-মাকিয়াভেল' বইয়ে এই নিয়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য লেখা লিখেছেন। যেমন ধরা যাক, তিনি লিখেছেন: হল্যান্ডের সঙ্গে রাশিয়ার তুলনা করা যাক; ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাশিয়া সর্ববৃহৎ অঞ্চলের অধিকারী হতে পারে, কিন্তু সেই অঞ্চলের অধিকাংশটাই জলাজমি, জঙ্গল আর মরুভূমি যেখানে কাজকর্ম-শিল্পোৎপাদন-হীন অভাবী মানুষদের বাস; অন্যদিকে হল্যান্ডের কথা ধরলে, তার অঞ্চল খুব ছোট, তাও মূলত জলাভূমি, কিন্তু এমন জনসমষ্টি, সম্পদ ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সে অধিকারী যা তাকে ইউরোপের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র করে তুলেছে, যা হতে এখনও রাশিয়ার অনেক দেরি আছে।

তাহলে, শাসন করার অর্থ হল বস্তুসমূহকে শাসন করা। আগেই উদ্ধৃত করা লা পেরিয়ের-য়ের উক্তিটিকে আবার বিবেচনা করা যাক: 'শাসনপ্রণালীর মানে হল বস্তুসমূহকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করা, এমনভাবে সাজানো যাতে তা সুবিধাদায়ী হয়।' বলা যেতে পারে যে শাসনপ্রণালীর একটি নিজস্ব অন্ত আছে আর আমার বিশ্বাস যে এই দিক থেকেও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে তার স্পষ্ট পার্থক্য টানা যায়। অবশ্যই আমি এমন বোঝাতে চাইছি না যে দার্শনিক ও বিচারবিধি-বিষয়ক পাঠবস্তুসমূহে সার্বভৌমত্বকে একটি নিখাদ ও সরল অধিকার হিসেবে হাজির করা হয়েছে। কোনও ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ বা ততোধিক নিশ্চিতভাবে কোনও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ কখনওই এমন বলেননি যে কাঙ্খিত উদ্দেশ্যের বিচার নিরপেক্ষভাবে কোনও বৈধ সার্বভৌম ক্ষমতাচর্চার অধিকারী হতে পারে। ভালো সার্বভৌম হতে গেলে তাকে সর্বদা 'সর্বসাধারণের মঙ্গল ও পরিত্রাণ'-কে নিজ লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ সতেরো শতকের শেষদিকের একজন লেখককে ধরা যাক। পুফেনডর্ফ বলছেন: 'তাদের (শাসকদের) উপর সার্বভৌম প্রাধিকার অর্পিত হয় কেবলমাত্র এই জন্য যাতে তারা তা ব্যবহার করে জনহিতকর ব্যবস্থা কায়েম বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে।' নিজের সুবিধার জন্য শাসকের কিছু করার ঝোঁক থাকবে না যদি না তা রাষ্ট্রের জন্যও সুবিধাজনক হয়। ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞরা সার্বভৌমত্বের উদ্দেশ্য হিসেবে এই যে সর্বসাধারণের মঙ্গল ও পরিত্রাণের কথা বলেছেন, তা বলতে কী বোঝায়? ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞরা প্রকৃত যে অন্তর্বস্তু এই শব্দগুলোর মধ্যে পুরেছেন তা খুঁটিয়ে দেখলে আমরা দেখব যে 'সর্বসাধারণের মঙ্গল' বলতে এমন একটা পরিস্থিতিকে বোঝানো হচ্ছে যেখানে বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত প্রজা আইন মেনে চলে, তাদের কাছে যা প্রত্যাশিত সেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে, তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া পেশা চর্চা করে এবং যে মাত্রায় তাদের উপর প্রযুক্ত শাসন প্রকৃতি ও মানুষের উপর ঈশ্বর দ্বারা আরোপিত বিধিনিয়মের অনুসারী, সে মাত্রাতেই তারা সেই প্রতিষ্ঠিত শাসনকে সম্মান করে চলে। অন্যকথায় বললে, 'সর্বসাধারণের মঙ্গল' মানে হল আইনের কাছে আবশ্যিক বাধ্যতা— সে আইন ইহজাগতিক সার্বভৌমেরই হোক বা পরম সার্বভৌম ঈশ্বরেরই হোক। সার্বভৌমত্বের উদ্দেশ্যসূচক এই সর্বসাধারণের মঙ্গল আসলে মোদ্দা কথায় সার্বভৌমত্বের কাছে বশ্যতা-বাধ্যতা বৈ আর কিছু নয়। এর মানে দাঁড়ায় যে সার্বভৌমত্বের চর্চাই হল

সার্বভৌমত্বের উদ্দেশ্য। আইনের বশ্যতা-বাধ্যতা হল ভালো, সুতরাং সার্বভৌমত্বের জন্য ভালো হল যে মানুষজন তার বশ বা বাধ্য হয়ে থাকবে। এর মধ্য দিয়ে আবশ্যিকভাবে বদ্ধ একটি বৃত্ত তৈরি হয়; যে তাত্ত্বিক কাঠামো, নৈতিক যাথার্থ্য বা বাস্তবিক প্রভাবই তা অবলম্বন করুক না কেন, তা মাকিয়াভেলির সেই উক্তির খুব কাছাকাছি পৌঁছে যায় যখন মাকিয়াভেলি বলেন যে রাজপুরুষের প্রধান লক্ষ্য হল তার রাজপুরুষত্ব রক্ষা করা, অর্থাৎ, রাজত্বের উপর তার শাসনের অধিকার রক্ষা করা। সার্বভৌমত্ব বা রাজত্বের ধারণায় আমরা ঘুরেফিরে কেবল আত্মপানে নির্দেশ করার এই বৃত্তীয় বদ্ধতায় আটকে পড়ি।

এখন, লা পেরিয়ের-য়ের মধ্যে শাসনপ্রণালীর নতুন সংজ্ঞানির্মাণের যে প্রচেষ্টা আমরা পাই, তার মধ্য দিয়ে একটি নতুন অন্তকে উঠে আসতে দেখা যায় বলে আমার বিশ্বাস। এখানে শাসনপ্রণালীর মানে হল বস্তুসমূহকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করা, এমনভাবে সাজানো যার উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের মঙ্গলসাধন (ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞদের শাস্ত্রে যেমনটা ধরা হয়) নয়, বরং তার উদ্দেশ্য হল শাসনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বস্তুর 'সুবিধা' সাধন। এর ফলে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আর এক থাকে না, বহু হয়ে ওঠে: যেমন, শাসনপ্রণালীকে সর্বোচ্চ সম্ভব পরিমাণে সম্পদের উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে, মানুষজন যাতে জীবনধারণের উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে পায় তার যোগান নিশ্চিত করতে হবে, জনসমষ্টির পুনরুৎপাদন/নবীকরণ যাতে বহাল থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে, ইত্যাদি। সুতরাং শাসনপ্রণালীর উদ্দেশ্য হিসেবে এক সারি নির্দিষ্ট অন্ত উঠে আসছে। আর এই বিবিধ অন্ত সম্পন্ন করার জন্য বস্তুসমূহকে বিন্যস্ত করতে হবে। এখানে 'বিন্যস্ত করা' শব্দবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ। সার্বভৌমত্বের কাঙ্খিত লক্ষ্য ছিল আইনের প্রতি বশ্যতা-বাধ্যতা আর সেই লক্ষ্যপূরণের হাতিয়ার ছিল স্বয়ং আইনই, ফলত আইন এবং সার্বভৌমত্ব ছিল অবিভাজ্য। কিন্তু তার বিপরীতে, এখানে শাসনপ্রণালীর প্রশ্নটি আইন আরোপ করাকে ঘিরে নয়, বরং বস্তুসমূহের বিন্যাস করাকে ঘিরে: অর্থাৎ, আইন প্রয়োগ করার চেয়ে তা বরং কৌশল প্রয়োগ করার প্রশ্ন, আর এমনকি স্বয়ং আইনগুলোকেও কৌশল হিসেবে ব্যবহার করার প্রশ্ন। এখানে প্রশ্নটি হল নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু উপায় অবলম্বন করে বস্তুদের এমনভাবে বিন্যস্ত করা যাতে অমুক বা তমুক উদ্দেশ্যটি সাধিত হয়।

আমার মনে হয় যে আমরা এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিকালকে দেখছি। সার্বভৌমত্বের অন্ত ছিল তার অন্তঃস্থ এবং আইনের রূপ ধরা সেই অন্তসাধনের হাতিয়ারগুলোও তার নিজেরই জিম্মায় ছিল। অন্যদিকে, শাসনপ্রণালীর অন্ত তার অন্তঃস্থ নয়, তা নিহিত আছে সেই বস্তুসমূহের মধ্যে যাদের ব্যবস্থাপনা তার কর্তব্য, তা নিহিত আছে তার পরিচালিত প্রক্রিয়াসমূহের প্রকৃষ্টকরণ ও তীব্রতাদানের মধ্যেও। আর আইনের বদলে একসারি বিবিধরূপী কৌশলই এখন শাসনপ্রণালীর হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। শাসনপ্রণালীর পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করলে, আইন আর তত গুরুত্বপূর্ণ নয়: সতেরো শতকে এই ভাবনাকে আমরা প্রায়ই প্রকাশিত হতে দেখি, আর আঠারো শতকে এসে ফিজিওক্র্যাটদের লেখাপত্রের মধ্য দিয়ে তা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হল যখন তাঁরা ব্যাখ্যা করে বললেন যে আইনকেই শাসনপ্রণালীর লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে অবলম্বন করা বিধেয় নয়।

শেষে আমি লা পেরিয়ের-য়ের লিখিত পাঠ্যবস্তু নিয়ে চতুর্থ একটি মন্তব্য করতে চাই। লা পেরিয়ের বলেছেন যে একজন ভালো শাসক হতে গেলে প্রয়োজনীয় গুণগুলো হল ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও অধ্যবসায়। ধৈর্য বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন? তা ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি মৌমাছিদের রাজা ভ্রমরের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: ভ্রমর হুলের ব্যবহার না করেই মৌচাক শাসন করতে পারে আর এই ভ্রমরের উদাহরণের সৃষ্টি করেই ঈশ্বর তাঁর হেঁয়ালিভরা পথে আমাদের এই শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে ভালো শাসকের ক্ষমতাপ্রয়োগের জন্য কোনও হুলের প্রয়োজন হয় না— অর্থাৎ, মারণাস্ত্র, তরবারি দরকার হয় না; একজন ভালো শাসকের ক্রোধ নয়, ধৈর্য থাকতে হবে; হত্যা করার অধিকার বা বলপ্রয়োগের অধিকার প্রয়োগের ঝোঁক কোনও শাসকচরিত্রের সারবস্তু হতে পারে না। আর এই হুলের অনুপস্থিতির সঙ্গী হিসেবে সদর্থক কোন গুণগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে? প্রজ্ঞা ও অধ্যবসায়। প্রজ্ঞা-র যে পরম্পরাগত অর্থ, অর্থাৎ, ঈশ্বরিক ও মানবিক নিয়মবিধি বা আইন সম্পর্কে জ্ঞান, ন্যায়বিচার ও সমতাবিধান সম্পর্কে জ্ঞান, সেই অর্থে 'প্রজ্ঞা' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এখানে 'প্রজ্ঞা' শব্দটির অর্থ হল বস্তুসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান, কাঙ্খিত লক্ষ্য সম্পর্কে জ্ঞান এবং সেই লক্ষ্যসাধনের জন্য বস্তুসমূহের যে বিন্যাস প্রয়োজন তার সম্পর্কে জ্ঞান: এই জ্ঞানই সার্বভৌমের প্রজ্ঞা গঠন করবে বলে ভাবা হয়েছে। আর সার্বভৌম শাসকের অধ্যবসায় বলতে কী বোঝানো হয়েছে? অধ্যবসায় বলতে

এই নীতিকে বোঝানো হয়েছে যে শাসিতদের সেবাতেই শাসক নিয়োজিত এই ভাবনা থেকেই শাসক তার শাসনকাজ চালাবে। আর এখানে, আবারও, লা পেরিয়ের এমন একজন পরিবারের মাথার উদাহরণ সামনে রেখেছেন যিনি সকালে সবার আগে ঘুম থেকে ওঠেন আর রাতে সবার পরে ঘুমোতে যান, যিনি গার্হস্থ্য সমস্ত বিষয়ে নজর দেন কারণ তিনি মনে করেন যে পরিবারের সেবাই তাঁর কাজ। স্পষ্টতই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে শাসনপ্রণালীর এহেন চরিত্রায়ন সেই রাজপুরুষের চরিত্রায়ন থেকে কতটা আলাদা যা মাকিয়াভেলি লিখেছিলেন বা মাকিয়াভেলির লেখায় অন্যরা পাঠ করেছিলেন। অবশ্য সন্দেহ নেই যে শাসনপ্রণালী সম্পর্কে এই ধারণা অভিনব হলেও তখনও বেশ অপরিপক্ক অবস্থাতেই এখানে বিধৃত হয়েছিল।

শাসনপ্রণালীর কলা সম্পর্কে ভাবনা ও তত্ত্বের এই রূপরেখা ষোল শতকে এসে আর কেবলমাত্র একটি নিখাদ বিমূর্ত প্রশ্ন রইল না আর কেবল রাজনৈতিক তাত্ত্বিকদের মাথা ঘামানোর বিষয় থাকল না। আমার মনে হয় যে রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে তার যেগাযোগগুলোও আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। সীমায়িত অঞ্চলভিত্তিক রাজতন্ত্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপত্র গঠন ও শাসনপ্রণালীগত ব্যবস্থাপত্রের উদ্ভবের সঙ্গে শাসনপ্রণালীর কলা সম্পর্কিত তত্ত্ব সংযুক্ত হয়ে গেল। ষোল শতকের শেষদিকে বিকশিত হতে শুরু করা ও সতেরো শতকে ক্রমশ আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা এক গুচ্ছ বিশ্লেষণ ও জ্ঞানরূপের সঙ্গেও তা সংযুক্ত হয়েছিল। এই বিশ্লেষণ বা জ্ঞানরূপগুলো আসলে ভিন্ন ভিন্ন সকল উপাদান, মাত্রা, ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য বা প্রশ্নের সাপেক্ষে রাষ্ট্র সম্পর্কে জ্ঞানের কারবারি,'পরিসংখ্যান' নামে অভিহিত হয়ে তা আসলে রাষ্ট্রের বিজ্ঞান হয়ে উঠেছিল। শেষত, সংযুক্তির একটি তৃতীয় দিক হিসেবে শাসনপ্রণালীর কলার সঙ্গে বাণিজ্যতন্ত্রবাদ (mercantilism) এবং ক্যামেরালিস্ট-দের পুলিশ বিষয়ক বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগও খেয়াল করা যায়।

খুব সংক্ষিপ্ত রূপরেখায় হাজির করলে বলা যায়: ষোল শতকের শেষভাগে এবং সতেরো শতকের প্রথমদিকে শাসনপ্রণালীর কলা তার প্রথম দানা বাঁধা রূপ ধারণ করে, এই রূপটি রাষ্ট্রের যুক্তিকে ঘিরে দানা বেঁধেছিল। বর্তমানকালে আমরা যে নঙর্থক ও ক্ষতিকারক অর্থ রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করে থাকি (যে অর্থে রাষ্ট্র তার স্বার্থপূরণ করতে ন্যায়, সমতা ও মানবতার নীতিকে লঙ্ঘন করে থাকে), সেই যুক্তি নয়, বরং সদর্থক ও পূর্ণতাবোধক অর্থে সেই

যুক্তি ছিল: যুক্তিযুক্ত নীতির দ্বারা রাষ্ট্র শাসিত হয়, সেই নীতিগুলো রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত এবং সেগুলো কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বা ঈশ্বরিক নিয়ম থেকে উদ্ভূত নয়, জ্ঞানবুদ্ধির কোনও নীতি থেকেও উদ্ভূত নয়। প্রকৃতির মতোই রাষ্ট্রেরও যৌক্তিকতার যথাযথ নিজস্ব আলাদা রূপ আছে। এর উল্টোদিকে, কোনও অতীন্দ্রিয় নিয়মাবলী, বিশ্বতাত্ত্বিক কোনও ধাঁচা বা নৈতিক-দার্শনিক কোনও আদর্শের ভিত্তিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার বদলে শাসনপ্রণালীর কলা তার যৌক্তিকতার নীতি খুঁজতে রাষ্ট্র-গঠনকারী নির্দিষ্ট বাস্তবতার দিকে চোখ ফেরাল। আমার পরবর্তী ভাষণগুলোতে রাষ্ট্রের যৌক্তিকতার এই প্রথম রূপের উপাদানগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব। কিন্তু এখন এইটুকু বলা যায় যে আঠারো শতকের প্রথমদিকের আগে অবধি 'রাষ্ট্রের যুক্তি'-র এই রূপ শাসনপ্রণালীর কলার বিকাশলাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

এর একাধিক কারণ আছে। প্রথমত আছে সেই কারণগুলো যাদের ইতিহাসগত কারণ বলা যায় বা সতেরো শতকীয় বড় বড় সংকটের ধারা হিসেবেও দেখা যায়, যেমন: প্রথমে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের প্রবাহ ডেকে আনা তিরিশ বছরের যুদ্ধ, তারপর শতকের মাঝবরাবর কৃষকদের বিদ্রোহ ও শহুরে বিদ্রোহ, আর সবশেষে সেই আর্থিক সংকট যা শতকের শেষভাগে সবকটা পশ্চিমী রাজতন্ত্রে রাজস্বের সংকট রূপে দেখা দিয়েছিল। সতেরো শতককে শুরু থেকে শেষ অবধি যে ধরনের বড়মাপের সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েন বেঁধে রেখেছিল, তার থেকে মুক্ত কোনও বিস্তারলাভের যুগেই শাসনপ্রণালীর কলা তার সমস্ত সূক্ষ্মতাসহ বিকাশলাভ করতে পারত। মৌলিক চরিত্রের ইতিহাসগত কারণ তাই শাসনপ্রণালীর কলার সঞ্চারপথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার এটাও মনে হয় যে ষোল শতকে সূত্রায়িত এই শাসনপ্রণালীর কলার মতবাদ সতেরো শতকে এসে আরও এক সারি অন্য বাধার মুখে পড়েছিল, যে বাধাগুলোকে 'মানসিক' ও 'প্রাতিষ্ঠানিক' কাঠামোগত বাধা বলা যেতে পারে (যদিও এই 'মানসিক' ও 'প্রাতিষ্ঠানিক' অভিধা নিয়ে আমি খুব সন্তুষ্ট নই)। যতক্ষণ অবধি সার্বভৌমত্ব কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হিসেবে টিকে ছিল, ততক্ষণ তাত্ত্বিক প্রশ্ন ও রাজনৈতিক সংগঠনের নীতি উভয় রূপেই সার্বভৌমত্ব চর্চা সংক্রান্ত সমস্যাই মৌলিক গুরুত্বধারী হিসেবে থেকে গিয়েছিল। যতক্ষণ অবধি সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠানগুলোই মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে থেকে যায় এবং ক্ষমতাচর্চাকে সার্বভৌমত্ব-চর্চা হিসেবে দেখা হয়, শাসনপ্রণালীর কলাকে

নির্দিষ্ট রূপে স্বাধীন ভাবে বিকশিত করা যায় না। আমার মনে হয় যে বাণিজ্যতন্ত্রবাদে এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। শাসনপ্রণালীর এই কলাকে রাজনৈতিক প্রয়োগচর্চা ও রাষ্ট্রের জ্ঞানের স্তরে প্রয়োগ করার প্রথম অনুমোদিত প্রয়াস হিসেবে বাণিজ্যতন্ত্রবাদকে দেখা যেতে পারে। এই অর্থে বলা যায় যে লা পেরিয়ের প্রণীত পাঠবস্তু বাস্তবতার চেয়ে বেশি নৈতিকতার স্তরে যে শাসনপ্রণালীর কলাকে সংজ্ঞায়িত করেছিল তা বাণিজ্যতন্ত্রবাদের মধ্য দিয়ে বাস্তবতার প্রথম চৌকাঠে পা রাখল। ক্ষমতাচর্চার প্রথম যুক্তিবদ্ধ রূপকে শাসনপ্রণালীর চর্চা হিসেবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হল বাণিজ্যতন্ত্রবাদ। বাণিজ্যতন্ত্রবাদের মধ্য দিয়েই আমরা প্রথম রাষ্ট্র সম্পর্কিত এমন এক savoir-য়ের বিকাশ হতে দেখলাম যা শাসনপ্রণালীর কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এই সমস্তকিছুই সত্য হলেও বাণিজ্যতন্ত্রবাদও যে বাধার মুখে পড়ে আটকে গিয়েছিল, আমার বিশ্বাস তার কারণটাও এখানেই যে বাণিজ্যতন্ত্রবাদও সার্বভৌমের শক্তির সংস্থান করাকেই তার আবশ্যকীয় লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল: তা যত না দেশের সম্পদবৃদ্ধির পথ খুঁজেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি খুঁজেছিল সেইসব পথ যার মধ্য দিয়ে শাসককে সম্পদ পুঞ্জীভবনের পথ করে দেওয়া যায়, রাজকোষ ভরে তোলা যায় এবং নীতিপ্রবর্তনের পথ প্রশস্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সেনাবাহিনী পোষা যায়। আর বাণিজ্যতন্ত্রবাদ তার হাতিয়ার হিসেবেও আইন, বিজ্ঞপ্তি, বিধি-র মতো সার্বভৌমত্বের প্রথাগত অস্ত্রগুলোকেই ব্যবহার করেছিল। লক্ষ্য হিসেবে রইল সার্বভৌমের শক্তির সংস্থান, হাতিয়ারগুলোও রইল সার্বভৌমত্বের প্রথাগত হাতিয়ার, ফলে এমন এক 'মানসিক' ও 'প্রাতিষ্ঠানিক' কাঠামোর মধ্যে বাণিজ্যতন্ত্রবাদ সচেতনভাবে কল্পিত শাসনপ্রণালীর কলা দ্বারা উন্মুক্ত করা সম্ভাবনাগুলোকে পুরে দিল যা তার নিজস্ব প্রকৃতির গুণেই সেই সম্ভাবনাগুলোকে শ্বাসরুদ্ধ করে তুলল।

সুতরাং, গোটা সতেরো শতক জুড়ে এবং আঠারো শতকের গোড়ায় বাণিজ্যতন্ত্রবাদের ভাবনার নির্মূল হওয়ার আগে অবধি শাসনপ্রণালীর কলা এক অর্থে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে থেকে গেল, সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠান ও সমস্যাদির বেঢপ বিশাল, বিমূর্ত ও অনমনীয় কাঠামোর মধ্যে আটকা পড়ে রইল। এমতাবস্থায় সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের নবীকৃত সংস্করণ থেকে শাসনকলার প্রধান নীতিগুলোকে উৎপন্ন করে নেওয়ার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে শাসনপ্রণালীর কলা সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার একটা

চেষ্টা চালিয়েছিল— আর এই জায়গাতেই সতেরো শতকের সেই ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞরা সামনে এসেছিলেন যাঁরা চুক্তিবদ্ধতার তত্ত্বকে বিধিবদ্ধ বা অনুষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। চুক্তিবদ্ধতার তত্ত্বে শাসক ও প্রজাদের পারস্পরিক প্রতিজ্ঞাকে উৎসসূচক চুক্তি হিসেবে ধরা হয় এবং তাকে একটি তাত্ত্বিক ছাঁচবিন্যাস হিসেবে ধরে নিয়ে তার থেকেই শাসনপ্রণালীর কলার সাধারণ নীতিগুলোকে উৎপন্ন করা হয়। কিন্তু চুক্তিবদ্ধতার তত্ত্ব শাসক ও প্রজার মধ্যের সম্পর্ক নিয়ে তার নানা ভাবনাচিন্তা দিয়ে জন-আইনের তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেও বাস্তব প্রয়োগচর্চার ক্ষেত্রে তা জন-আইনের সাধারণ নীতি সূত্রায়নের স্তরেই আটকে থেকেছিল, যার প্রমাণ আমরা হবস-য়ের মধ্যে পাই (যদিও হবস-য়ের লক্ষ্য ছিল শাসনপ্রণালীর কলার প্রধান নীতিগুলোকে আবিষ্কার করা)।

একদিকে ছিল অতীব বৃহৎ, অতীব বিমূর্ত, অতীব অনমনীয় এই সার্বভৌমত্বের কাঠামো, আর অপরদিকে শাসনপ্রণালীর তত্ত্ব অতীব দুর্বল, অতীব পাতলা, অতীব অবাস্তব একটি ছাঁচ, অর্থাৎ, পরিবারের ছাঁচের উপর নির্ভরতার কারণে ভুগছিল। তখনও সেই পরিবারের ছাঁচের উপর ভিত্তি করে থাকা এক সম্পদবৃদ্ধির অর্থনীতির পক্ষে অঞ্চল দখল করা ও রাজকীয় অর্থব্যবস্থার গুরুত্বের প্রয়োজন মেটানো দুষ্কর ছিল।

শাসনপ্রণালীর কলা কীভাবে এই সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করতে পারল? এখানেও আবার একাধিক সাধারণ প্রক্রিয়া ভূমিকা নিয়েছিল, যেমন: আঠারো শতকের জনসংখ্যা-স্ফীতি, তার সঙ্গে টাকার ক্রমবর্ধমান প্রাচুর্য, যা আবার ইতিহাসবিদদের পরিচিত এক সারি বৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষি-উৎপাদন প্রসারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ চিত্রটি যদি এইরকম হয়, তাহলে আমরা আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে পারি যে জনসংখ্যার সমস্যার উদ্ভবের মধ্য দিয়েই শাসনপ্রণালীর কলা নতুন গতিপথ খুঁজে পেয়েছিল। অথবা, অন্যভাবে বলা যায় যে শাসনপ্রণালীর বিজ্ঞান, পরিবারের থেকে আলাদা একটি তলে অর্থনীতির প্রসঙ্গ-কেন্দ্রটির স্থানান্তরকরণ এবং জনসংখ্যার সমস্যা— এইগুলো একটি সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক যোগসূত্রে বাঁধা পড়েছিল। সেই সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াটির খুঁটিনাটি আমাদের খুঁড়ে বের করতে হবে।

আমরা আজ 'অর্থনৈতিক' বলতে যা বুঝি, বাস্তবতার সেই পৃথক তলে অর্থনীতির ধারণা-কেন্দ্র সরে আসা এবং জনসমষ্টি বা জনসংখ্যার বিশেষ

সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা— এই দুটো বিষয়ই শাসনপ্রণালীর বিজ্ঞান গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু উল্টোদিক থেকে আবার আমরা এটাও বলতে পারি যে জনসমষ্টি বা জনসংখ্যার বিশেষ নির্দিষ্ট সমস্যাগুলো সম্পর্কে ধারণার কল্যাণে এবং আমরা এখন যাকে 'অর্থনীতি' বলি, বাস্তবতার সেই পরিসরটি পৃথক রূপে আলাদা ভাবে বিবেচ্য হয়ে ওঠার কল্যাণেই শেষাবধি সার্বভৌমত্বের বিচারবিধিমূলক কাঠামোর বাইরে বেরিয়ে শাসনপ্রণালীর সমস্যাকে ভাবা, বিচার করা ও নির্ণয় করার কাজ শুরু হল। আরও বলা যায়: বাণিজ্যতন্ত্রবাদী পরম্পরায় সার্বভৌমত্বের ধাঁচা অবলম্বন করা রাজতন্ত্রী প্রশাসনের স্বার্থে সেই ঘেরাটোপের মধ্যেই কাজ করত যে 'পরিসংখ্যান', এখন তা শাসনপ্রণালীর কলার বাধাহীন বিকাশের মুখ খুলে দেওয়ার প্রধান বা অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠল।

শাসনপ্রণালীর কলার বাধাহীন বিকাশের মুখ খুলে দেওয়ার কাজ কীভাবে জনসমষ্টি বা জনসংখ্যার সমস্যার দ্বারা সম্পন্ন হল? শেষ পর্যন্ত পরিবারের ছাঁচটিকে বাতিল করে অর্থনীতির ধারণা-কেন্দ্রটিকে নতুন জায়গায় সরিয়ে আনা জনসমষ্টি বা জনসংখ্যার হাজির করা পরিপ্রেক্ষিতের টানে ও তার প্রতীতিগত বাস্তবতার জন্যই সম্ভবপর হয়েছিল। পূর্ববর্তী অবস্থায়, সার্বভৌমত্বের প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে এবং তজ্জন্যেই সার্বভৌমত্বের কর্মপ্রণালীর শর্ত মেনেই পরিসংখ্যান কাজ করত; এখন ধীরে ধীরে তা উন্মোচিত করতে শুরু করল যে জনসংখ্যার নিজস্ব ছন্দ থাকে, মৃত্যু ও রোগের নিজস্ব হার থাকে, অভাব-দুর্ভিক্ষের বৃত্তীয় চলন থাকে, ইত্যাদি; এছাড়াও পরিসংখ্যান সামনে নিয়ে এল যে মহামারী, আঞ্চলিক মৃত্যুহার, শ্রম ও সম্পদের ঊর্ধমুখী শঙ্খিল গতি, ইত্যাদির মতো এমন একগুচ্ছ অন্তর্নিহিত সমষ্টিগত প্রভাব বা প্রতীতি জনসমষ্টির থাকে যা পরিবারের স্তরে বোঝা বা দেখা যায় না; আর সবশেষে পরিসংখ্যান দেখাল যে স্থান-বদল, প্রচলিত রীতি ও কাজকর্মের মধ্য দিয়ে জনসমষ্টি অর্থনীতিকেও বিশেষ নির্দিষ্ট রূপে প্রভাবিত করে। জনসংখ্যা বা জনসমষ্টির এইসব বিশেষ নির্দিষ্ট প্রতীতিগুলোকে পরিমাপযোগ্য করে তোলার মধ্য দিয়ে পরিসংখ্যান দেখিয়ে দিল যে এই বিশেষত্বগুলো পরিবারের মাত্রায় ধরা যায় না। এর মধ্য দিয়ে ধর্মীয় বা নৈতিক চরিত্রের কিছু অবশেষ ছাড়া বাকি সমস্ত ক্ষেত্রেই পরিবারকে শাসনপ্রণালীর ছাঁচ হিসেবে ধরার প্রথার অবসান ঘটল। জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত একটি উপাদান হিসেবে এবং সেই মতোই জনসমষ্টিকে শাসন করার একটি

মৌলিক হাতিয়ার হিসেবে পরিবারকে গণ্য করার প্রবণতা প্রাধান্য নিয়ে উঠে এল।

অন্যভাবে বললে, বিচার্য বস্তু হিসেবে জনসমষ্টির উদ্ভবের আগে অবধি শাসনপ্রণালীর কলাকে পরিবারের ছাঁচের বাইরে, পরিবারের ব্যবস্থাপনা প্রসূত অর্থনীতির সাপেক্ষে ছাড়া অন্যভাবে ভাবা অসম্ভব ছিল। এর বিপরীতে যখনই প্রতিষ্ঠিত হল যে জনসমষ্টিকে পরিবারের মাত্রায় লঘুকরণ করে বিচার করা যায় না, তখনই গুরুত্বের বিচারে জনসমষ্টির তুলনায় পরিবার গৌণ হয়ে গেল এবং কেবলমাত্র জনসমষ্টির অন্তর্গত একটি উপাদান হিসেবেই পরিবার বিবেচ্য রইল, অর্থাৎ, পরিবার একটি পূর্ণ ছাঁচের মর্যাদা খুইয়ে ছাঁচমধ্যস্থ একটি উপাংশে পর্যবসিত হল। কিন্তু উপাংশ হিসেবে পরিবারের গুরুত্ব বজায় থাকল কারণ জনসমষ্টি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্য (যেমন: যৌন আচরণ, জনসংখ্যা, ভোগের পরিমাণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য) প্রয়োজন হলে পরিবারের সূত্র ধরেই সংকলিত করা যেতে পারে। তবুও, একটি ছাঁচ হওয়ার পরিবর্তে পরিবার কেবলমাত্র একটি হাতিয়ার হিসেবে থাকল— এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার যা জনসমষ্টিকে শাসন করতে লাগে কিন্তু যা সুশাসনের কোনও উদ্ভট কাল্পনিক ছাঁচ নয়। ছাঁচ থেকে হাতিয়ারের স্তরে নেমে আসার এই অবস্থান-বদলই মৌলিক গুরুত্বের বিষয় বলে আমার মনে হয় আর তা ঘটেছিল আঠারো শতকের মাঝবরাবর থেকে যখন মৃত্যুহার কমানোর জন্য বা বিবাহে উৎসাহিত করার জন্য বা টিকাকরণের জন্য বা এমনই আরো কোনও উদ্দেশ্যে পরিচালিত প্রচার-কার্যক্রম সংগঠনের মধ্য দিয়ে জনসমষ্টির সাপেক্ষে পরিবার একটি হাতিয়ারের মাত্রা গ্রহণ করতে শুরু করল। সুতরাং, এইভাবে পরিবারের ছাঁচকে নির্মূল করার মধ্য দিয়েই জনসংখ্যা বা জনসমষ্টি শাসনপ্রণালীর কলার বাধাহীন বিকাশের মুখ খুলে দিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, শাসনপ্রণালীর চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে জনসমষ্টি সবার উপরে উঠে এল। সার্বভৌমত্বের অধীনে স্বয়ং শাসনের কাজই শাসনপ্রণালীর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল। কিন্তু এখন তার বিপরীতে শাসনপ্রণালীর চূড়ান্ত লক্ষ্য হল জনসমষ্টির কল্যাণ, তার অবস্থার উন্নতি, তার সম্পদের বৃদ্ধি, গড় জীবনকাল বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি। আর এইসব লক্ষ্য পূরণের জন্য ব্যবহৃত উপায়গুলোও কোনও না কোনও অর্থে জনসমষ্টির মধ্যেই নিহিত। জনসমষ্টির উপরই কাজ করা যে কোনও শাসনব্যবস্থার কর্তব্য— সেই কাজ

সে বড়মাপের প্রচার-কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে করতে পারে, অথবা পরোক্ষভাবে করতে পারে এমন কৌশলের মধ্য দিয়ে যা জনগণের পূর্ণ-সচেতনতা ব্যতিরেকেই জন্মহার উৎসাহিত করা, নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা কার্যক্ষেত্রে জনসংখ্যা-প্রবাহের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া ইত্যাদির মতো উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। সার্বভৌমের ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করার চেয়ে অধিকত জনসমষ্টি এখন শাসনপ্রণালীর অভিপ্রায়ের প্রতিনিধি। একদিকে জনসমষ্টি হল প্রয়োজন ও আকাঙ্খার বিষয়ী, আবার অন্যদিকে তা শাসনপ্রণালীর হাতে থাকা এমন এক বিষয় যে শাসনপ্রণালীর মুখে দাঁড়িয়ে সে কী চায় তা জানে কিন্তু তাকে নিয়ে ঠিক কী করা হচ্ছে তা সে জানে না। জনসমষ্টির অংশ প্রতিটি ব্যক্তির সচেতনতা রূপে স্বার্থ এবং সেই স্বার্থ জনসমষ্টির স্বার্থ যেখানে জনসমষ্টিভুক্ত ব্যক্তিএককদের বিশেষ স্বার্থ বা বিশেষ আকাঙ্খা দিয়ে কিছু যায় আসে না: এই হল জনসমষ্টির শাসনপ্রণালীর নতুন লক্ষ্যবস্তু ও মৌলিক হাতিয়ার। এ হল এক নতুন কলার জন্ম, বা অন্ততপক্ষে, একসারি সম্পূর্ণ নতুন কৌশল ও প্রকৌশলের জন্ম।

শেষত, ষোল শতকের পাঠ্যবস্তুগুলোর ভাষায় যাকে সার্বভৌমের 'ধৈর্য' বলা হতো, সেই বস্তুটিকেও জনসমষ্টির বিন্দুকে ঘিরেই সংগঠিত করে তোলা হয়েছে। অর্থাৎ, জনসমষ্টিই হল সেই বস্তু যাকে শাসনপ্রণালীর সমস্ত নিরীক্ষণ ও savoir-য়ের বিষয় করে তুলতে হবে যদি কার্যকরী ও যুক্তিসংগত রূপে সচেতন ভাবে শাসন চালাতে হয়। বর্তমানে আমরা 'অর্থনীতি' বলতে যা বুঝিয়ে থাকি, বৃহৎ অর্থে জনসমষ্টির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত প্রক্রিয়া বিষয়ে সেই জ্ঞানের থেকে শাসনপ্রণালীর savoir গঠনপ্রক্রিয়াকে কোনওভাবেই আলাদা করা যায় না। এর আগের ভাষণে আমি বলেছিলাম যে সম্পদের বিবিধ উপাদানের মধ্যে থেকে একটি নতুন বিষয়ের, অর্থাৎ, জনসমষ্টির গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সামনে উঠে আসার উপর রাজনৈতিক অর্থনীতির উদ্ভব নির্ভর করেছিল। 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' নামক নতুন বিজ্ঞানটি জনসংখ্যা, অঞ্চল ও সম্পদের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন বহুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নতুন অন্তর্বুনন বিষয়ক ধারণা থেকে গড়ে উঠেছিল। আর এর হাত ধরেই শাসনপ্রণালীর বৈশিষ্ট্যমূলক এক ধরনের হস্তক্ষেপও গড়ে উঠেছিল যেগুলো হল অর্থনীতি ও জনসংখ্যা/জনসমষ্টির পরিসরে হস্তক্ষেপ। অন্যভাবে বললে, শাসনপ্রণালীর কলা থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে উৎক্রমণ এবং সার্বভৌমত্বের কাঠামোর আধিপত্যাধীন শাসন থেকে শাসনপ্রণালীর প্রকৌশল চালিত

শাসনে উৎক্রমণের যে পর্যায় আঠারো শতকে ঘটেছিল, তা জনসংখ্যা/জনসমষ্টি-র প্রসঙ্গমূলের উপর এবং সেইজন্যই রাজনৈতিক অর্থনীতির জন্মের উপর ভর করে এগিয়েছিল।

তার মানে অবশ্য এমন নয় যে শাসনপ্রণালীর কলা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রূপান্তরিত হতে শুরু করার পর থেকেই সার্বভৌমত্বের আর কোনও ভূমিকা ছিল না। বরং তার উল্টোটাই ঘটেছিল বলে আমি বলব। এই সময়ের আগে আর কখনও সার্বভৌমত্বের সমস্যাটি এত জোরালোভাবে হাজির হয়নি। তার কারণ, ষোল এবং সতের শতকে বিষয়টি ছিল সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব থেকে শাসনপ্রণালীর কলাকে উৎপন্ন করার সমস্যা; কিন্তু এখন যেহেতু সেই শাসনপ্রণালীর কলা বিরাজ করছে ও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে, তাই এখন সমস্যাটা হল রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যমূলক সার্বভৌমত্বকে কী বিচারবিধিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যায়, কোন আইনি ভিত্তির উপর তাকে সুরক্ষিত করা যায় তার সমস্যা। রুশো-র দুটি লেখা সেগুলোর কালক্রম মাথায় রেখে পড়লেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। তাঁর এনসাইক্লোপিডিয়ায় 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখতে পাই যে রুশো শাসনপ্রণালীর কলার সমস্যাটিকে এইভাবে হাজির করছেন: তিনি দেখাচ্ছেন যে 'অর্থনীতি' শব্দটির অর্থবোধকতা আবশ্যিকভাবে পরিবারের মাথা অর্থাৎ পিতার দ্বারা পারিবারিক সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত (এই দৃষ্টিকোণ থেকে লেখাটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমূলক), কিন্তু এই ছাঁচ অতীতে যুক্তিসিদ্ধ হলেও এখন আর গ্রহণযোগ্য নেই; রুশোর মতে, এখন এটা জানা হয়ে গেছে যে রাজনৈতিক অর্থনীতি আর পরিবারের অর্থনীতি এক নয়। ফিজিওক্র্যাটদের তত্ত্ব, পরিসংখ্যান বা জনসংখ্যা/জনসমষ্টির সাধারণ সমস্যার সরাসরি কোনও উল্লেখ না করলেও তিনি স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলেন যে এই অবস্থান্তরের মূলে আছে এমন কিছু ঘটনা যা 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'-র অর্থনীতিকে এমন একটা অর্থ দিয়েছে যা পরিবারের পুরানো ছাঁচের মধ্যে আর ধরা পড়ে না। শাসনপ্রণালীর কলার একটি নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণের কর্তব্য রুশো এই প্রবন্ধে গ্রহণ করেছিলেন। এর পরবর্তীকালে রুশো 'সামাজিক চুক্তি' (The Social Contract) লিখেছিলেন। প্রকৃতি, চুক্তি এবং সাধারণ অভিপ্রায়ের মতো ধারণা ব্যবহার করে কীভাবে শাসনপ্রণালীর একটি সাধারণ নীতি হাজির করা যায় যা একদিকে যেমন সার্বভৌমত্বের বিচারবিধিগত নীতিকে স্থান দেবে, অন্যদিকে তেমনই শাসনপ্রণালীর কলার

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারক উপাদানগুলোকেও ধারণ করবে— এই সমস্যাটি নিয়ে তিনি 'সামাজিক চুক্তি' বইটিতে আলোচনা করেছিলেন। ফলে দেখা যাচ্ছে যে শাসনপ্রণালীর এক নতুন কলার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে, এমনকি সেই কলার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চৌকাঠ পেরিয়ে যাওয়ার পরও সার্বভৌমত্ব বাতিল হয়ে যায় নি; বরং তার উল্টোটাই ঘটেছে, সার্বভৌমত্বের সমস্যার তীব্রতা-তীক্ষ্ণতা আগের যে কোনও সময়কে ছাপিয়ে গেছে।

শৃঙ্খলার কথা ধরলে, তাও বাতিল হয়ে যায় নি। সতেরো এবং আঠারো শতকে শৃঙ্খলার সাংগঠনিক রীতি যেভাবে গড়ে উঠেছিল, বিদ্যালয়, কল-কারখানা, সেনাবাহিনীর মতো যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে তা বিকাশলাভ করেছিল, সেসব বুঝতে গেলে একমাত্র প্রধান প্রশাসনিক রাজতন্ত্রগুলোর বিকাশের ভিত্তিতেই তা বোঝা যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে মুহূর্ত থেকে একটি জনসমষ্টির ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, তখনকার থেকে আর কখনও শৃঙ্খলা এত গুরুত্বপূর্ণ, এত মূল্যবান হয়ে ওঠেনি। একটি জনসমষ্টির ব্যবস্থাপনা কেবলমাত্র প্রতীতির সমষ্টিগত ভর বা গড় প্রভাবের স্তরের বিষয় নয়, বরং তা জনসমষ্টির গভীরতম তলে গিয়ে এবং সূক্ষ্মতম খুঁটিনাটি ধরে ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করতে চায়। জনসমষ্টিকে শাসন করার প্রণালীর ধারণা সার্বভৌমত্বের ভিত্তির সমস্যাটিকে যেমন আরও তীক্ষ্ণ-তীব্র করে তোলে (রুশো-র উদাহরণ দেখুন), শৃঙ্খলার বিকাশের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটিকেও তেমনই তীক্ষ্ণ-তীব্র করে তোলে (অন্যত্র আমি শৃঙ্খলার যেসব ইতিহাস বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি, সেগুলো দেখুন)।

সুতরাং ভুল হবে যদি আমরা ভেবে বসি যে সার্বভৌমত্বের সমাজ প্রতিস্থাপিত হয়েছে শৃঙ্খলাদায়ক সমাজ দিয়ে আর তারপর শৃঙ্খলাদায়ক সমাজ প্রতিস্থাপিত হয়েছে শাসনপ্রণালীর সমাজ দিয়ে। আসলে আমরা একটি ত্রিভুজ পাই। সার্বভৌমত্ব, শৃঙ্খলা ও শাসনপ্রণালী সেই ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দুতে বসে আছে। সেই ত্রিভুজের প্রাথমিক চাঁদমারি হল জনসমষ্টি আর নিরাপত্তারক্ষার ব্যবস্থাপত্র হল তার আবশ্যিক কলকৌশল। যাই হোক, শাসনপ্রণালী বাছাইয়ের সমস্যার উপর প্রভাব ফেলা সার্বভৌমত্বের ধ্রুবকগুলোকে উল্টে দেওয়া চলন; জনসমষ্টিকে একটি উপাত্তসংগ্রহের ক্ষেত্র, হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র ও শাসনপ্রণালীগত প্রকৌশলের প্রয়োগক্ষেত্র করে তুলেছে যে চলন; বাস্তবতার একটি বিশেষ নির্দিষ্ট অঞ্চল হিসেবে অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্ন করেছে যে প্রক্রিয়া; আর, সেই বিশেষ নির্দিষ্ট

অঞ্চলে শাসনপ্রণালীর হস্তক্ষেপের বিজ্ঞান ও প্রকৌশল হিসেবে রাজনৈতিক অর্থনীতির বিকাশ— এই চলনগুলোর মধ্যস্থ গভীর ঐতিহাসিক যোগসূত্রগুলোকে দেখানই আমার উদ্দেশ্য। এই তিনটি চলন— শাসনপ্রণালী, জনসমষ্টি, রাজনৈতিক অর্থনীতি— যা আঠারো শতক থেকে একটি ঘনবদ্ধ প্রবাহের রূপ নিয়েছে, আজও তার ধারা কোনওভাবেই ফিকে হয়নি।

উপসংহারে আমি এই বছরে আমার শুরু করা বক্তৃতামালার নাম নিয়ে কিছু বলতে চাই। প্রথমে আমি বক্তৃতামালার নাম হিসেবে বেছেছিলাম: 'নিরাপত্তারক্ষা, অঞ্চল এবং জনসমষ্টি'। পরে ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছে যে এই বক্তৃতামালার মধ্য দিয়ে যে অনুসন্ধানের পথ আমি করতে চাইছি তা ওই নামে ঠিক আসছে না, তাকে বরং বলা যেতে পারে 'রাজকতা' (governmentality)-র একটি ইতিহাস। 'রাজকতা' শব্দটির মধ্য দিয়ে আমি তিনটি জিনিষ বোঝাতে চাইছি:

১. জনসমষ্টি যার লক্ষ্যবস্তু, রাজনৈতিক অর্থনীতি যার প্রধান জ্ঞান-রূপ, নিরাপত্তারক্ষার সাজসরঞ্জাম যার আবশ্যিক প্রকৌশলগত উপায়, সেই অতি নির্দিষ্ট অথচ জটিল ক্ষমতারূপের চর্চা সম্পন্ন হয় যে প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রক্রিয়াদি, ভাবনাচিন্তা, হিসাবনিকাশ ও কৌশলাদির সমাহারের মধ্য দিয়ে।

২. এক দীর্ঘ সময়পর্যায় জুড়ে পাশ্চাত্য জুড়ে যে প্রবণতা ক্ষমতার অন্য সমস্ত রূপের (সার্বভৌমত্ব, শৃঙ্খলা, ইত্যাদি) উপর এই ক্ষমতারূপের (যাকে আমরা 'শাসনপ্রণালী' বলে অভিহিত করতে পারি) প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে; আর, যার ফলে যেমন একদিকে নির্দিষ্ট একসারি শাসনপ্রণালীগত সাজসরঞ্জাম/ব্যবস্থাপত্র গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনই savoir-সমূহের এক জটিল সমাহার বিকাশলাভ করেছে।

৩. সেই প্রক্রিয়া বা, বলা ভালো, সেই প্রক্রিয়াজাত ফল যার মধ্য দিয়ে মধ্য যুগের বিচারবিধি-ব্যবস্থা রূপান্তরিত হয়ে পনেরো ও ষোল শতকের প্রশাসনিক রাষ্ট্রের রূপ নিয়েছে এবং তারপর ধীরে ধীরে 'শাসনপ্রণালীবদ্ধ' হয়ে উঠেছে।

বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রের অনুরাগ বা বিভীষিকা কী মোহ বিস্তার করেছে তা আমরা সকলেই জানি; আমরা জানি কী পরিমাণ মনোযোগই না ব্যাপৃত আছে রাষ্ট্রের উদ্ভব, ইতিহাস, অগ্রগতি, ক্ষমতা, অপব্যবহার ইত্যাদির

বিশ্লেষণে। রাষ্ট্রের সমস্যার উপর প্রয়োজনাতিরিক্ত মূল্য আরোপ করার প্রবণতা মূলত দুটি পথ ধরে প্রকাশিত হয়। তাদের মধ্যে একটি হল আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা শীতল দানবের কাব্য যা প্রত্যক্ষ, অনুভূতি-সম্বন্ধীয় ও বিয়োগান্তক। কিন্তু রাষ্ট্রের সমস্যার উপর প্রয়োজনাতিরিক্ত মূল্য আরোপ করার দ্বিতীয় একটি পথও আছে যা আপাতভাবে লঘুকরণবাদী হওয়ার কারণে কূটাভাসময়। এই দ্বিতীয় রূপের বিশ্লেষণ উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও উৎপাদন সম্পর্কের পুনরুৎপাদনের মতো গুটিকয় ভূমিকায় লঘুকরণ করে রাষ্ট্রকে দেখে। রাষ্ট্রের ভূমিকার আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কিত এই লঘুকরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবধারিতভাবে রাষ্ট্রকে ধার্য করে একদিকে আবশ্যিক আক্রমণের চাঁদমারি হিসেবে আবার অন্যদিকে অবশ্যই দখল করে বসতে হবে এমন এক সুবিধাদায়ী অবস্থান হিসেবে। কিন্তু রাষ্ট্রের কি এইরূপ একতা, অদ্বিতীয়ত্ব, দৃঢ়বদ্ধভাবে নির্ধারিত ভূমিকা আছে? অকপটে বললে, রাষ্ট্রের কি সত্যিই এইরূপ গুরুত্ব আছে? ইতিহাসের অন্য যে কোনও সময়ের থেকে হয়ত আজ আরও বেশি করে বাস্তব হয়ে উঠেছে যে দুটি প্রশ্নের উত্তরই হল: না, নেই। সব কিছুর শেষে হয়ত রাষ্ট্র বহুস্তরীয় বাস্তবতা ও অতিকথায় সিক্ত বিমূর্ততা ছাড়া আর কিছু নয় এবং তার গুরুত্বও আমরা অনেকে যা ভেবে থাকি তার চেয়ে অনেক সীমায়িত। আমাদের আধুনিকতাকে বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রকৃতই যা গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত সমাজের রাষ্ট্রবদ্ধকরণ (etatisation) নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ হল রাষ্ট্রের 'শাসনপ্রণালীবদ্ধকরণ'।

আঠারো শতকে প্রথম আবিষ্কৃত হওয়া 'রাজকতা'-র যুগে আমরা বাস করছি। রাষ্ট্রের এই শাসনপ্রণালীবদ্ধকরণ একটি ব্যতিক্রমী চরিত্রের কূটাভাসময় প্রতীতি: রাজকতার সমস্যা এবং শাসনপ্রণালীর প্রকৌশল যদি একমাত্র রাজনৈতিক প্রশ্ন হয়ে উঠে রাজনৈতিক সংগ্রাম ও বিরোধিতার একমাত্র বাস্তব পরিসর হয়, তাহলে একইসঙ্গে রাষ্ট্রের এই শাসনপ্রণালীবদ্ধকরণই রাষ্ট্রকে টিকে থাকার শক্তিও যুগিয়েছে। এইটা ধরে নেওয়া যায় যে এই রাজকতার কল্যাণেই রাষ্ট্র আজ তার বর্তমান রূপে পৌঁছেছে আর এই রাজকতা রাষ্ট্রের ভিতর ও বাহির দুইয়েরই বিষয়— যেহেতু শাসনপ্রণালীর কৌশলই প্রতিনিয়ত সেই সংজ্ঞায়ন ও পুনর্সংজ্ঞায়নকে সম্ভবপর করে তুলছে যার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়ে চলেছে কী রাষ্ট্রের এক্তিয়ারভুক্ত আর কী নয়, জনপরিসরের বিষয় বনাম ব্যক্তিপরিসরের বিষয়, এবং এমনই আরও অনেক কিছু। সেইজন্যই,

রাজকতার সাধারণ কৌশলগুলোর ভিত্তিতেই রাষ্ট্রকে তার টিকে থাকা ও তার সীমারেখাগুলো দিয়ে বোঝা সম্ভব।

আর এর উপর দাঁড়িয়ে সামূহিক, মোটের উপর ও অযথাযথ ভাবে হলেও পাশ্চাত্যের প্রধান ক্ষমতার অর্থনীতিগুলোর ইতিহাসকেও আমরা এভাবে পুনর্নির্মাণ করতে পারি: প্রথমে এসেছিল ন্যায়পরতার রাষ্ট্র, যার জন্ম সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচার সীমায়িত-অঞ্চল-নির্ধারণের উপর, প্রথাগত নিয়মকানুন ও লিখিত বিধি সমন্বিত এক বিচারবিধির সমাজের সাপেক্ষে তা বহুলাংশে মোকদ্দমা-বিচার-বিসংবাদের খেলার রীতিসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। তার পরে এসেছিল প্রশাসনিক রাষ্ট্র, পনেরো ও ষোল শতকে যার জন্ম সামন্ততান্ত্রিক সীমায়িত-অঞ্চল-নির্ধারণের বাইরে সীমান্তের উপর, নিয়ম ও শৃঙ্খলার সমাজের সাপেক্ষে এই প্রশাসনিক রাষ্ট্র বিন্যস্ত ছিল। শেষাবধি এসেছে শাসনপ্রণালীর রাষ্ট্র, যা আর আবশ্যিকভাবে তার সীমায়িত অঞ্চল দিয়ে সংজ্ঞাত নয়, ভূপৃষ্ঠের কোন অংশের উপর তার অধিষ্ঠান তা দিয়ে সংজ্ঞাত নয়, বরঞ্চ এক সমষ্টি দিয়ে সংজ্ঞাত— সেই সমষ্টি তার জনসমষ্টি, পরিমাণ ও ঘনত্ব সমেত, এবং বসবাস-অঞ্চল সমেতও বটে যদিও এই অঞ্চল সেই জনসমষ্টির একটি উপাদান হিসেবেই কেবল বিবেচিত হয়। এই জনসমষ্টির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শাসনপ্রণালীর রাষ্ট্র তার হস্তগত অর্থনৈতিক জ্ঞানের হাতিয়ার সমেত নিজেকে নিরাপত্তারক্ষার সাজসরঞ্জাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজের সাপেক্ষে স্থাপন করে।

রাজকতার প্রতীতি— আমার ধারণা যা গুরুত্বপূর্ণ— তার কিছু চিহ্নায়ক আমি এখানে হাজির করলাম। এরপরে আমি আরও দেখাতে চেষ্টা করব কীভাবে এই রাজকতা জন্ম নিয়েছে একদিকে খ্রিস্টান যাজকব্যবস্থার (pastoral) প্রাচীন ধাঁচা থেকে রসদ নিয়ে, দ্বিতীয়দিকে কূটনৈতিক-সামরিক ধাঁচা বা কলাকৌশল থেকে সমর্থন জোগাড় করে আর তৃতীয়ত আমি দেখাতে চাইব কীভাবে শাসনপ্রণালীর কলার একদম সমসময়ে গড়ে ওঠা এক সারি বিশেষ নির্দিষ্ট সরঞ্জাম ব্যতিরেকে রাজকতা তার আজকের মাত্রা ধারণ করতে পারত না, যে সরঞ্জামকে আমরা 'পুলিশ' বলে অভিহিত করতে পারি যদি শব্দটির বারো ও তের শতকে প্রচলিত পুরানো অর্থে ব্যবহার করি। প্রাচীন যাজকতাব্যবস্থা, নতুন কূটনৈতিক-সামরিক কলাকৌশল এবং শেষত পুলিশ— আমার মনে হয় যে এই তিনটি উপাদান

থেকে রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালীবদ্ধকরণের প্রতীতি উৎপন্ন হয়ে পাশ্চাত্যের ইতিহাসে মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছে।

উৎস: কলেজ-দি-ফ্রাসঁ-র ১৯৭৭-১৯৭৮ সালের পাঠক্রমের অংশ হিসেবে মিশেল ফুকো এই ভাষণটি দিয়েছিলেন। ফরাসি ভাষায় লিখিত রূপে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। রবার্ট হারলি-র করা এর ইংরেজি অনুবাদ 'Governmentality'-শিরোনামে সংকলিত হয়েছে জেমস ডি ফবিয়ঁ সম্পাদিত মিশেল ফুকোর 'পাওয়ার (এসেনশিয়াল ওয়ার্কস অফ ফুকো, ১৯৫৪-১৯৮৪, তৃতীয় খণ্ড)' বইয়ের ২০১-২২২ পৃষ্ঠায়। সেই ইংরেজি অনুবাদ থেকেই এখানে বাংলায় ভাষান্তরিত করা হয়েছে।

বিষয়ী ও ক্ষমতা

ক্ষমতার পাঠ কী কারণে: বিষয়ীর বিষয়

কোনও তত্ত্ব বা পদ্ধতিবিজ্ঞান বিষয়ক ধ্যানধারণা আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না।

প্রথমে আমি বলতে চাই শেষ কুড়ি বছর আমার কাজের লক্ষ্য কী ছিল। ক্ষমতা নামক বস্তুকে বিশ্লেষণ করা আমার লক্ষ্য ছিল না, তেমন কোনও বিশ্লেষণের ভিত্তির বিশদীকরণ করাও আমার লক্ষ্য ছিল না। বরং, যে বিভিন্ন রীতির মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতিতে মানুষকে বিষয়ী করে তোলা হয়, তার ইতিহাস রচনা করাই ছিল আমার লক্ষ্য। আমার কাজে আলোচিত হয়েছে বিষয়ীকরণের এমন তিনটে রীতি যা মানুষকে বিষয়ীতে রূপান্তরিত করে।

এই তিনটি রীতির মধ্যে প্রথমটি হল বিজ্ঞানের পদমর্যাদায় আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী অনুসন্ধানরীতিসমূহ। যেমন, সাধারণ ব্যাকরণ (grammaire generale), ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানে যেভাবে বক্তার বিষয়ীকরণ করা হয়; সম্পদ ও অর্থব্যবস্থার বিশ্লেষণে যেভাবে শ্রমিক বা উৎপাদকের বিষয়ীকরণ করা হয়; প্রাকৃতিক ইতিহাস বা জীববিদ্যায় যেভাবে নিখাদ বেঁচে থাকার ঘটনাটিরও বিষয়ীকরণ করা হয়।

আমার কাজের দ্বিতীয় অংশকে আমি বলব 'বিভাজন চর্চা'। সেখানে বিষয়ীর বিষয়ীকরণ বিষয়ে অনুসন্ধান করেছি। বিষয়ী নিজের অভ্যন্তরেই বিভাজিত হয়, বা অপরদের থেকে বিভাজিত হয়। বিভাজনের এই প্রক্রিয়া তার বিষয়ীকরণকে সম্পন্ন করে। যেমন, পাগল ও সুস্থবুদ্ধি, অসুস্থ ও সুস্বাস্থ্যধারী, নানা ধরনের অপরাধী ও 'ভালো ছেলের দল'।

শেষ পর্যায়ে, অর্থাৎ আমার সাম্প্রতিকতম কাজের ক্ষেত্রে আমি পাঠ করতে চেয়েছি কীভাবে একজন মানুষ নিজেই নিজেকে বিষয়ীতে পরিণত করে। যেমন, যৌনতার ক্ষেত্রটি বেছে নিয়ে আমি পাঠ করতে চেয়েছি কীভাবে মানুষ নিজেকে 'যৌনতা'-র বিষয়ী হিসেবে চিনতে শিখল।

সুতরাং, ক্ষমতার চেয়ে বরং বিষয়ী-ই হল আমার পাঠ-অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় বহমান সাধারণ প্রসঙ্গ।

তবে এও সত্য যে আমি ক্ষমতার প্রশ্ন নিয়ে ভাবনায় বেশ ভালোরকমেই লিপ্ত হয়েছি। অচিরেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে মনুষ্যরূপ বিষয়ী যেমন উৎপাদনের সম্পর্ক ও দ্যোতনার সম্পর্কের মধ্যে স্থিত, ঠিক সমপরিমাণেই সে অত্যন্ত জটিল ক্ষমতা-সম্পর্কের মধ্যেও স্থিত। তখন আমার মনে হল যে উৎপাদনের সম্পর্ক পাঠ করার জন্য অর্থনৈতিক ইতিহাস ও তত্ত্ব ভালো হাতিয়ার,দ্যোতনার সম্পর্ক পাঠ করার জন্য ভাষাবিজ্ঞান ও সংকেতবিজ্ঞান ভালো হাতিয়ার, কিন্তু ক্ষমতার সম্পর্ক পাঠের জন্য তেমন কোনও ভালো হাতিয়ার নেই। আমাদের সামনে খোলা আছে কেবলমাত্র কিছু আইনি ছাঁচের আদলে ক্ষমতা সম্পর্কে ভাবার পথ, যেমন, 'কীসের দ্বারা ক্ষমতা বৈধতা পায়?' গোছের ভাবনা, বা অন্যথায়, প্রাতিষ্ঠানিক ছাঁচে ফেলে 'রাষ্ট্র কী?' এমন ধরনের ভাবনা।

তাই, ক্ষমতার সংজ্ঞায়নের মাত্রাগুলোকে বিস্তৃত করে তা বিষয়ীর বিষয়ীকরণের পাঠে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার প্রয়োজন আমার সামনে হাজির হয়েছিল।

ক্ষমতার তত্ত্ব কি এই প্রয়োজন মেটাবে? যে কোনও তত্ত্ব যেহেতু কোনও না কোনও পূর্ববর্তী বিষয়ীকরণকে ধরে নেয়, তাই তাকে বিশ্লেষণাত্মক কাজের ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো সমীচীন নয়। বিশ্লেষণাত্মক কাজও আবার চলমান ধারণানির্মাণ ছাড়া এগোতে পারেনা। চলমান ধারণানির্মাণ মানেই সমালোচনাত্মক চিন্তা, অনবরত যাচাই করতে করতে যাওয়া।

আমি বলব যে প্রথমেই 'ধারণানির্মাণের উপায়'-কে যাচাই করে নিতে হবে। আমার মতে, বস্তুবিশেষ সম্পর্কে তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ধারণানির্মাণ উচিত নয়— ইতোমধ্যেই ধারণাকৃত বস্তু ভালো মানের ধারণানির্মাণের একমাত্র উপাদান হতে পারে না। আমাদের ধারণানির্মাণ যে ঐতিহাসিক অবস্থা/শর্তাবলী দ্বারা প্রণোদিত, সেগুলোকে আমাদের জানতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক সচেতনতা আমাদের প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত যা যাচাই করে নিতে হবে তা হল কোন ধরনের বাস্তবতা নিয়ে আমরা কাজ করছি।

সুপরিচিত এক ফরাসি সংবাদপত্রে জনৈক লেখক একদা বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছিলেন: 'এত বেশি মানুষ আজ ক্ষমতার কথা তুলছে কেন? তা কি এতই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়? তা কি এতই স্বাধীন-স্বতন্ত্র একটি প্রসঙ্গ যে অন্যান্য সমস্যাবলী বিচারের মধ্যে না এনেই তা আলোচনা করা যাবে?'

লেখকপ্রবরের বিস্ময় আমাকে অবাক করে। এই বিশ শতকেই প্রথম একথা এভাবে তোলা হচ্ছে বলে যে তিনি ধরে নিয়েছেন, তা নিয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। যাই হোক না কেন, আমাদের কাছে এ কেবল একটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন নয়, এ আমাদের অভিজ্ঞতার অংশ। এই প্রসঙ্গে আমি ফ্যাসিবাদ ও স্তালিনবাদের উল্লেখ করব — যা হল দুটি 'রোগবিকারগ্রস্ত' রূপ বা ক্ষমতার দুটি বিশেষ 'ব্যাধি'। অসংখ্য কারণে এই দুটো রূপ আমাদের হতবুদ্ধি করে। তার মধ্যে একটি কারণ হল এই যে ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও এগুলো পুরোপুরি অভিনব নয়। তারা বিস্তৃতিলাভ করেছিল অধিকতই অন্যান্য সমাজে বিদ্যমান কলাকৌশলকে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে। অধিকন্তু, তাদের নিজস্ব অন্তর্নিহিত ক্ষিপ্ততা সত্ত্বেও, তারা আমাদের রাজনৈতিক যৌক্তিকতার প্রকরণগুলোকেও বড় মাত্রায় ব্যবহার করেছিল।

ক্ষমতা-সম্পর্কের এক নয়া অর্থনীতি আমাদের প্রয়োজন। এখানে 'অর্থনীতি' শব্দটি তার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় অর্থেই ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যাক। কান্টের সময় থেকে অভিজ্ঞতা-প্রদত্ত সীমাকে ছাড়িয়ে যাওয়া থেকে যুক্তিকে বিরত করাই হয়েছে দর্শনের কাজ। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠা ও সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিকশিত হওয়ার সেই যুগপৎ সময় থেকে রাজনৈতিক যৌক্তিকতার অত্যধিক ক্ষমতার উপর নজর রাখাও দর্শনের প্রত্যাশিত ভূমিকা হয়ে উঠেছে। এই প্রত্যাশা আড়ে-বহরে বেশ বড়।

এসব তুচ্ছ তথ্য সবার জানা। কিন্তু তুচ্ছ বলেই তো তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়না। বরং আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে কোন নির্দিষ্ট ও

হয়তো-বা-অভিনব সমস্যা এই তথ্যের সঙ্গে যুক্ত তা খুঁজে বের করা বা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা।

যুক্তিসংগতি-নির্মাণ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অত্যাধিক্যের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট। সে সম্পর্কের অস্তিত্ব স্বীকার করার জন্য নিশ্চয়ই আমলাতন্ত্র বা বন্দিশিবির-হত্যাশিবিরের ডালপালা ছড়ানো অবধি অপেক্ষা করার দরকার হয়না। কিন্তু সমস্যা হল, এমন সুস্পষ্ট তথ্য নিয়ে আমরা কী করব?

আমরা কি যুক্তির আশ্রয় নেব? আমার মতে, তার চেয়ে নিষ্ফলা আর কিছু হতে পারেনা। কারণগুলো বলি একে একে। প্রথমত অপরাধ-পাপ বা নিষ্পাপ-য়ের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়ত, অযুক্তির বিপরীত হিসেবে যুক্তিকে তুলে ধরা অর্থহীন। শেষত, তেমন কোনও প্রচেষ্টা আমাদের হয় যৌক্তিকতাবাদী নয়ত অযৌক্তিকতাবাদী হওয়ার ক্লান্তিকর স্বেচ্ছাচারী অভিনয়ের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলে। আলোকপ্রাপ্তির (Enlightenment) যুগ থেকে জন্ম নেওয়া আমাদের সংস্কৃতির দ্যোতক এই জাতীয় যৌক্তিকতাবাদকে কি তাহলে আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করে যাচাই করব? আমার মনে হয় যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সদস্যরা কেউ কেউ এই পথ নিয়েছিলেন। তাঁদের কাজের সূত্র ধরে আরও একটা আলোচনা শুরু করা আমার উদ্দেশ্য নয়, যদিও তাঁদের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বলে আমি মনে করি। বরং, যুক্তিসংগতি-নির্মাণ এবং ক্ষমতার মধ্যে যোগসূত্রগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করার অন্যতর একটি উপায় আমি প্রস্তাব করব।

একটি সমাজ বা সংস্কৃতির যুক্তিসংগতি-নির্মাণ প্রক্রিয়াকে সমগ্র একক হিসেবে না ধরে মৌলিক অভিজ্ঞতার নিরিখে ক্ষিপ্ততা, ব্যাধি, মৃত্যু, অপরাধ, যৌনতা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার বিচার-বিশ্লেষণ করা বিচক্ষণের কাজ হবে বলে আমার মনে হয়।

আমার মনে হয় যে 'যুক্তিসংগতি-নির্মাণ' শব্দটি বেশ বিপজ্জনক। সবসময় যুক্তিসংগতি-নির্মাণের এগোনোর পথকে সাধারণভাবে ধরার চেয়ে বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের যুক্তিসংগতি ধরে বিচার-বিশ্লেষণের কাজ আমাদের করতে হবে।

যদিও আলোকপ্রাপ্তির (Enlightenment) যুগ আমাদের ইতিহাসে ও রাজনৈতিক প্রয়োগবিদ্যা বিকাশের প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে আছে, তবু

আমাদের নিজেদের ইতিহাসের ফাঁদে কীভাবে আমরা নিজেরাই জড়িয়ে পড়লাম তা বুঝতে গেলে আমাদের আরও পিছনের আরও দূরবর্তী প্রক্রিয়াসমূহকে বিবেচনা করতে হবে।

ক্ষমতা-সম্পর্কের এক নতুন অর্থনীতির অভিমুখে এগোনোর এমন আরেকটি পথ আমি প্রস্তাব করতে চাই যা আরও বেশি অভিজ্ঞতা-নির্ভর, বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে আরও বেশি সম্পর্কযুক্ত এবং তত্ত্ব ও চর্চার মধ্যে আরও নিবিড় সম্পর্কের দাবিদার। সেই পথ প্রতিরোধের বিভিন্ন রূপকে শুরুর বিন্দু হিসেবে নিতে চায়। অন্যতর রূপকের মধ্য দিয়ে বললে, ক্ষমতা-সম্পর্কগুলোকে দৃশ্যমান করে তোলার জন্য, সেগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য এবং সেগুলোর প্রয়োগবিন্দু ও প্রয়োগপদ্ধতি বোঝার জন্য প্রতিরোধকে একটি রাসায়নিক অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার করতে চায় এই পথ। এই পথ হল অন্তর্গত যৌক্তিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করার বদলে কৌশলের সম্মুখ-সংঘাতের জমিতে তাকে বিশ্লেষণ করার পথ।

উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সমাজে (মানসিক ও দৈহিক) 'সুস্থতা' বলতে কী বোঝায় তা খুঁজে দেখার জন্য অসুস্থতার ক্ষেত্রটিতে কী ঘটে চলেছে তা হয়ত আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হবে।

অথবা, 'আইনসিদ্ধ' বলতে কী বোঝায় তার খোঁজে অনুসন্ধান চালাতে হবে বেআইনি ক্ষেত্রের ভিতরে।

আর, ক্ষমতা-সম্পর্কগুলোকে বোঝার জন্য প্রতিরোধের বিভিন্ন রূপ এবং ক্ষমতা-সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্নতা তৈরির নানারকম প্রচেষ্টার মধ্যে অনুসন্ধান চালাতে হবে।

সূচনাবিন্দু হিসেবে গত কয়েক বছর ধরে দানা বাঁধা এক সারি বিরুদ্ধতার কথা ধরা যাক: নারীদের উপর পুরুষের ক্ষমতার বিরোধিতা, শিশুদের উপর অভিভাবকদের ক্ষমতার বিরোধিতা, মনোরোগীদের উপর মনোচিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষমতার বিরোধিতা, জনগণের উপর ওষুধের ক্ষমতার বিরোধিতা, মানুষের জীবনযাপনের উপায়ের উপর প্রশাসনের ক্ষমতার বিরোধিতা।

শুধুমাত্র এটুকু বলাই যথেষ্ট নয় যে এগুলো সবই প্রাধিকার-বিরোধী (anti-authority) সংগ্রাম, এগুলোর সাধারণ চরিত্রকে আরও নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা যায় এইভাবে:

১. সব সীমানাকে আড়াআড়ি ছেদ করে বিস্তার পায় এই সংগ্রামগুলো। অর্থাৎ, তারা একটি কোনও দেশে সীমাবদ্ধ নয়। কিছু কিছু দেশে তুলনায় বেশি সহজে বেশি বিস্তার নিয়ে বিকশিত হলেও এই সংগ্রামগুলো কোনও বিশেষ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক শাসনরূপের মধ্যে আটকে নেই।

২. এই সংগ্রামগুলো সরাসরি ক্ষমতা-প্রভাবকে নিশানা করে। যেমন, চিকিৎসকের পেশাকে এ কারণে সমালোচনা করা হয় না যে তা মুনাফা উৎপাদনকারী উদ্যোগ, বরং সমালোচনা করা হয় এই কারণে যে তা মানুষের দেহ, স্বাস্থ্য ও জীবন-মৃত্যুর উপর অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা চর্চা করে।

৩. এগুলো 'আশু' সংগ্রাম। দুটি কারণে তা বলা যায়। প্রথমত, এমত সংগ্রামে সাধারণ মানুষ তার ব্যক্তিসত্তার উপর চেপে বসা ক্ষমতার সবচেয়ে কাছের দৃষ্টান্তগুলোর সমালোচনা ও বিরোধিতা করে। এই সংগ্রামগুলো 'প্রধান শত্রু' নির্ণয় করার চেষ্টা করে না, আশু শত্রুর বিরুদ্ধেই সক্রিয় হয়। দ্বিতীয়ত, এই সংগ্রামগুলো তাদের চিহ্নিত সমস্যার সমাধানকে ভবিষ্যতের গর্ভে স্থিত বলে দেখে না (যেমনটা দেখে থাকে মুক্তি-অর্জন, বিপ্লব, শ্রেণিসংগ্রাম-অবসানের নানা প্রকল্প)। তাত্ত্বিক স্তরের ব্যাখ্যাদান বা ঐতিহাসিক মেরুকরণ ঘটানো বিপ্লবী শৃঙ্খলার তুলনায় এগুলো নৈরাষ্ট্রবাদী সংগ্রাম।

কিন্তু তাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এখানেই শেষ নয়। তাদের আরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো হল :

৪. এই সংগ্রামগুলো এমন যা ব্যক্তিবিশেষের অবস্থানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। একদিক থেকে দেখলে, এগুলো আলাদা রকম হওয়ার অধিকারের দাবি সজোরে উপস্থিত করে এবং যা যা একজন ব্যক্তিকে প্রকৃতই ব্যক্তিবিশেষ করে তোলে সেসবের উপর জোর ফেলে। অন্যদিক থেকে দেখলে, এগুলো সেই সবকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে তোলে যা অপরের সঙ্গে যোগসূত্রকে ছিন্ন করে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে, লোকসামাজিক জীবনকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে, নিজের গণ্ডির কারাগারে ব্যক্তিকে বন্দি করে নির্মিত স্বপরিচিতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। এই সংগ্রামগুলো ঠিক 'ব্যক্তিসত্তা'-র পক্ষে বা বিপক্ষে নয়, বরং এগুলো 'বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তায় বন্দি করে সংঘটিত শাসন'-য়ের বিরুদ্ধে।

৫. ক্ষমতার যে বিভিন্ন প্রভাব জ্ঞান-দক্ষতা-যোগ্যতা-র সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরোধিতা করে এই সংগ্রামগুলো এবং জ্ঞানের জন্য বিশেষ সুবিধা বরাদ্দ হওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে। আবার, সাধারণ মানুষের উপর আরোপ করা গোপনীয়তার বাধা, বিকৃতি ও দুর্জ্ঞেয়তার ছলনারও বিরোধিতা করে এই সংগ্রামগুলো । এগুলোর মধ্যে 'বৈজ্ঞানিকতা-গর্বী' উন্নাসিকতা নেই (অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মূল্য নিয়ে কোনও উদ্ধত মতবাদপ্রসূত বিশ্বাস নেই)। আবার অন্যদিকে, যাচাই হওয়া সত্যকে আপেক্ষিকতার যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করা বা তা নিয়ে অনাবশ্যক সন্দেহ লালন করাও নেই। যেভাবে জ্ঞানের সংবহন হয় ও যে ভূমিকা জ্ঞান পালন করে, সেগুলোকেই প্রশ্নের মুখে ফেলা হয়। সংক্ষেপে বললে, জ্ঞানের শাসনপ্রণালীকে প্রশ্ন করা হয়।

৬. শেষত, বর্তমানের এই সংগ্রামগুলো একটি প্রশ্নকে ঘিরে আবর্তিত হয়, তা হল: 'আমরা কে?' যে সব বিমূর্তায়ন এবং রাষ্ট্রীয় হিংসার অর্থনৈতিক ও মতবাদিক রূপ আমাদের ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বগত রূপকে অগ্রাহ্য করে, সেসবকে প্রত্যাখ্যান করে এই সংগ্রামগুলো। আমরা যে কী তা নির্ধারণ করে দিতে চায় যেসব বৈজ্ঞানিক ও প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তি, সেসবকে প্রত্যাখ্যান করে এই আন্দোলনগুলো।

সারসংক্ষেপ করে বললে, যত না কোনও নির্দিষ্ট ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী, অভিজাত দল বা শ্রেণিকে আক্রমণ করা, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতার একটি রূপ বা প্রয়োগকৌশলকে আক্রমণ করাই হল এই সংগ্রামগুলোর লক্ষ্য।

ক্ষমতার এই যে রূপ আশু দৈনন্দিন জীবনের উপর প্রযুক্ত হয়, তা ব্যক্তিকে বর্গীকরণের মধ্যে ফেলেবিভক্ত করে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দিয়ে চিহ্নিত করে, স্ব-পরিচিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ব্যক্তির উপর এমন এক সত্যের নিয়ম আরোপ করে যা তাকে নিজেকে স্বীকার করতে হবে এবং অন্যকেও তার মধ্যে স্বীকার করতে হবে। 'বিষয়ী'-র ইংরেজি প্রতিশব্দ 'subject' শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়: একটি হল নির্ভরশীল বা নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার কারণে অন্য কারও অধীনস্থ হওয়া, আর দ্বিতীয়টি হল নিজ স্বপরিচয়ের সঙ্গে বিবেকবোধ ও আত্মজ্ঞানের বন্ধনে বদ্ধ হওয়া। উভয় অর্থই ক্ষমতার এমন এক রূপকে নির্দেশ করে যা নির্ভরশীল, অধীনস্থ করে তোলে।

সাধারণভাবে বললে, সংগ্রাম তিন ধরনের হতে পারে। প্রথম ধরন হল (নৃগোষ্ঠীগত, সামাাজিক ও ধর্মীয়) আধিপত্য-রূপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। দ্বিতীয় ধরন হল ব্যক্তিকে নিজ উৎপাদ থেকে বিচ্ছিন্নকারী শোষণরূপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আর তৃতীয় ধরনটি হল ব্যক্তিকে তার নিজের সঙ্গে বেঁধে রেখে অন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে যেসব বন্ধন সেসবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম (অধীনস্থকরণ বা assujettissement-য়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বিষয়ীভাব ও আত্মসমর্পণের বিবিধ রূপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম)।

একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন রূপে বা মিশ্র রূপে এই তিন ধরনের সংগ্রামের প্রচুর উদাহরণ আমরা ইতিহাসে খুঁজে পাব। কিন্তু যখন এরা মিশ্রিত রূপে দেখা দেয়, তখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনও একটি তাদের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। যেমন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজগুলোয় নৃগোষ্ঠীগত বা সামাজিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রধান হয়ে উঠেছিল, যদিও বিদ্রোহের কারণসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক শোষণও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

উনিশ শতকে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সামনে উঠে এসেছিল।

আর আজ অধীনস্থকরণের বিবিধ রূপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বিষয়ীভাবের অত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, যদিও আধিপত্য ও শোষণের বিবিধ রূপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অবসিত তো হয়ই নি বরং আরও প্রকট হয়েছে।

তবে আমার মনে হয় না যে আমাদের সময়েই সমাজ প্রথমবার এহেন সংগ্রামের মুখোমুখি হল। পনেরো বা ষোল শতকে যেসব সংগ্রামের প্রধান অভিব্যক্তি ও ফলাফল ছিল ধর্মসংস্কার (Reformation), সেগুলোকেও পশ্চিমী অভিজ্ঞতায় বিষয়ীভাবের বড় সংকট থেকে জন্ম নেওয়া বলে দেখা এবং মধ্যযুগে বিষয়ীভাবকে আকার দিয়েছিল যে ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষমতা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে বিশ্লেষণ করাই সমীচীন হবে। আধ্যাত্মিক জীবনে বা মুক্তি-আকাঙ্খা চালিত কর্মে মহান গ্রন্থে স্থিত সত্যে প্রত্যক্ষ অংশ নেওয়ার তাগিদ সর্বতভাবে এক নতুন বিষয়ীভাবের জন্য সংগ্রাম ছিল।

জানি যে এখানে আপত্তি উঠতে পারে। বলা হতে পারে: 'সব রকমের অধীনতাই প্রতীতি হিসেবে অন্য কিছু থেকে উপজাত হয়, নেহাতই তা অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়াদির ফলাফল; উৎপাদিকা শক্তি, শ্রেণিসংগ্রাম ও মতবাদিক কাঠামোই বিষয়ীভাবের রূপ নির্ধারণ করে।'

এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে অধীনস্থকরণের কৌশল ও পদ্ধতি শোষণ-আধিপত্যের সঙ্গে বিযুক্ত ভাবে পাঠ করা যায়না। কিন্তু তাই বলে তা কেবল অধিকতর মৌলিক কৌশল ও পদ্ধতির অন্তিম ফল নয়। অন্যান্য রূপের সঙ্গে তার সম্পর্ক জটিল ও বৃত্তীয়।

আমাদের সমাজে এই ধরনের সংগ্রামের প্রাধান্যবিস্তার করার কারণ হল এই যে ষোল শতক থেকে এখানে ক্ষমতার এক নতুন রাজনৈতিক রূপের বিকাশ ক্রমান্বয়ে ঘটে চলেছে। সবাই জানে যে এই নতুন রাজনৈতিক কাঠামোটি হল রাষ্ট্র। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ে মনে করা হয়ে থাকে যে রাষ্ট্র হল রাজনৈতিক ক্ষমতার এমন এক ধরন যা ব্যক্তিকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল সমগ্রের স্বার্থকে নজরে রাখে। সমগ্রের স্বার্থ বলতে নাগরিকদের মধ্যের একটা শ্রেণি বা গোষ্ঠীর স্বার্থের কথা বোঝানো হয়।

অবশ্যই তা সত্য। কিন্তু আমি এই বাস্তবতার উপর জোর দিতে চাইব যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা যেমন সমগ্রতে বাঁধে, একইসঙ্গে তেমন তা ব্যক্তিঅস্তিত্বেও বিভাজিত করে (আর এটাই তার শক্তিমত্তার অন্যতম উৎস)। মানুষের নানাবিধ সমাজের ইতিহাসে বোধহয় এর আগে কখনও— এমনকি প্রাচীন চৈনিক সমাজেও— একই রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিরূপে বিচ্ছিন্নকরণের কৌশল ও সর্বাত্মক সমূহে বাঁধার কৌশলের এমন চতুর মিশ্রণ ঘটেনি।

এর কারণ হল এই যে আধুনিক পশ্চিমী রাষ্ট্র নয়া আধারে খ্রিস্টিয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে জন্ম নেওয়া ক্ষমতার এক পুরানো প্রয়োগকৌশলকে সন্নিবদ্ধ করেছে। সেই প্রয়োগকৌশলকে 'যাজকীয় ক্ষমতা' নাম দেওয়া যেতে পারে।

আগে এই যাজকীয় ক্ষমতা নিয়ে কিছু কথা বলে নেওয়া যাক।

প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে প্রাচীন বিশ্বের নীতি-সংহিতাগুলোর চেয়ে মৌলিকভাবে আলাদা এক নীতিশাস্ত্র সংহিতার জন্ম দিয়েছিল খ্রিস্টিয় ধর্ম। কিন্তু এর উপর তুলনায় কম গুরুত্ব দেওয়া হয় যে খ্রিস্টিয় ধর্ম নানা নতুন ক্ষমতাসম্পর্কের প্রস্তাবনা করেছিল এবং প্রাচীন বিশ্ব জুড়ে তা ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল।

খ্রিস্টিয় ধর্মই একমাত্র ধর্ম যা 'চার্চ' হিসেবে নিজেকে সংগঠিত করেছে। তার মধ্য দিয়ে তা এই সতঃসিদ্ধের জন্ম দিয়েছে যে কতিপয় ব্যক্তি নিজ ধর্মীয় গুণের দ্বারা অপরের সেবা করতে পারে। এই সেবাকাজ কোনও

শাসক বা রাজপুরুষ বা ভবিষ্যদ্বক্তা বা জ্যোতিষী বা পরোপকারী বা শিক্ষাপ্রসারক রূপে নয়, বরং যাজক রূপে। 'যাজক' শব্দটি এক বিশেষ ধরনের ক্ষমতারূপকে চিহ্নিত করে, যেমন:

১. এমন এক ক্ষমতারূপ যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল পরবর্তী বিশ্বে ব্যক্তিগত পরিত্রাণলাভের নিশ্চয়তা দান।

২. যাজক ক্ষমতারূপ কেবল আদেশ/নির্দেশ প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার উপর নির্ভরশীল জনেদের (যাদের 'flock' অর্থাৎ 'পাল' বলে চিহ্নিত করা হল) হিত ও পরিত্রাণের জন্য আত্মবলিদান দিতে প্রস্তুত থাকাও তার অন্তর্গত। এভাবেই তা রাজকীয় ক্ষমতার থেকে ভিন্ন কারণ রাজকীয় ক্ষমতা রাজ-সিংহাসন রক্ষার্থে প্রজাদের বলিদান দিতে তৈরি থাকে।

৩. সামগ্রিকভাবে গোষ্ঠীর দেখভাল করার পাশাপাশি এই ক্ষমতারূপ প্রতিটি ব্যক্তিমানুষকেও বিশেষ রূপে গোটা জীবনকাল ধরে দেখভালের মধ্যে রাখে।

৪. জনগণের শেষতম মানুষটিরও মনের ভিতর অবধি জেনে নিয়ে, সত্তার আনাচকানাচ অবধি ঢুঁড়ে ফেলে, গভীরতম গোপন কথাটি অবধি কবুল করতে বাধ্য করে তবেই এই ক্ষমতারূপের চর্চা বা প্রয়োগ করা যায়। সেই হিসেবে, বিবেকবোধ সম্পর্কে জ্ঞান ও বিবেকবোধকে নির্দেশিত করতে পারার সামর্থ্যের উপর এই ক্ষমতারূপ প্রতিষ্ঠিত।

এই ক্ষমতারূপ পরিত্রাণ-কেন্দ্রিক (যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে এর বৈপরীত্য), নৈবেদ্যসুলভ (সার্বভৌমত্বের নীতির সঙ্গে এর বৈপরীত্য), ব্যক্তিসত্তায় বিভাজনকারী (আইনি ক্ষমতার সঙ্গে এর বৈপরীত্য), জীবনযাপনের সঙ্গে একটানা আদ্যোপান্ত জড়িয়ে থাকা, এবং সত্যের— ব্যক্তিস্বয়ং সম্পর্কিত সত্যের— উৎপাদনের একটি ধরনের সঙ্গে যুক্ত।

কেউ বলতে পারেন যে এ তো সবই অতীত ইতিহাসের কথা, যাজকপ্রথা সম্পূর্ণ মুছে না গেলেও তা তার ঈপ্সিত ফল ফলানোর ক্ষমতা বেশিরভাগটাই খুইয়েছে।

তা সত্য, তবে যাজকীয় ক্ষমতার দুটো দিকের মধ্যে পার্থক্য টানা উচিত বলে আমার মনে হয়। একটা দিক হল 'চার্চ'-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসৃজন ও প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ, যা আঠারো শতকের পর থেকে বন্ধ হয়েছে, বা অন্তত

তার জীবনীশক্তি খুইয়েছে। অপর দিকটি হল যাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগের কৌশলগত বা পদ্ধতিগত দিক যা 'চার্চ'-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানাদির বাইরে ছড়িয়ে গেছে এবং বহুগুণ বৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ করেছে।

ব্যক্তিসত্তায় বিভাজনকারী ক্ষমতার নতুন বিন্যাস ও নতুন সংগঠন গড়ে ওঠার এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি আঠারো শতকের সময় থেকে ঘটেছে।

ব্যক্তিবিশেষ যে কী তা উপেক্ষা করে, ব্যক্তিঅস্তিত্বকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিদের মাথার উপর 'আধুনিক রাষ্ট্র'-কে বিকশিত করা হয়েছিল বলে ভাবা ঠিক হবে না, বরং ঘটেছে তার উল্টোটাই। 'আধুনিক রাষ্ট্র' গড়ে উঠেছে এমন এক সূক্ষ্ম কাঠামো রূপে যা ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্বকে নির্দিষ্ট কিছু ছাঁচে ঢেলে নবরূপে তার অঙ্গীভূত করতে পারে।

সেইদিক থেকে আমরা রাষ্ট্রকে ব্যক্তিঅস্তিত্বে বিভাজনকারী এক আধুনিক ছাঁচবিন্যাস বা যাজকীয় ক্ষমতার এক নতুন রূপ বলতে পারি।

যাজকীয় ক্ষমতার এই রূপের আরও কয়েকটা দিক হল:

১. যাজকীয় ক্ষমতার নবরূপে অভিপ্রায়ের ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন খেয়াল করা যায়। এই নবরূপে অভিপ্রায়টি আর মানুষকে পরবর্তী বিশ্বে পরিত্রাণের পথ দেখানো নয়, বরং ইহ বিশ্বেই পরিত্রাণের ব্যবস্থা করা। আর প্রাসঙ্গিকভাবে 'পরিত্রাণ' শব্দটি একাধিক ভিন্ন অর্থ ধারণ করতে পারে, যেমন: স্বাস্থ্য, সচ্ছলতা (যথেষ্ট ধন, জীবনযাত্রার মান), নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা থেকে সুরক্ষা। ফলত পরম্পরাগত যাজকীয় ব্যবস্থার ধর্মীয় অভিপ্রায়সমূহ একগুচ্ছ 'ইহজাগতিক ও বৈশ্বিক' অভিপ্রায় দিয়ে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। এই প্রতিস্থাপন সহজতর হয়েছে এই কারণে যে পরম্পরাগত যাজকীয় ব্যবস্থা এহেন ইহজাগতিক ও বৈশ্বিক অভিপ্রায়গুলোর কতিপয়কে আনুষঙ্গিকভাবে ধারণ করে এসেছে বহুকাল— যুগের পর যুগ ধরে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট চার্চগুলো ওষুধপত্র-চিকিৎসা যোগানোয় ও জনকল্যাণ প্রচেষ্টায় যে ভূমিকা পালন করেছে তা খেয়াল করলেই এ কথা বোঝা যাবে।

২. পাশাপাশি, যাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগের আধিকারিককুলের বিপুল বৃদ্ধি ঘটল। কখনও রাষ্ট্রযন্ত্র যাজকীয় ক্ষমতার রূপ প্রয়োগ করত, কখনও বা পুলিশের মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার প্রয়োগ হত। (আমাদের খেয়ালে রাখা উচিত যে প্রথম যখন আঠারো শতকে পুলিশ

বাহিনী গড়ে তোলা হয়, তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা আর সরকারকে তার শত্রুদমনে সাহায্য করাই কেবলমাত্র তার উদ্দেশ্য ছিল না, তার কাছ থেকে আরও নানা ভূমিকা প্রত্যাশিত ছিল। এই প্রত্যাশিত ভূমিকাগুলোর মধ্যে ছিল: শহরে বিবিধ প্রাত্যহিক যোগানের কাজ করা, পরিচ্ছন্নতা ও পৌরস্বাস্থ্য রক্ষা করা, হস্তশিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মান রক্ষার উপায় নিশ্চিত করা।) আবার কখনও এই ক্ষমতারূপের প্রয়োগ হত বেসরকারি উদ্যোগ, গণকল্যাণ সমিতি, পরোপকারী বা সাধারণ মানবহিতৈষীদের মধ্য দিয়ে। পরিবারের মতো কিছু প্রাচীন প্রতিষ্ঠানকেও এহেন যাজকীয় কর্তব্যপালনে শামিল করা হয়েছিল। ওষুধপত্র-চিকিৎসার মতো জটিল নির্মিতি— যার একদিকে ছিল বাজার অর্থনীতির নিয়মে পরিষেবা বিক্রির বেসরকারি উদ্যোগ আর অন্যদিকে ছিল হাসপাতালের মতো সরকারি প্রতিষ্ঠান—তার মধ্য দিয়েও ক্ষমতার এই রূপের প্রয়োগ ঘটত।

৩. শেষত, যাজকীয় ক্ষমতার অভিপ্রায়ের বহর ও প্রতিনিধির সংখ্যা গুণিতক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার এই প্রক্রিয়া মানুষ সম্পর্কে জ্ঞানের বিকাশকে দুটি উদ্দেশ্যকে ঘিরে কেন্দ্রীভূত করল। সেই উদ্দেশ্যদুটি হল: জনসমষ্টি সম্বন্ধে সাধারণিকরণ বা বৈশ্বিকিকরণের পরিমাণভিত্তিক পাঠ, এবং, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-অস্তিত্ব বিশ্লেষণ করার পাঠ।

এইসবের ফলে যে যাজকীয় ক্ষমতা হাজার বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে নির্দিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তা হঠাৎই গোটা সমাজদেহ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল এবং বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভিত্তিস্থাপন করে গেঁড়ে বসল। আগে যেভাবে যাজকীয় ক্ষমতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কমবেশি পরস্পর সংযুক্ত, আবার কমবেশি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে ছিল, তার বদলে ক্ষমতার নবরূপের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল ব্যক্তি-অস্তিত্বে বিচ্ছিন্ন করার একগুচ্ছ কৌশল, যেমন: পরিবার, ওষুধ-চিকিৎসা, মনোবিশ্লেষণ, শিক্ষা এবং নিয়োগকর্তাদের প্রাধিকার।

আঠারো শতকের শেষদিকে 'বার্লিনার মোনাতসখ্রিফট' নামের জার্মান সংবাদপত্রে ইমানুয়েল কান্ট একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটির নাম: 'আলোকপ্রাপ্তি মানে কী?' আজ অবধি দীর্ঘদিন ধরে এই প্রবন্ধটি খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচিত হয়নি। কিন্তু আমার ওই প্রবন্ধটিকে অত্যন্ত

চিত্তাকর্ষক ও চমকপ্রদ বলে মনে হয়, কারণ সেই সর্বপ্রথম একজন দার্শনিক এমন এক দার্শনিক কর্তব্য প্রস্তাব করলেন যা কোনও আধিবিদ্যক কাঠামো বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিসমূহকে বিচার-বিশ্লেষণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সাম্প্রতিক সমসাময়িক ঘটমানতাকেই বিচার-বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু হিসেবে হাজির করছে।

১৮৭৪ সালে 'আলোকপ্রাপ্তি মানে কী?' প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে কান্ট বলতে চেয়েছিলেন: 'এখন ঠিক কী ঘটে চলেছে? আমাদের উপর কী ঘটছে? এই বিশ্ব, এই পর্যায়, আমাদের জীবনযাপনের এই নিখাদ মুহূর্তটি আসলে কী?'

অন্যভাবে বললে, আলোকপ্রাপ্তির যুগের অংশ হিসেবে আমরা ঠিক কী? এই প্রশ্নটিকে কার্তেসিয় প্রশ্ন 'আমি কে?'-র সঙ্গে তুলনা করুন। 'আমি' কি একটি অদ্বিতীয় অথচ সার্বিক ও অনৈতিহাসিক বিষয়ী? দেকার্তের ভাবনায় 'আমি' সর্বজন, সর্বস্থান ও সর্বসময়ে ব্যাপ্ত। কিন্তু কান্টের প্রশ্ন ভিন্ন। 'আমরা ঠিক কী?' ইতিহাসের একটি অতি নির্দিষ্ট মুহূর্তের সাপেক্ষে এই প্রশ্ন। আমরা এবং আমাদের বর্তমান উভয়ের বিশ্লেষণের সূচক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে কান্টের প্রশ্ন।

আমার মনে হয় যে দর্শনের এই দিকটি ক্রমশ আরও গুরুত্ব পেয়েছে। হেগেল, নিৎশে...

অপর দিক, অর্থাৎ 'সার্বিক দর্শনের' দিকটিও অন্তর্হিত হয়নি। কিন্তু, সমসময়ের বিশ্বকে সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণের কাজটি দর্শনের কর্তব্য হিসেবে ক্রমশ আরও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। সমস্ত দার্শনিক সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে নাছোড় হল বর্তমান সময় সম্পর্কিত সমস্যা, নির্দিষ্ট এই মুহূর্তে আমরা ঠিক কী সেই সমস্যা।

হাল আমলে আমরা ঠিক কী তা আবিষ্কার করার বদলে আমরা যা তা অস্বীকার করাকেই চাঁদমারি করা হয়ে থাকে। একদিকে ব্যক্তি-অস্তিত্বে বিচ্ছিন্ন করা ও অপরদিকে আধুনিক ক্ষমতাকাঠামোগুলোর সর্বাত্মকতা প্রতিষ্ঠা— যুগপৎ ক্রিয়াশীল এই রাজনৈতিক 'জোড়া-ফাঁস'-য়ের অবসান ঘটানোর জন্য যথাসম্ভব কী কল্পনা বা সৃজনকাজকে হাতিয়ার করা যায় তার খোঁজ আমাদের করতে হবে।

উপসংহার হিসেবে বলা যায় যে কেবলমাত্র রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ব্যক্তি-অস্তিত্বকে মুক্ত করার চেষ্টাই আমাদের সময়ের রাজনৈতিক-নৈতিক-সামাজিক-দার্শনিক সমস্যা নয়। বরং সেই সমস্যা হল যে কীভাবে

আমরা রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া ব্যক্তি-অস্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করতে ক্রিয়াশীল, তাদের কবল থেকে এবং রাষ্ট্রের থেকে, উভয় থেকেই নিজেদের মুক্ত করতে পারি। বহু শতক জুড়ে ব্যক্তিত্বের নানা ধরন আমাদের উপর আরোপিত হয়েছে, সেসব প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে বিষয়ীভাবের নতুন রূপ সৃষ্টি করাকে আজ উৎসাহিত করতে হবে।

ক্ষমতার চর্চা কীভাবে হয়?

কেউ কেউ মনে করেন যে ক্ষমতা সম্পর্কে 'কীভাবে?' প্রশ্ন করা মানে নিছকই ক্ষমতার প্রভাবাবলী বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা, সেইসব প্রভাবাবলীর কারণসমূহ বা মৌল প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও আলোচনার মধ্যে না যাওয়া। কিন্তু এহেন আলোচনা স্বয়ং ক্ষমতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলা এড়িয়ে গিয়ে ক্ষমতাকে একটা রহস্যময় বস্তু করে তোলে, ক্ষমতাকে প্রশ্ন না করাই পছন্দ করে। প্রত্যক্ষ কারণ উপেক্ষা করার এমন ভাবনারীতি ভাবুককে এক প্রকার অদৃষ্টবাদে পৌঁছে দেয়। কিন্তু এই এড়িয়ে যাওয়া বা উপেক্ষা করার মধ্য দিয়েই কি এমন এক পূর্বধারণার অস্তিত্বকে জানান দেওয়া হয় না, যে পূর্বধারণা ক্ষমতাকে সুস্পষ্ট উৎস, মৌল প্রকৃতি ও বিবিধ বহিঃপ্রকাশ নিয়ে অস্তিত্বমান একটি বস্তুবিশেষ হিসেবে কল্পনা করে নেয়?

এখনকার জন্য 'কীভাবে?' প্রশ্নটিকে যদি আমি কিছুটা গুরুত্ব দিয়ে হাজির করি, তা এই কারণে নয় যে 'কী?' ও 'কেন?' প্রশ্নগুলোকে আমি নাকচ করতে চাইছি। বরং আমি চাইছি ওই প্রশ্নগুলোকে ভিন্নতর উপায়ে হাজির করতে— বা, আরো ভালো করে বললে, বুঝে নিতে চাইছি ক্ষমতাকে এভাবে কল্পনা করা বৈধ হবে কি না যা 'কী?' 'কেন?' ও 'কীভাবে?' প্রশ্নগুলোকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেবে। একটু মোটাদাগে বললে, 'কীভাবে?' প্রশ্ন দিয়ে বিচার শুরু করা মানে এমন এক সন্দেহ নিয়ে শুরু করা যে ক্ষমতার নিজস্ব কোনও অস্তিত্ব নেই। তার মানে নিজেই নিজেকে এ প্রশ্ন করা যে 'ক্ষমতা'-র মতো একটা জমকাল, সর্বাত্মক ও বস্তুরূপপ্রণয়নকারী পদ ব্যবহারের সময় চিন্তার মধ্যে ঠিক কী খেলা করে। তার মানে এই সন্দেহ নিয়ে শুরু করা যে 'ক্ষমতা কী ও ক্ষমতা কোথা থেকে আসে?' এই যুগল প্রশ্ন নিয়ে সময় কাটিয়ে দেওয়া বাস্তবতার জটিল বিন্যাস উন্মোচিত করার

কাজ অধরাই রেখে দিতে পারে। 'কী ঘটে?'– এই সোজাসাপটা তথ্যাকাঙ্খী প্রশ্ন লুকানো পথে সিঁধ কেটে অধিবিদ্যা বা ক্ষমতার প্রকৃতিবিশ্লেষণ সংক্রান্ত তত্ত্ববিদ্যাকে নিয়ে আসার জন্য নয়, বরং ক্ষমতার বিষয়আশয় সম্পর্কে সমালোচনাত্মক অনুসন্ধান শুরু করার জন্যই তোলা হচ্ছে।

আমি যখন 'কীভাবে ?' বলছি, তখন 'কীভাবে ক্ষমতা নিজেকে প্রকাশ করে?'-এই প্রশ্নের অর্থে 'কীভাবে' বলছি না। 'কীভাবে ক্ষমতার চর্চা হয় ?' বা 'কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যখন অপরের উপর (চলতি কথায়) ক্ষমতাপ্রয়োগ করে, তখন কী ঘটে ?'- এই প্রশ্নযুগলের অর্থে 'কীভাবে?' বলছি।

এই অর্থে ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ক্ষমতার দুই প্রকারের মধ্যে ফারাক করতে হয়। এক প্রকার ক্ষমতা বস্তুর উপর প্রযুক্ত হয়ে বস্তুকে রূপান্তরিত করা, ব্যবহার করা, ভোগ করা বা ধ্বংস করার সক্ষমতা দেয়। এই প্রকার ক্ষমতা দেহে নিহিত ঝোঁক/প্রবণতা থেকে উৎসারিত হয়, অথবা দেহের বহিঃস্থ হাতিয়ার দ্বারা বাহিত হয়ে আসে। বলা যেতে পারে যে তা 'সামর্থ্য'-র প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। এর অপর দিকে আছে সেই প্রকার ক্ষমতা যার বিশ্লেষণ করাই আমাদের লক্ষ্য। এই প্রকার ক্ষমতার চরিত্রবৈশিষ্ট্য হল যে তা ব্যক্তিবিশেষদের মধ্যে (বা গোষ্ঠীদের মধ্যে) বিভিন্ন সম্পর্ককে কার্যকরী করে তোলে। আমরা যখন আইনের ক্ষমতার কথা বলি, প্রতিষ্ঠান বা মতবাদের ক্ষমতার কথা বলি, ক্ষমতার কাঠামো বা পদ্ধতি বা কৌশলের কথা বলি, তা সেই মাত্রাতেই বলা সম্ভব হয় যে মাত্রায় আমরা কতিপয় মানুষদের দ্বারা অপর মানুষদের উপর ক্ষমতা খাটানোর কথা ধরে নিই— এ বিষয়ে নিজেদের ভুল বুঝিয়ে লাভ নেই। 'ক্ষমতা' পদটি এখানে 'অংশীদারদের' মধ্যেকার সম্পর্কগুলোকে নির্দেশ করছে। (এ কথা বলার মধ্য দিয়ে আমি নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত কোনও ক্রীড়ার কথা বলছি না। আপাতত অতি সাধারণভাবে বলা যায় যে আমি নানা ক্রিয়ার এমন এক সম্মিলনের কথা বলছি যে ক্রিয়াগুলো নিজে অপরকে প্রবৃত্ত করে, আবার, অপরের দ্বারা নিজে প্রবৃত্ত হয়।)

জ্ঞাপন-সম্পর্ক ভাষার বা অন্য কোনও চিহ্নব্যবস্থার সংকেততন্ত্রের মাধ্যমে তথ্য সংবহন করে। সেই জ্ঞাপন-সম্পর্কের সঙ্গে ক্ষমতা-সম্পর্ক কোথায় আলাদা তা চিহ্নিত করা দরকার। সন্দেহ নেই যে জ্ঞাপনের মাধ্যমে

সর্বদাই কোনও না কোনও ভাবে মানুষকে বা মানুষদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়। অর্থবাহী উপাদানের উৎপাদন ও চলাচল প্রক্রিয়ার অভিপ্রায় বা ফলাফল হিসেবে ক্ষমতা-জগতের কোনও পরিণাম ফলতে পারে, কিন্তু তাই বলে ক্ষমতা-জগতের পরিণাম সোজাসাপটাভাবে জ্ঞাপনপ্রক্রিয়ার একটা দিক নয়। জ্ঞাপনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার বিস্তার ঘটুক বা না ঘটুক, ক্ষমতা-সম্পর্কগুলোর প্রকৃতি স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট।

সুতরাং, ক্ষমতা-সম্পর্ক, জ্ঞাপন-সম্পর্ক ও বৈষয়িক সামর্থ্যকে এক করে ফেলা উচিত হবেনা। অবশ্য এমন নয় যে এগুলো তিনটে পরস্পর-পৃথক ক্ষেত্রে বিরাজ করে। অর্থাৎ, এমনটা নয় যে তিনটে সম্পূর্ণ আলাদা ক্ষেত্র, যার একটায় থাকে বস্তুরাজি, নিখুঁত প্রয়োগকৌশল, কাজ ও বাস্তবের রূপান্তরসাধন, আরেকটায় থাকে চিহ্ন/সংকেত, জ্ঞাপন, পারস্পরিকতা ও অর্থোৎপাদন, আর শেষেরটিতে থাকে বাধা-বন্ধনের উপায়, অসাম্যের উপায় ও মানুষের উপর মানুষের ক্রিয়া। আসলে সম্পর্কের এই তিন ধরন কার্যত একে অপরের মধ্যে ঢুকে থাকে, পারস্পরিক সমর্থন যোগায় এবং অভিপ্রায় পূরণে একে অপরকে ব্যবহার করে। বৈষয়িক সামর্থ্যগুলোর সবচেয়ে প্রাথমিক প্রয়োগও (পূর্ব-আহরিত তথ্যের রূপে বা অংশীদারি কাজের রূপে) জ্ঞাপনসম্পর্কগুলোর ইঙ্গিত বহন করে এবং (বাধ্যতামূলক কর্তব্য নির্ধারণের মধ্য দিয়ে, বা, পরম্পরা বা শিক্ষানবিসী দ্বারা আরোপিত ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে, বা, কমবেশি বাধ্যতামূলক শ্রমবন্টনের ক্ষুদ্রতর ভাগের মধ্য দিয়ে) ক্ষমতা-সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত হয়। জ্ঞাপনসম্পর্কগুলোও অভিপ্রায়-নিয়ন্ত্রিত কর্মের ইঙ্গিত বহন করে (এমনকি যদি শুধু তা অভিপ্রায়যুক্ত অর্থের উপাদানগুলোকে সঠিকভাবে ক্রিয়াশীল করার মধ্য দিয়েও হয়) এবং অংশীদারদের মধ্যেকার তথ্যক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটানোর মধ্য দিয়ে ক্ষমতার প্রভাব উৎপন্ন করে। চিহ্ন/সংকেতের উৎপাদন ও বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসম্পর্কচর্চার গুরুত্ব ক্রমশ আরও ব্যাপ্ত হচ্ছে এবং ক্ষমতাচর্চা অনুমোদিত অভিপ্রায়-নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে খুব অল্প ক্ষেত্রেই তাদের ফারাক টানা যায় (অভিপ্রায়-নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াকলাপের কিছু উদাহরণ: প্রশিক্ষণ প্রণালী, আধিপত্য জারির বিভিন্ন প্রক্রিয়া, বাধ্যতা-বশ্যতা আদায় করার বিভিন্ন উপায়), বা, কার্যকরী হওয়ার তাড়নায় তারা ক্ষমতাসম্পর্কের দ্বারস্থ হয় (উদাহরণ: শ্রমবিভাজন ও কাজের উচ্চাবচ ধাপবন্দি কাঠামো)।

এই তিন ধরনের সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয় কখনই সমরূপ ও অপরিবর্তনীয় হয় না। প্রদত্ত কোনও সমাজে অভিপ্রায়-নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াকলাপ, জ্ঞাপনব্যবস্থা ও ক্ষমতাসম্পর্কগুলোর মধ্যে কোনও সাধারণ চরিত্রের ভারসাম্য থাকে না। বরং, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন রূপে বিশেষ বিশেষ আদল অনুযায়ী আন্তঃসম্পর্কগুলো গড়ে ওঠে। অবশ্য এমন বিভিন্ন 'সমাবেশ'-ও আছে যেখানে সামর্থ্য, জ্ঞাপনের উপায় ও ক্ষমতাসম্পর্কগুলোর মধ্যে বোঝাপড়া নিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার চেহারা ধারণ করে। উদাহরণ হিসেবে একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা ধরা যায়। একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যেভাবে বিভাজিত ও বরাদ্দ করা হয়, তার আভ্যন্তরীণ জীবন যে বিশদ নিয়মাবলীর দ্বারা প্রশাসিত হয়, যে বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সেখানে সংগঠিত করা হয়, সুনির্দিষ্ট চরিত্রের ও নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনকারী যে বিবিধ ব্যক্তিবর্গ সেখানে বাস করে বা মিলিত হয়— তা সবই সামর্থ্য-জ্ঞাপন-ক্ষমতার এক সমাবেশ তৈরি করে। নিয়ন্ত্রিত জ্ঞাপনের সমষ্টির (নির্ধারিত পাঠ, প্রশ্নোত্তর, নির্দেশাবলী, উপদেশাবলী, বাধ্যতা-বশ্যতা চিহ্নায়ক সংহিতা, প্রতিটি ব্যক্তিবিশেষের 'মূল্য' সম্পর্কে বিভেদক নির্ধারণ) মধ্য দিয়ে এবং ক্ষমতাপ্রক্রিয়ামালার (আবদ্ধকরণ, নজরদারি, পুরস্কার ও শাস্তি-র ব্যবস্থা, পিরামিড আকৃতির ধাপবন্দি কাঠামো) মধ্য দিয়ে শিক্ষা সংবহন ও ঝোঁক/দক্ষতা/আচরণ রপ্ত করানো নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া কার্যকরী করা হয়।

এ ধরনের যে সমস্ত সমাবেশে প্রায়োগিক সামর্থ্য, জ্ঞাপনক্রীড়া ও ক্ষমতাসম্পর্কগুলোর নিয়োগ বিবেচিত সূত্র অনুযায়ী একে অপরের উপযোগী রূপ ধারণ করে, তারা এক একটা 'শৃঙ্খলা' তৈরি করে বলে বলা যায় ('শৃঙ্খলা' শব্দটির অর্থ কিছুটা প্রসারিত করে)। এই কারণেই যেভাবে এই শৃঙ্খলাগুলো ঐতিহাসিকভাবে রূপগ্রহণ করেছে তার লব্ধ অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ মনোযোগ দাবি করে। প্রথমত, আস্রাবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে স্বচ্ছ করা সব ব্যবস্থা অনুযায়ী এই শৃঙ্খলাগুলো দেখায় কীভাবে বৈষয়িক চরমাবস্থা, নানা জ্ঞাপনব্যবস্থা এবং ক্ষমতাকে একসঙ্গে ঝালাই করা যায়। গ্রন্থনার বিভিন্ন ছাঁচেরও দেখা পাওয়া যায়— কখনও ক্ষমতাসম্পর্ক ও বাধ্যতা প্রধান হয়ে ওঠে (সন্ন্যাসীমঠ/নিভৃতবাস বা অনুতাপ/প্রায়শ্চিত্ত/শাস্তি জাতীয় শৃঙ্খলায়), কখনও অভিপ্রায়-নির্দেশিত ক্রিয়াকলাপ প্রধান হয়ে ওঠে (কর্মশিবির বা হাসপাতালে যেমন), আবার কখনও তিন ধরনের সম্পর্কের

সংপৃক্তি প্রধান হয়ে ওঠে (যেমন সম্ভবত ঘটে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলায় যেখানে প্রায় প্রয়োজনাতিরিক্ততার সীমা ছোঁয়া অত্যাধিক বহুল চিহ্ন/সংকেত প্রায়োগিক প্রভাব ফলানোর জন্য সযত্নে নিরূপিত দৃঢ়সংবদ্ধ ক্ষমতাসম্পর্ক নির্দেশ করে)।

আঠারো শতক থেকে ইউরোপের সমাজগুলোর এহেন শৃঙ্খলাবদ্ধকরণের মানে এমনটা বুঝলে হবে না যে এই সমাজগুলোর ব্যক্তিএককরা আরো বেশি বেশি করে বাধ্য হয়ে উঠেছে, এমনটাও বুঝলে হবে না যে সমাজগুলো ব্যারাক, স্কুল বা জেলখানায় পরিণত হচ্ছে; বরং বুঝতে হবে যে উৎপাদনের কর্মকাণ্ড, জ্ঞাপনজালের সংস্থান ও ক্ষমতাসম্পর্কের ক্রীড়ার মধ্যে আরও যুক্তিসঙ্গত ও আরও অর্থনৈতিক এমন এক সঙ্গতিরচনাপ্রক্রিয়ার খোঁজ চলেছে, যে প্রক্রিয়াকে আরও নিবিড়ভাবে নজরদারিভুক্ত করা যায়।

সুতরাং, 'কীভাবে?' বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে 'ক্ষমতা' নামক বিষয়কে বোঝার চেষ্টা করা মানে মৌল ক্ষমতা সম্পর্কে অনুমানের সাপেক্ষে বহুবিধ সমালোচনাত্মক অবস্থান-পরিবর্তন ঘটানো, স্বয়ং ক্ষমতাকে বিশ্লেষণের বিষয় হিসেবে না ধরে ক্ষমতাসম্পর্ককে বিশ্লেষণের বিষয় করা, ক্ষমতাসম্পর্কগুলোর সঙ্গে বৈষয়িক সামর্থ্য ও জ্ঞাপনসম্পর্কের পার্থক্য খেয়াল রাখা। অর্থাৎ, বলা যায় যে ক্ষমতাসম্পর্কগুলোকে ধরতে হলে তাদের যুক্তিবিন্যাসের বৈচিত্র্য, তাদের সামর্থ্য ও তাদের আন্তঃসম্পর্কের মধ্য দিয়েই ধরতে হবে।

ক্ষমতার সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি কী দিয়ে গঠিত?

ক্ষমতার চর্চা কেবল ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত 'অংশীদারদের' মধ্যে সম্পর্ক নয়, তা আবার এমন একটা উপায়ও বটে যার মাধ্যমে কতিপয় অপরের উপর ক্রিয়া করে। অর্থাৎ, এমন কোনও বিশ্বায়িত, বিপুল বা পরিব্যাপ্ত, ঘনীভূত বা ছড়ানো বাস্তব অস্তিত্ব নেই যাকে 'ক্ষমতা' নামে গরিমাণ্বিত করা যায়। ক্ষমতার অস্তিত্ব কেবল সেখানেই আছে যেখানে কেউ তাকে ক্রিয়াশীল করে তুলছে, যদিও তা অবশ্যই নানা স্থায়ী কাঠামোর সঙ্গে বিন্যস্ত অসম সম্ভাবনার পরিসরের মধ্যে উৎকীর্ণ হয়ে থাকে। এর থেকে এমনটাও বলা যায় যে ক্ষমতা সম্মতির বিষয় নয়। ক্ষমতা মানেই স্বাধীনতা পরিহার করা নয়, অধিকার হাত-বদল করা নয়, বা সর্বজনার আপন ক্ষমতা গুটিকয় প্রতিনিধির

হাতে সঁপে দেওয়া নয় (সম্মতি যে ক্ষমতাসম্পর্ক বহাল ও বজায় থাকার শর্ত হিসেবে কাজ করে, এতে অবশ্য তার কিছু যায় আসে না); ক্ষমতাসম্পর্ক পূর্বকৃত বা স্থায়ী কোনও সম্মতিদানের ফলাফল হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে তা কোনও সর্বসম্মতির বহিঃপ্রকাশ নয়।

তাহলে কি ক্ষমতাসম্পর্কগুলোর প্রকৃত চরিত্র খুঁজতে যেতে হবে সেই হিংসার কাছে যা ছিল তার প্রাচীন রূপ, তার নিত্য গোপন কথা, এবং তার চূড়ান্ত অবলম্বন যাকে সে আঁকড়ে ধরে যখন মুখোশ সরিয়ে নিজ মুখ উন্মুক্ত করতে সে বাধ্য হয়? কার্যত কোনও ক্ষমতাসম্পর্কের নির্ধারক বৈশিষ্ট্য হল এই যে তা আশু অর্থে ও সরাসরি অপরের উপর ক্রিয়া করে না, বরং তা অপরের ক্রিয়ার উপর ক্রিয়া করে। অর্থাৎ তা হল ক্রিয়ার উপর ক্রিয়া করার এমন এক প্রণালী যার মধ্য দিয়ে ঘটে যাওয়া বা ঘটমান বা সম্ভাব্য ভবিষ্যতের কোনও ক্রিয়ার উপর ক্রিয়া সংঘটিত করা হয়। হিংসার সম্পর্ক কোনও একটি দেহ বা বস্তুর উপর ক্রিয়া করে। হিংসার সম্পর্ক বলপ্রয়োগ করে, বাঁকিয়ে দেয়, ভেঙে দেয়, ধ্বংস করে বা সমস্ত সম্ভাবনার দরজায় কপাট এঁটে দেয়। তার বিপরীত মেরু নিষ্ক্রিয়তা ছাড়া আর কিছু নয়, কোনও প্রতিরোধের মুখে পড়লে সে প্রতিরোধকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া হিংসার আর অন্য কোনও পথ নেই। এর বিপরীতে সেই সম্পর্কই প্রকৃত ক্ষমতাসম্পর্ক যার ভিত্তিতে এই দুই উপাদান কাজ করছে: প্রথমত, যে 'অপরজনের' উপর ক্ষমতা প্রযুক্ত হচ্ছে সে যে একজন ক্রিয়াশীল বিষয়ী তার স্বীকৃতি ও বাস্তবতা শেষ অবধি বজায় থাকে, আর দ্বিতীয়ত, ক্ষমতাসম্পর্কের সম্মুখীন জনের জন্য সাড়া, প্রতিক্রিয়া, ফললাভ ও সম্ভাব্য উদ্ভাবনের এক গোটা ক্ষেত্র খোলা থাকে বা খুলে যায়।

ক্ষমতাসম্পর্কের প্রতিষ্ঠা সম্মতি-আদায়কে যে পরিমাণে বাদ দেয় না, হিংসাকেও তেমনই বাদ দেয় না। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সম্মতি-আদায় ও হিংসা— এই দুইয়ের কোনওটা ছাড়াই কখনও ক্ষমতার চর্চা হতে পারে না, কখনও কখনও এই দুই-ই যুগপৎ একসঙ্গে হাজির থাকে। কিন্তু সম্মতিনির্মাণ ও হিংসা ক্ষমতার হাতিয়ার ও ক্ষমতার ফলাফল হলেও তারা ক্ষমতার মৌল প্রকৃতির উপাদান নয়। ক্ষমতার চর্চা কাঙ্খিত যে কোনও মাত্রার সম্মতি আদায় করুক না কেন, তা এমন কোনও সম্মতিনির্মাণ নয় যা পরোক্ষে ঘটে চলে। আবার, শবদেহের স্তূপ তৈরি করে ফেনিয়ে তোলা যে হুমকি-চোখরাঙানির জোয়ারের আড়ালেই ক্ষমতার চর্চা আশ্রয় নিক না

কেন, তা এমন কোনও হিংসা নয় যে মাঝেমধ্যে অহিংসার ভেক ধরে থাকে। ক্ষমতার চর্চা এমন এক সম্ভাবনা-ক্ষেত্রের উপর ক্রিয়া করে যেখানে সক্রিয় বিষয়ীদের আচরণ নিজেদের উৎকীর্ণ করতে পারে। সম্ভাব্য ক্রিয়াসকলকে প্রভাবিত করার জন্য তৈরি সার্বিক এক ক্রিয়াকাঠামো হল ক্ষমতার চর্চা, তা প্ররোচিত করে, প্রবৃত্ত করে, প্রলুব্ধ করে, সহজ করে তোলে বা কঠিন করে তোলে; চরমাবস্থায় তা বাধার দেওয়াল তুলে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে; কোনও না কোনও ভাবে তা সবসময় এক বা একাধিক সক্রিয় বিষয়ীর উপর তাদের সক্রিয়তা বা সক্রিয়তার সামর্থ্যের সুবাদে ক্রিয়া করারই এক উপায়, অপর ক্রিয়ার উপর ক্রিয়ার বিন্যাস।

ক্ষমতাসম্পর্কের সুনির্দিষ্টতা বোঝার জন্য 'ব্যবহার' পদটির দ্ব্যর্থবোধকতা সবচেয়ে ভালো সহায় হতে পারে বলে মনে হয়। 'ব্যবহার'-য়ের মানে (বিভিন্ন মাত্রার কড়া বাধ্যতা আরোপের কলকৌশলের মাধ্যমে) অপরকে ব্যবহার করার জন্য 'চালিত' করা হতে পারে। আবার একই সঙ্গে 'ব্যবহার'-য়ের অর্থ কমবেশি উন্মুক্ত একটি সম্ভাবনাক্ষেত্রে আচরণের কোনও উপায় হতে পারে। ক্ষমতার চর্চা হল 'ব্যবহারকে ব্যবহার করা' ও সম্ভাবনাক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা করা। মূলগতভাবে, ক্ষমতা যত না দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সংঘাত বা পারস্পরিক মোকাবিলা, তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় তা হল 'শাসন'-য়ের বিষয়। ষোল শতকে 'শাসন' শব্দ যে ব্যাপ্ত অর্থে ব্যবহার করা হতো, এখানে সেই অর্থ ধরতে হবে। 'শাসন' শব্দটি কেবলমাত্র কিছু রাজনৈতিক কাঠামো বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করত না, তদুপরি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণ-ব্যবহারকে নির্দেশিত করার উপায়ও বোঝাত— যেমন, শিশুদের শাসন করা, আত্মাকে শাসন করা, গোষ্ঠীসম্প্রদায়কে শাসন করা, পরিবারকে শাসন করা, অসুস্থকে শাসন করা। আইনিভাবে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অধীনস্থকরণের রূপগুলো কেবল তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, পাশাপাশি অন্তর্ভুক্ত ছিল কমবেশি বিচার-বিবেচনার মধ্য দিয়ে গৃহীত সেইসব ক্রিয়াপ্রণালী যা অপর মানুষদের ক্রিয়ার সম্ভাবনার উপর ক্রিয়া করে। এই অর্থে ধরলে, শাসন করার অর্থ হল অপরদের ক্রিয়া করার সম্ভাব্য ক্ষেত্রটির কাঠামো বেঁধে দেওয়া। তাই ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্কসমূহ অনুসন্ধান করতে গিয়ে হিংসা বা সংঘাতের দিকে তাকালে হবে না, স্বেচ্ছামূলক চুক্তির দিকে তাকালেও হবে না, (সেগুলো বড় জোর ক্ষমতার

হাতিয়ার হতে পারে), বরং তাকাতে হবে সেই অদ্বিতীয় ক্রিয়াক্ষেত্রের দিকে যা যুদ্ধের সদৃশ নয়, আইনসভা সম্বন্ধীয়ও নয়, যা হল 'শাসন'-য়ের ক্ষেত্র।

অপরদের ক্রিয়ার উপর ক্রিয়া করার প্রণালী হিসেবে যখন ক্ষমতার চর্চাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, এহেন ক্রিয়াদিকে যখন মানুষদের দ্বারা অপর মানুষদের শাসন ('শাসন' শব্দটির ব্যাপ্ততম অর্থে) হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়, তখন যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তা হল 'স্বাধীনতা'। ক্ষমতা কেবলমাত্র স্বাধীন বিষয়ীদের উপরই প্রযুক্ত হয় এবং সেই মাত্রাতেই প্রযুক্ত হয় যে মাত্রায় তারা 'স্বাধীন'। 'স্বাধীন বিষয়ী' মানে সেইসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাদের সামনে রয়েছে এমন এক সম্ভাবনাক্ষেত্র যেখানে বিবিধ চলনপথ, প্রতিক্রিয়া প্রকাশের বিবিধ উপায় এবং বিবিধ আচরণপ্রণালী হাজির আছে। যেখানে নির্ধারণসূচকগুলোকে গণ্ডিতে বেঁধে ফেলা হয়েছে সেখানে কোনও ক্ষমতাসম্পর্ক কাজ করে না। যখন কিছু না কিছু সম্ভাব্য বিচরণসামর্থ্য থাকে, এমনকি পালানোর সম্ভাবনাও থাকে, কেবল তখনই ক্ষমতাসম্পর্ক কাজ করে। শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা মানুষের দাসত্ব ক্ষমতাসম্পর্কের বিষয় নয়, তা দৈহিক বাধ্যতারোপের সম্পর্কের বিষয়। তাই ক্ষমতার মুখোমুখি সংঘাত এবং স্বাধীনতা একে অপরকে বাদ দিয়ে হতে পারে না (এমন নয় যে ক্ষমতা প্রযুক্ত হলেই স্বাধীনতা কর্পূরের মতো উবে যায়), এই দুইয়ের মধ্যে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া অনেক বেশি জটিল। এই আন্তঃক্রিয়ায় এমনটা হতেই পারে যে স্বাধীনতাই হয়ে উঠল ক্ষমতাচর্চার প্রাথমিক শর্ত (একইসঙ্গে তার পূর্বশর্ত কারণ ক্ষমতা প্রযুক্ত হতে হলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকতে হবে, আবার তার স্থায়ী অবলম্বন কারণ অবাধ্যতার সম্ভাবনা না থাকলে ক্ষমতা হয়ে ওঠে বলপ্রয়োগে দৈহিক নির্ধারণের সমান)।

সুতরাং স্বাধীনতা বিসর্জনে অস্বীকার ও ক্ষমতাধীনতাকে বিযুক্ত আলাদা দুটি বস্তু হিসেবে হাজির করা যায় না। ক্ষমতার প্রামাণিক প্রশ্নটি স্বেচ্ছাবৃত্ত অধীনতা/দাসত্ববৃত্তি সংক্রান্ত প্রশ্ন নয় (কীভাবে আমরা দাস হয়ে থাকতে চাইতে পারি?)। ক্ষমতাসম্পর্কের ঠিক কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে তাকে অনবরত উসকে দিয়ে যাচ্ছে অবাধ্যতার অভিপ্রায় ও স্বাধীনতার প্রশ্নে আপসহীন মনোভাব। মূলগতভাবে বৈরিতার লড়াইয়ের আদলে ভাবার চেয়ে বরং কুস্তিচর্চার আখড়ার লড়াইয়ের আদলে ভাবলে কাছাকাছি পৌঁছানো যাবে কারণ এ এমন এক সম্পর্ক ও ক্রিয়া যেখানে লড়াইয়ের সাথে একইসঙ্গে

পরস্পরকে উসকে দেওয়া, উৎসাহিত-উত্তেজিত করা চলতে থাকে, পরস্পরকে স্থাণু করে দেওয়া মুখোমুখি সংঘর্ষের বদলে এ অনেক বেশি মাত্রায় হল একটানা পারস্পরিক প্ররোচনার ক্রীড়া।

কীভাবে ক্ষমতাসম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে?

সযত্নে সংজ্ঞায়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর নজর কেন্দ্রীভূত করে বিশ্লেষণ হল ক্ষমতাসম্পর্ককে বিশ্লেষণ করার প্রচলিত রীতিসিদ্ধ একটি উপায়। কেন্দ্রীভূত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে ও ফলপ্রসূতার চূড়ান্ত বিন্দু ছুঁয়ে থাকা এই প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যবেক্ষণবিন্দু হিসেবে সুবিধাজনক। এখানেই বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পর্কের আকার ও প্রাথমিক কলকৌশলের যুক্তিপ্রণালীকে মূলের কাছাকাছি চেহারায় দেখতে পাওয়ার আশা করা হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও, কোনও পরিবেষ্টিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতাসম্পর্ক যে রূপ ধরে থাকে তাকেই কেবল বিশ্লেষণের বিষয় করলে কিছু সমস্যা থেকে যায়। প্রথমত, একটা প্রতিষ্ঠান যেসব কলকৌশল কার্যকরী করে, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেহেতু সেই প্রতিষ্ঠানের নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার নিমিত্তে চালিত, তাই বিশ্লেষণে পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকাগুলোই প্রধান হয়ে ওঠার ঝুঁকি থেকে যায়। দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানের অবস্থান থেকে ক্ষমতাসম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই ক্ষমতাসম্পর্কের উৎস খোঁজার ঝোঁক তৈরি হয়, যার মানে দাঁড়ায় ক্ষমতা দিয়েই ক্ষমতার ব্যাখ্যা সারা। শেষত, যে পরিমাণে প্রত্যক্ষ বা অব্যক্ত বিধিনিয়ম এবং যন্ত্রপাতি—মূলত এই দুটি উপাদান ক্রিয়াশীল করার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠান সক্রিয় হয়, তাই ক্ষমতাসম্পর্কের বিশ্লেষণে তাদের কোনও একটি বা উভয়ের উপর বাড়তি গুরুত্ব ফেলার ঝোঁক তৈরি হয়, যার ফলে ক্ষমতাসম্পর্ককে কেবলমাত্র আইনকানুন ও দমনপীড়নের বিস্তার হিসেবে দেখার ভুল হতে পারে।

এর মধ্য দিয়ে অবশ্য ক্ষমতাসম্পর্কগুলোর শিকড় গাঁড়ায় প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অস্বীকার করা হচ্ছে না, বরং প্রস্তাব করা হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানের অবস্থান থেকে ক্ষমতাসম্পর্ককে বিশ্লেষণ না করে তার উল্টোটা করতে হবে, অর্থাৎ, ক্ষমতাসম্পর্কের অবস্থান থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, কোনও ক্ষমতাসম্পর্কের মূর্ত শিলীভূত রূপ কোনও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উপস্থিত হলেও, সেই ক্ষমতাসম্পর্কের মূলগত শিকড় প্রতিষ্ঠানের বাইরেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

ফিরে যাওয়া যাক ক্ষমতাচর্চার এই সংজ্ঞায় যে তা হল এমন এক উপায় যার মধ্য দিয়ে কিছু ক্রিয়া অপর সম্ভাব্য ক্রিয়াদির ক্ষেত্রের কাঠামো বেঁধে দেয়। তা অনুযায়ী, ক্ষমতাসম্পর্ককে দেখা যায় অপরাপর সম্ভাব্য ক্রিয়ার উপর ক্রিয়াপ্রণালী হিসেবে। অর্থাৎ, ক্ষমতাসম্পর্কের শিকড় সামাজিক সম্বন্ধের গভীরে প্রোথিত আছে, তা সমাজের উপরতলে বা আড়াআড়ি ভাবে স্থিত এমন কোনও বাড়তি কাঠামো নয় যার বৈপ্লবিক বিলোপসাধনের স্বপ্ন লালন করা যেতে পারে। সমাজবদ্ধভাবে বাঁচার মানে সর্বক্ষেত্রেই অপরাপরের ক্রিয়ার উপর অপরাপর ক্রিয়া করতে পারে এমনভাবে বাঁচা। ক্ষমতাসম্পর্কহীন একটি সমাজ কেবল বিমূর্ত ভাবনার স্তরেই থাকতে পারে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এই কারণেই এমন বিশ্লেষণ রাজনৈতিকভাবে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে বিশ্লেষণ কোনও প্রদত্ত সমাজে ক্ষমতাসম্পর্কগুলো বিচার করার সময় তাদের ঐতিহাসিক উদ্ভব ও বিকাশ, তাদের শক্তি ও দুর্বলতার উৎস, তাদের কিয়দংশের রূপান্তরসাধন ও বাকি কিয়দংশের বিলোপসাধনের শর্ত নিয়ে ভাবে। ক্ষমতাসম্পর্ক ছাড়া কোনও সমাজ হতে পারে না বলার মানে এই নয় যে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাসম্পর্কগুলো আবশ্যক, এও নয় যে ক্ষমতা সমাজের কেন্দ্রে স্থিত এমন এক অপরিহার্য ভবিতব্যতা যাকে বিরোধিতার মাধ্যমে ক্ষয় করা যায় না। বরং আমি বলব যে বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পর্ক প্রসঙ্গে, তাদের পরস্পরকে উসকে দেওয়ার ও প্ররোচিত করার চরিত্র প্রসঙ্গে, স্বাধীনতার আরোপ-অসম্ভব চরিত্র প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ, বিশদীকরণ ও প্রশ্ন তোলা এমন একটি নিরন্তর রাজনৈতিক কর্তব্য যার গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান এবং যা আমাদের সামাজিক অস্তিত্বযাপনের মধ্যেই নিহিত হয়ে আছে।

মূর্তভাবে ক্ষমতাসম্পর্কের বিশ্লেষণ কতগুলো বিষয়ের নির্দিষ্টকরণ দাবি করে। সেগুলো হল:

১. *পার্থক্যীকরণ/বর্গীকরণের ব্যবস্থা* যা অপরাপরের ক্রিয়ার উপর ক্রিয়া সম্ভবপর করে তোলে: আইন বা পরম্পরা অনুযায়ী সম্মান বা সুবিধার পার্থক্য, সম্পদ ও বস্তু আত্মসাৎ করায় অর্থনৈতিক পার্থক্য, উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে অবস্থানের পার্থক্য, ভাষিক বা সাংস্কৃতিক পার্থক্য, দক্ষতা ও প্রকৌশলজ্ঞানের পার্থক্য, ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষমতাসম্পর্ক

এমন সব পার্থক্যকে সক্রিয় করে তোলে যা একইসঙ্গে তার পূর্বশর্ত ও তার ফলাফল।

২. অপরাপরের ক্রিয়ার উপর *কী ধরনের অভিপ্রায়* নিয়ে ক্রিয়া করা হচ্ছে: সুযোগসুবিধা বজায় রাখা, মুনাফা সঞ্চয়, বিধিসঙ্গত অধিকার প্রয়োগ, কোনও উদ্দেশ্যপূরণ বা বাণিজ্য ?

৩. *ক্ষমতাসম্পর্কের অস্তিত্বনির্মাণে ব্যবহৃত উপায়* : ক্ষমতার চর্চা কি সশস্ত্র হুমকির মধ্য দিয়ে হচ্ছে, কম-বেশি জটিল নিয়ন্ত্রণের উপায়ের মধ্য দিয়ে হচ্ছে, নজরদারি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে হচ্ছে, নথিপত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে হচ্ছে বা তা ছাড়াই হচ্ছে, নাকি প্রয়োগের ব্যক্ত/অব্যক্ত অপরিবর্তনীয়/পরিবর্তনীয় বস্তুগত উপায় সমেত/বিহীন নিয়মবিধির দ্বারা হচ্ছে ?

৪. *প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের রূপ* : এই রূপ পারস্পরিক রীতি, আইনি কাঠামো, অভ্যাস বা সাময়িক প্রচলনের মিশ্রণ হতে পারে (যেমনটা ঘটে 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে), এই রূপ নিজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ এমন এক যন্ত্রের আদল ধরতে পারে যা নিজস্ব সঞ্চারপথ, নিজস্ব বিধিনিয়ম, সযত্নে নির্মিত উচ্চাবচ ধাপবন্দি কাঠামো এবং কর্মকাণ্ড পরিচালনার আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন দিয়ে চিহ্নিত (যেমনটা ঘটে কোনও বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানে বা কোনও সামরিক প্রতিষ্ঠানে), আবার এই রূপ বহুবিধ যন্ত্রের সমাহারে জটিল ব্যবস্থার আদল ধরতে পারে (যেমনটা হয় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে) যার কাজই হয়ে ওঠে সবকিছুকে মুঠোয় নেওয়া, সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক হয়ে ওঠা, প্রদত্ত সমাজগোষ্ঠীদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি হাতে নেওয়া ও কিছুটা মাত্রায় অন্তত সমস্ত ক্ষমতাসম্পর্কের পরিবেশক হয়ে ওঠা।

৫. *যুক্তিসঙ্গতিনির্মাণের মাত্রা* : কোনও সম্ভাব্যতার পরিসরে ক্রিয়া হিসেবে ক্ষমতাসম্পর্ককে সক্রিয় করা বেশ কিছু বিবেচনার উপর নির্ভরশীল হতে পারে, যেমন— হাতিয়ারগুলোর কার্যকারিতা বা কাম্য ফল দেওয়ার নিশ্চয়তা (ক্ষমতাচর্চায় প্রযুক্ত কম-বেশি মাত্রার প্রকৌশলগত বিশোধন) বা সম্ভাব্য খরচ (ব্যবহৃত উপায়সমূহের অর্থনৈতিক খরচ, বা, মুখোমুখি হতে হওয়া প্রতিরোধের সাপেক্ষে খরচ)। ক্ষমতাচর্চা কখনও আবরণ-আভরণ-হীন ভাবে প্রদত্ত প্রাতিষ্ঠানিক অধিকারের রূপ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে না, এমন কোনও অনমনীয় কাঠামোও তা নয় যা হয়

খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে নয়ত ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ে, তা প্রতিনিয়ত বিশদিকৃত, রূপান্তরিত, সংগঠিত হতে থাকে, পরিস্থিতির সঙ্গে কম-বেশি মানানসই প্রক্রিয়া খুঁজে নিতে থাকে।

অতএব বোঝা যায় যে কোনও একটি সমাজের অভ্যন্তরে ক্ষমতাসম্পর্কগুলোর বিশ্লেষণ কেন শুধুমাত্র 'রাজনৈতিক' অভিধায় অভিহিত কিছু প্রতিষ্ঠান বা এমনকি সেমত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বিচারবিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। ক্ষমতাসম্পর্কের শিকড় গোটা সামাজিক সম্পর্কজাল জুড়েই ছড়িয়ে আছে। তার মানে অবশ্য এমনটা নয় যে ক্ষমতার কোনও প্রাথমিক ও মৌলিক নীতি সমাজের ক্ষুদ্রাদিক্ষুদ্র অংশ অবধি সমস্তকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। বরং, অপরের ক্রিয়ার উপর ক্রিয়া করার সম্ভাব্যতা (যা প্রতিটি সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত), বিবিধ ব্যক্তি-বিভেদ, বিবিধ অভিপ্রায়, নিজের বা অপরের উপর প্রদত্ত ক্ষমতার বিবিধ প্রয়োগরূপ, কম-বেশি আংশিক বা সার্বিক বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ— এই সবের উপর ভিত্তি করে ক্ষমতার বিভিন্ন রূপকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কোনও সমাজে কতিপয়ের দ্বারা অপরদের শাসন করার নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও রূপগুলো বহু বিচিত্র রকমের হতে পারে; সেগুলো একে অপরের উপর চেপে থাকে, একে অন্যের মধ্যে ঢুকে থাকে, কখনও একে অন্যকে সীমায়িত করে, এমনকি নাকচও করে, আবার কখনও একে অন্যকে আরও জোরদার করে। সমসাময়িক সমাজগুলোয় রাষ্ট্র কেবলমাত্র ক্ষমতাচর্চার একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির রূপ নয়, তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপ বলাও যথেষ্ট নয়, বরং এভাবে বলা যায় যে কোনও না কোনও ভাবে ক্ষমতাসম্পর্কের অন্য সমস্ত রূপকে তার সাপেক্ষে নিজেকে বিন্যস্ত করতে হয়। কিন্তু তা এই কারণে নয় যে এই সমস্ত অন্য রূপগুলো রাষ্ট্র থেকেই উৎপন্ন হয়, বরং তা এই কারণে যে ক্ষমতাসম্পর্কগুলো ক্রমবর্ধমান মাত্রায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে এসেছে (যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে— যেমন, বিদ্যায়তনিক, বিচারবিভাগীয়, অর্থনৈতিক বা পরিবার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে— রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সমরূপ ধারণ করেনি)। 'শাসন'-য়ের সংকীর্ণ অর্থ 'সরকার' ধরে নিয়ে বলা যায় যে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় ক্ষমতাসম্পর্কগুলোর সরকারিকরণ ঘটেছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পৃষ্ঠপোষণায় সেগুলোর বিশদীকরণ, যৌক্তিকতা-উৎপাদন ও কেন্দ্রীভবন ঘটেছে।

'কৌশল' শব্দটা এখন তিনভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রথমত, তার ব্যবহার হয় নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত উপায় নির্দেশ করতে, সেই অর্থে তা হল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপযোগী যুক্তিসঙ্গতির প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত, তা বোঝায় যেভাবে কোনও খেলায় অংশগ্রহণকারী এক পক্ষ অপর পক্ষের সম্ভাব্য ক্রিয়া আন্দাজ করে, নিজের সম্পর্কে অপরপক্ষের আন্দাজও অনুমান করে এবং সেই অনুযায়ী নিজক্রিয়া পরিকল্পনা করে—যেই অর্থে তা অপর অংশগ্রহণকারীর সাপেক্ষে সুবিধা হাসিল করার উপায়। তৃতীয়ত, তা মুখোমুখি সংঘাতের পরিস্থিতিতে প্রযুক্ত এমন এক প্রক্রিয়া বোঝায় যার মধ্য দিয়ে যুযুধান অপরপক্ষের কাছ থেকে লড়াইয়ের উপায়-উপকরণ কেড়ে নিয়ে তাকে লড়াই ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়, যে অর্থে তা বিজয় হাসিল করার উপায়। এই তিনটে অর্থই একত্রে মিশে যায় যুদ্ধ বা খেলায় মুখোমুখি সংঘাতের পরিস্থিতিতে যখন প্রতিপক্ষের লড়াই জারি রাখার শক্তিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ক্রিয়া করা হয়। সুতরাং, বিজয়সূচক সমাধান হিসেবে কী বেছে নেওয়া হচ্ছে, তার উপরই কৌশলের মানে নির্ভর করে। কিন্তু খেয়ালে রাখতে হবে যে এ কেবল অতি বিশেষ এক পরিস্থিতির কথা। অন্যান্য পরিস্থিতিতে 'কৌশল' শব্দটার নানা অর্থের মধ্যে ভিন্নতাকে মাথায় রাখা দরকার।

'কৌশল' শব্দের প্রথম যে অর্থটি আমি চিহ্নিত করেছি, সেই অর্থে ধরলে, ক্ষমতা কার্যকরী করতে বা ক্ষমতা বজায় রাখতে নিযুক্ত উপায়সমূহকে একত্রে ক্ষমতাকৌশলের প্রণালী বলা যেতে পারে। যে পরিমাণে কোনো কৌশল অপরাপরের সম্ভাব্য ক্রিয়াদির উপর ক্রিয়ার প্রণালী হয়ে ওঠে, সেই পরিমাণেই তা ক্ষমতাসম্পর্কের উপযোগী হয়ে ওঠে। এইভাবে ক্ষমতাসম্পর্কগুলোর পরিসরে সক্রিয় করে তোলা কলকব্জাকে কৌশল হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। যদিও নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ক্ষমতাসম্পর্কাদি এবং সরাসরি সংঘাতের কৌশলের মধ্যে তৈরি হওয়া সম্পর্ক। কারণ, স্বাধীনতার নীতির দিক থেকে আত্মসমর্পণে অস্বীকার ও নিজেকে বজায় রাখার আবশ্যিক চরিত্রের নাছোড় মনোভাব যদি ক্ষমতাসম্পর্কের কেন্দ্রে ক্ষমতাসম্পর্কের অস্তিত্বের স্থায়ী শর্ত হয়, তাহলে এমন কোনও ক্ষমতাসম্পর্ক হতে পারে না যেখানে নাগালের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া বা সম্ভাব্য বহির্গমনের কোনও উপায়ই নেই। কোনও ক্ষমতাসম্পর্ক

মানেই, অন্তত সম্ভাব্যতার স্তরে, এমন এক সংগ্রাম-কৌশল যেখানে দুটি বল একে অপরের উপর অধ্যারোপিত হয়ে থাকে না, নিজ নিজ নির্দিষ্ট প্রকৃতি হারিয়ে ফেলে না বা শেষাবধি গুলিয়ে যায় না। এক বল অপর বলের জন্য একটি স্থায়ী সীমা বা সম্ভাব্য বিপরীত গতির প্রারম্ভবিন্দু চিহ্নিত করে। অপরদিকে, যখন স্থিতিশীল কলকব্জা বৈরিতামূলক সম্পর্কজাত স্বতক্রিয়াকে প্রতিস্থাপিত করে, তখন মুখোমুখি সংঘাতের সম্পর্ক পেকে ওঠে, চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছয় (এবং দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে একজনার জয় হয়)। এহেন কলকব্জার দ্বারা মোটামুটি নিয়মিতভাবে ও পরিমিত নিশ্চয়তার সঙ্গে এক অপরের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যে মুহূর্তে আমৃত্যু সংগ্রামের পথ ছেড়ে আসা হয়, সেই মুহূর্ত থেকেই মুখোমুখি সংঘাতের সম্পর্কের নিশানা হয়ে দাঁড়ায় একটি ক্ষমতাসম্পর্ককে হাসিল করা— হাসিলদারির পাশাপাশি একইসঙ্গে তার সাময়িক স্থগিতকরণ। আর, ফিরতি বিচারে, সংগ্রামের কৌশলও ক্ষমতাসম্পর্কের জন্য এমন এক সীমারেখা হয়ে ওঠে যেখানে পূর্বপরিকল্পনা মাফিক ক্রিয়া করা ও নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে ঘটে যাওয়া ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া করাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। নিষ্ক্রমণ বা বহির্গতির উপায়স্বরূপ স্বাধীনতা আত্মসমর্পণে অস্বীকার করার অবস্থানবিন্দু ব্যতিরেকে ক্ষমতাসম্পর্কের অস্তিত্ব অসম্ভব। সুতরাং, স্বাধীনতা আত্মসমর্পণে অস্বীকার করার অবস্থানবিন্দুগুলোকে সম্পূর্ণত দমন ও নিকেশ করার উদ্দেশ্যে চালিত ক্ষমতাসম্পর্কের যে কোনও প্রসারণ ও তীব্রতাদান ক্ষমতাচর্চাকে তার বহিঃসীমার বিরুদ্ধেই দাঁড় করিয়ে দেয় মাত্র। তা চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছয় এমন এক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যা অপরকে সার্বিক অক্ষমতায় নামিয়ে আনে (যে ক্ষেত্রে ক্ষমতাচর্চা প্রতিস্থাপিত হয় শত্রুর উপর জয় দিয়ে), নয়তো শাসনাধীনদের শত্রুতে পরিণত করে মুখোমুখি সংঘাতের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ, বলা যায় যে, প্রতিটি মুখোমুখি সংঘাতের কৌশল একটা ক্ষমতাসম্পর্ক হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে, আর প্রতিটি ক্ষমতাসম্পর্ক তার অন্তর্নিহিত বিকাশপথ অনুসরণ করে ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে বিজয় হাসিলের কৌশল হয়ে উঠতে চায়।

ক্ষমতাসম্পর্ক ও সংগ্রামের কৌশলের মধ্যে পারস্পরিক আবেদন-আকর্ষণ, নিত্য গ্রন্থি ও নিত্য বিপরীত-যাত্রা কার্যত সবসময় বজায় থাকে। যে কোনও মুহূর্তেই ক্ষমতাসম্পর্ক দুই প্রতিপক্ষের মুখোমুখি সংঘাত হয়ে উঠতে পারে। আবার সমভাবেই, কোনও সমাজে যুযুধান প্রতিপক্ষদের মধ্যে

সম্পর্ক ক্ষমতার কলকৌশলকে সক্রিয় করে তোলার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে পারে। এই অস্থিতিশীলতার কারণেই একই ঘটনা বা রূপান্তরকে দুটো ভিন্ন দৃষ্টকোণ থেকে পাঠ করা যায়— সংগ্রামের ইতিহাসের অভ্যন্তর থেকে আর নয়তো ক্ষমতাসম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে। এই দুই ধরনের পাঠ থেকে তৈরি হওয়া ব্যাখ্যা একই অর্থব্যঞ্জক উপাদান ব্যবহার করে না, একই ধরনের বোধ্যতা তৈরি করে না, যদিও একই ঐতিহাসিক বুনটকে নির্দেশ করে একে অপরকে বিবেচনায় রেখে তারা গড়ে ওঠে। কার্যত, এই দুই ধরনের পাঠের মধ্যের পার্থক্যগুলোই বেশির ভাগ মানবসমাজে বর্তমান 'আধিপত্যের' মৌল প্রতীতিকে দৃশ্যমান করে তোলে।

প্রকৃতপক্ষে, আধিপত্য হল ক্ষমতার একটি সাধারণ কাঠামো যার শাখাপ্রশাখা ও ফলশ্রুতিসমূহ কখনও কখনও সমাজের নিবিড় বুনটের মধ্যেও সেঁধিয়ে যায়। কিন্তু একইসঙ্গে তা হল একটা কৌশলগত অবস্থান যা প্রতিপক্ষদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী সংঘাতের জমিতে অনুমোদিত শক্তপোক্ত চেহারায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এমনটা অবশ্য হতে পারে যে আধিপত্যের ঘটনা আসলে সম্মুখ-সংঘাত ও তার পরিণাম থেকে উদ্ভূত ক্ষমতার কলকব্জার গ্রাহ্য রূপ (হানাদারি থেকে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক কাঠামো); এমনটাও হতে পারে যে দুই প্রতিপক্ষের মাঝের সব বিরোধ ও ফাটল সমেত ক্ষমতাসম্পর্কগুলোর ফল হল তাদের মধ্যে সংগ্রাম। কিন্তু, একটি গোষ্ঠী, শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের আধিপত্য এবং একই সঙ্গে সে আধিপত্যের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানো প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ এক বিপুল ও সার্বিক রূপ ধরে আত্ম প্রকাশ করে, কৌশলগত সম্পর্কের সঙ্গে ক্ষমতাসম্পর্কের গ্রন্থিনির্মাণ ও পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলের মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজদেহ জুড়ে ফুটে ওঠে, তাই তা ইতিহাসে একটি কেন্দ্রীয় প্রতীতি হয়ে ওঠে।

উৎস: এই লেখাটি 'দি সাবজেক্ট অ্যান্ড পাওয়ার' শিরোনামে ইংরেজিতে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে হুবার্ট দ্রিফুস ও পল রেনবো রচিত 'মিশেল ফুকো: বিয়ন্ড স্ট্রাকচারালিজম অ্যান্ড হেরমেনিউটিকস' গ্রন্থের 'আফটারওয়ার্ড' অংশে (পৃষ্ঠা: ২০৮-২২৬)। পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'এসেনশিয়াল ওয়ার্কস অফ ফুকো: ১৯৫৪-১৯৮৪' গ্রন্থমালার জেমস ডি ফবিয়ঁ সম্পাদিত তৃতীয় খণ্ডে (৩২৬-৩৪৮পৃষ্ঠায়) তা সংকলিত হয়।

নির্ঘন্ট

অতি-মার্কসবাদ: ১০৮,১০৯, ১২৩।
অর্থনীতি: ২৩৫-২৩৭, ২৪৬-২৫০, ২৫২, ২৫৮।
অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার সীমা: ১১৮।
অনন্বয়ের তত্ত্ব (theory of alienation): ৮২।
অবদমিত জ্ঞানের বিদ্রোহ: ১৬১।
অবয়ববাদ (structuralism): ৫৯, ৮১, ৮২, ৯৫-১০২, ১১১, ১১৪।
অলিভার ক্রমওয়েল: ১২।
অস্তিত্ববাদ (existentialism): ৫৯, ৬০, ৭৫-৭৮।
অস্তিত্ববাদী প্রতীতিবাদ: ৮৩।
অ্যান্টি-ঈদিপাস (দেলুজ ও গুয়াতারি-র বই): ৩৪, ১৬০, ২২৪, ২২৫।
অ্যামব্রোজিও পলিটি: ২৩১।
অ্যালবার্ট মাহিয়েজ: ১১৯।
অঁরি লেফেভরে: ৯৫।
অ্যাঁলা জবের: ৪৪।

আঙ্গিকবাদ: ৯৮, ৯৯।
আর্কাইভ (archive): ৫৭।
আধিপত্য: ২৮৩।
আদি বাইবেল: ১১।
আন্দ্রে উর্মসের: ৭৯।
আলজেরিয় যুদ্ধ: ৯১, ১০৯, ১১০, ১১৯, ১২১।
আলথুজার: ৮১, ৮৪, ১০২, ১১৪।
আলফ্রেড স্খমিড: ১১৪।
আলবেয়ার কামু: ৬০।
আলোকপ্রাপ্তি(enlightenment): ৪৫, ১১৩, ২৫৯।
আলোকপ্রাপ্তি মানে কী? (কান্টের প্রবন্ধ): ২৬৭।
আলেকজাঁদ্রে কোয়রি: ৮৩।
আব্রাহাম (বাইবেল): ১১, ১২।
আয়াতোল্লাহ খোমেইনি: ৪৫।

ইউরিপিদিস: ৩৬।
ইতিহাস-পাঠ: ১১৬, ১১৭, ১১৯।
ইনকুইজিশন: ১৪।
ইনোসেন্ট জেন্টিলেট: ২৩১।
ইমানুয়েল কান্ট: ২৫৮, ২৬৭, ২৬৮।
ইরান (১৯৭৭-৭৯ সালের রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন): ৪৪-৪৬।
ইহুদি-শিকার: ২৮।
ইংল্যান্ড: ১৪০।

উইলহেলম রিখ: ২২৩।
উদারনীতিবাদ: ১৪১।
উদ্বাস্তু: ২৭।
উন্মত্ততা: ৮৬, ৮৭, ৯৩, ১১৮।
উন্মত্ততা ও সভ্যতা (Madness and Civilization, ফুকোর বই): ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৮৬, ৯২-৯৫, ১০২, ১০৩, ১০৬, ১২৪, ১২৬, ১৩৯।
উপনিবেশবাদ: ১২২।
উপসালা (সুইডেন): ৯১, ৯২।

এ ডবলু রেহবের্গ: ২৩০।
এইচ লিও: ২৩০।
এডমুন্ড হুসেরল: ৬০, ৮৩।
এতিয়েন এসকুইরোল: ৭১।
এলিয়ট: ২৩১।
এভগেনি ক্রবেতস্কোয়: ৯৭।
এমিলি (রুশোর বই): ১২।
এস এফ আই ও (ফ্রেঞ্চ সেকশন অফ দি ওয়ার্কার্স ইন্টারন্যাশনাল): ৭৭।

ওয়ারশ (পোল্যান্ড): ৯১।
ওয়েইমার প্রজাতন্ত্র: ১১৩।

ঔপনিবেশিক শাসন: ৫০, ১০৯।

কনফেশন: ১৩।
কম্যুন: ১২১।

কম্যুনিজম: ৭৮, ৮০।
কনসেনট্রেশন ক্যাম্প: ১৪০।
কনাঁসা (connaissance): ৫৮, ৮৮, ১০৩।
কারকোসান: ১৪।
কারাগার/জেলখানা: ১১, ২৩, ৪৩, ১২৩।
কার্ডিনাল বেলারমাইন: ১৩।
কারেজ অফ ট্রুথ (ফুকোর বক্তৃতা সংগ্রহ): ৩৭।
কার্ল মার্কস: ১৯,৭৯, ৮২, ১০৬-১০৮, ১১৩, ১১৫, ২২৩।
কার্ল জ্যাসপারস: ৬০।
কিরস্চহেইমার: ১১২।
কিয়ের্কগার্দ: ৫৯।
কেলেরমান: ২৩০।
কুলজিশাস্ত্র (genealogy): ৩৮, ৫৬, ৫৭, ১২৬, ১৬১-১৭৪।
ক্যাথার-বিরোধী ক্রুসেড: ১৬।
ক্যামেরালিস্ট: ২৪৩।
ক্লাউস ক্রসাঁ: ৪৪।
ক্লদ লেভি-স্ত্রস: ৫৯, ৮১, ৮২, ৯৭, ১১৪।
ক্লসউইৎজ: ১৭১, ১৭২, ২৩০।
ক্ষমতা: ৩১, ৩২, ১১৩, ১২৬-১২৮, ১৩৬, ১৩৮-১৪০, ১৫১-১৫৬, ১৭৫, ১৭৬, ২৫৭-২৮৩; ক্ষমতা-অধিকার-সত্য ত্রিভুজ: ১৭৫-১৯১; জৈবক্ষমতা (biopower): ২৪-২৮, ৩৩, ৪৪, ৪৫, ৫১, ১৯৪-২২২; যাজকীয় ক্ষমতা (pastoral power): ১২, ১৩, ১৬, ৫০, ২৫৪, ২৬৪-২৬৭; শৃঙ্খলাদায়ক ক্ষমতা (disciplinary power): ১৭-২৪, ৩২, ৫১, ১৯১-১৯৩, ২০৬-২১০, ২৫১, ২৭২, ২৭৩; সার্বভৌম ক্ষমতা (sovereign power)/ সার্বভৌমত্ব: ২২, ৫০, ১৭৭-১৮০ (রাজকীয় ক্ষমতা), ১৮৯-১৯১, ১৯৫, ১৯৬, ২০৩, ২০৪, ২১৮, ২৩৭, ২৩৮, ২৪০-২৪৬, ২৪৮, ২৫০।
খ্রিস্টান গণতন্ত্রী: ৭৭।
খ্রিস্টান ধর্ম: ১৩, ৫০, ১৮৭।
গণশাসন, গণরাজ্য (প্রাচীন ভারত): ৫১।
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা: ১৪১।
গণহত্যা: ২৭।
গাবরিয়েল মারসেল: ৫৯, ৬০।
গাস্তঁ বাখেলার্ড: ৮৭, ৮৮।
গুইলম ডি লা পেরিয়ের: ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৭-২৪২, ২৪৫।
গুলাগ: ১০৬।
গৌতম বুদ্ধ: ৫১।
চার্চ: ১৩-১৬, ১৪৪, ২৬৪-২৬৬।
চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্ভব (Birth of a Clinic, ফুকোর বই): ৬৭, ১০২, ১০৩, ১২৪, ১২৬।
চুক্তিবদ্ধতার তত্ত্ব: ২৪৬।
জন লিলবার্ন: ১২।
জনসমষ্টি: ২০১,২০৭, ২০৯, ২১৮, ২২৮, ২৪৬-২৫২, ২৬৭।
জর্জ ক্যাঙ্গুয়িলহেম: ৮৮, ১০৪।
জর্জ দুমেজিল: ৯৭।
জর্জ পোলিতজার: ৮২।
জর্জ বাতাই: ৬৭, ৬৮, ৭৫-৭৮, ৮২-৮৪, ৮৯।
জাক লাকাঁ: ৮১, ৮২, ৯০।
জার্মানি: ১২০।
জি আই পি (জেলখানা সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপক গোষ্ঠী): ৪৩, ১২৩।
জুল মিশেলেত: ১৫, ১৭।
জেরেমি বেন্থাম: ২১।
জেলালি বেন আলি: ৪৪।
জ্ঞান/ক্ষমতা: ১৩৭, ১৩৮, ২৬২।
জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology): ৮২।
জ্ঞানের প্রত্নশাস্ত্র (The Archaeology of Knowledge, ফুকোর বই): ৫৮, ৬৭, ১১০, ১১১।
জাঁ ওয়াহল: ৭৫।
জাঁ-তুস্যাঁ দেসান্তি: ৮৪।
জাঁ জাক রুশো: ১২, ২৩৬, ২৫০।

জাঁ পল সার্ত্র: ৬০,৭৬-৭৮, ৮২, ৯০, ৯৫, ৯৬, ১১৭, ১২৩।
জাঁ পিয়াজেত: ৯৫, ১১১।
জাঁ-মারি দোমেনাখ: ১২৩।

টিটো: ৮০, ১০৯।
ট্রুমান: ৭৬।

ডক্টরস অফ দি ওয়ার্লড: ৪৯।
ডাইনি: ১৫।
ডেভিড কুপার: ৯০।

তত্ত্বকাঠামো (episteme): ১০৩, ১১০।
তুনিসিয়া (তুনিসিয়ার ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬-৬৮): ৪২, ১২০-১২৩।
ত্রোমবাদোরি: ৬৫-১৪৮।

থিওডোর অ্যাডোর্নো: ১১১।

দওফাঁ (ফরাসী রাজপরিবার): ২৩৪, ২৩৫।
দরিদ্র আইন (Poor Laws): ১৭।
দরিদ্র শিকার: ১৭, ১৮।
দাস-শ্রমিক শিকার: ১৮।
দি গল: ৭৭।
দেকার্তে: ৮১, ২৬৮।
দেল্যুজ ও গুয়াতারি: ২২৭।

ধর্মসংস্কার(Reformation): ২২৯, ২৬৩।
ধর্মসংস্কারবিরোধী আন্দোলন (Counter-Reformation): ১৪৪, ২২৯।
ধারণানির্মাণ: ২৫৭।

নওদে: ২৩১।
নয়া উপনিবেশবাদ: ১২২।
নয়া দর্শন (nouveaux philosophes): ১৪১, ১৪২।
নাগরিক সমাজ: ১৩৬, ১৩৭।
না-রাখা কথা (Missed Appointments, ফুকো ও বোর্দের বিবৃতি): ৪৮।
নাজিবাদ: ২৬, ৭৫, ৭৭, ১০০, ১১২, ২১৭, ২১৮।
নিকোলাই হার্টম্যান: ৬০।
নিমরড (বাইবেল): ১১।
নিরাপত্তা: ২২৮, ২৫১।
নিস্তালিনিকরণ: ৯৮, ১০৯।
নিৎশে: ৫৬, ৫৯, ৬৭, ৬৮, ৭৬-৭৮, ৮২-৮৫, ৮৮, ১৭২, ২৬৮।
নৈরাষ্ট্রবাদ: ৩৩, ২২১, ২৬১।

পরমাণু শিল্প: ১৪৩।
পরিসংখ্যান: ২৫, ২৪৩, ২৪৭, ২৫০।
পাভলভ: ৯৪।
পারহেসিয়া: ৩৬-৩৮, ৪৯, ৫১।
পি পারুতা: ২৩১।
পিয়ের ক্লোসোওসকি: ৬৭, ৯২।
পিয়ের বোর্দ: ৪৮।
পুফেনডর্ফ: ২৪০।
পুলিশ: ১৭, ১৯, ৪৪, ২৩৬, ২৪৩, ২৫৪,২৬৬।
পুঁজি পাঠ (Reading Capital, আলথুজাররে বই): ১০২।
পুঁজির আদিম পুঞ্জীভবন: ১৯।
পুঁজিবাদ: ১২২, ১৮৫, ১৮৬, ২২০, ২২১।
পূর্ব ইউরোপ: ৯৮-১০১।
পোল্যান্ড: ৯২, ১২০।
প্যানঅপটিকন: ২০, ২৪।
প্রতর্ক (discourse): ৫৫, ৮৫, ১০৫, ১০৭, ১১১, ১২৯, ১৭৬, ১৯১।
প্রতর্কের বিন্যাস (L'Ordre du discourse, ফুকোর বক্তৃতা): ১২৫।
প্রতিরোধ: ২৯-৪৯, ১৪২, ১৪৩, ১৫৪-১৫৬, ২২৩-২২৭, ২৬০-২৬৩, ২৮১, ২৮২।
প্রতীতি (phenomenon): ৫৫।
প্রতীতিবাদ (phenomenology): ৬০, ৬৮, ৭৫, ৭৬, ৮১-৮৪।
প্রতীতিবাদী অস্তিত্ববাদ: ৯৬।
প্রতীতিবাদী মনোরোগ চিকিৎসা: ৯০।
প্রতিবর্ততত্ত্ব: ৯৪।
প্রত্নশাস্ত্র (archaeology): ৫৭, ৫৮, ৮৯, ১৬৬।
প্রাগ শহর, প্রাগ বসন্ত: ৯৯।

প্রিন্স (মাকিয়াভেলির বই): ১৫৬, ২৩০, ২৩২, ২৩৩।
প্রোটেস্টান্টবাদ: ১৪৪, ১৮৭।
ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টি: ৪৪, ৭৮, ৮০, ৮১, ১০৭, ১১০, ১২১।
ফরাসী বিপ্লব: ২৩০।
ফার্দিনান্দ লা সাসুর: ৫৯।
ফিজিওক্র্যাট: ২৪২, ২৫০।
ফ্যাসিবাদ: ২৬, ৩৪, ৪৪, ১৮২, ২২৩, ২২৫-২২৭, ২৫৮।
ফ্রয়েড: ২২৩।
ফ্রয়েডিয় মার্কসবাদ (মারকুস): ১১২, ১১৪।
ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল: ১১১-১১৭, ১৩৭, ২৫৯।
ফ্রাঙ্কো: ৪৪, ২০৫।
ফ্রানসিস ডি সালেস: ২২৬।
ফ্রিম্যাসন: ১৫৯।
ফ্রেঞ্চ ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন অফ লেবার: ৪৮।
ফ্রেডেরিক দি গ্রেট: ২৩৯।
ফ্রাঁসোয়া কুয়েসনে: ২৩৭।
বস্তুদের বিন্যাস (The Order of Things, ফুকোর বই): ৯৫, ১০২-১০৯, ১১৫।
বাণিজ্যতন্ত্রবাদ (Mercantilism): ২৪৩, ২৪৫।
বার্লিনার মোনাতসখ্রিফট: ২৬৭।
বাবিলন: ১১।
বিষয়ীকরণ: ২৫৬, ২৫৭।
বিজ্ঞানের দর্শন: ৮২-৮৮।
বিদ্বেষী জাতিবাদ/ জৈব জাতিবাদ: ২৬, ২৭, ৫১, ২১২-২২১।
বিবর্তনবাদ: ২৫, ২১৪, ২১৫।
বিবৃতি (enonce): ১১১।
বোনাফি: ৯৪।
ব্লাঁকিবাদ: ৩৩, ২২১।
ভাষাতত্ত্ব: ৮২, ৯৭।
ভিক্ষু (বৌদ্ধ ও জৈন): ৫১।
ভিয়েতনাম: ২২৩।
ভিয়েনা কংগ্রেস (১৮১৫): ২৩০।
ভ্লাদিমির প্রপ: ৯৭।
মতবাদ: ৯২, ১০১, ১০৭, ১২৩, ১২৪, ১৮৬, ২৩৫, ২৭০।
মতবাদিক সংগ্রাম: ১৪৫, ১৪৬।
মনস্তত্ত্ববিদ্যা: ২৩, ১৬৪, ১৬৫।
মনোরোগ চিকিৎসা: ৬৯, ৭০-৭২, ৯০, ৯৩-৯৫, ১৩৫।
মনোরোগ চিকিৎসা বিরোধিতা: ৭০, ৭১, ৭৩, ৯০, ৯৪, ৯৫, ১২৫, ১৫৯, ১৬৭।
মরিস ক্লাভেল: ১২৩।
মরিস ব্লাঁশো: ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭৫, ৭৬, ৮২,৮৪।
মরিস মার্লো-পন্টি: ৬০, ৭৬, ৮৩।
মহাত্মা গান্ধী: ৫২।
মহামারী: ১৯-২০।
মাকিয়াভেলি: ১৫৬, ২৩০-২৩৪, ২৩৭, ২৩৮, ২৪১, ২৪৩।
মার্কসবাদ: ৭৮, ৮২-৮৪, ৯২-১০২, ১০৬, ১০৭, ১১৩, ১২১-১২৪, ১৫৯, ১৬০, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯, ২২১; মার্কসবাদী মানবতাবাদ-১১৪।
মার্কিন বিপ্লব: ২৩০।
মাচন: ২৩১, ২৩২।
মানবতাবাদ: ৬০, ৮২।
মানবতাবাদ বিরোধী তত্ত্ব (antihumanism): ১০১, ১১৬।
মানবোত্তীর্ণ (overman): ৭৭।
মানুষের মৃত্যু (ফুকো): ১১৫, ১১৬।
মার্টিন হেইডেগার: ৬০, ৯০।
মিকেল দুফরেনেন: ৯৫।
মিশেল আমিয়ত: ৯৫।
মিশেল ফুকো: ১১-৪৯, ৫৬-৫৮, ৬৫-১৪৮।
মে ১৯৬৮: ৪৩, ৯৩, ১০৮, ১০৯, ১১৯, ১২৪, ১২৫।
ম্যাক্স শিলার: ৬০।
মঁসিয় জুকুঁই: ১৬৭।

যুক্তিসংগতি নির্মাণ: ২৫৯।
যুদ্ধ: ১৪৬, ১৫২, ১৭১, ১৯৪,২১৩-২১৬, ২৮১।
যৌনতা: ২০৮, ২০৯, ২৫৬।
যৌনতার ইতিহাস (ফুকোর বই): ৩১, ৬৫, ৬৭, ১২৭।

রজার গারাউদি: ৮২, ৯৫।
রাজকতা (governmentality): ৪৪, ২২৮, ২৫২-২৫৪।
রাজতন্ত্র: ১৩, ২৪৪, ২৫১।
রাজনীতি: ১৫২, ২৩৫।
রাজনৈতিক ভূমিকা/সক্রিয়তা: ১৩২-১৩৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৪১, ২৭৮।
রাশিয়া: ২৩৯।
রাষ্ট্র: ২৭, ২৪৩-২৪৫, ২৫২-২৫৪, ২৫৮, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৮, ২৭৯, ২৮০।
রাষ্ট্রবিজ্ঞান: ২২৮, ২৫০, ২৫১।
রুশ বিপ্লব: ৭৫, ৯৭, ৯৮।
রোলাঁ ল্যাইঙ: ৯০।
রোলাঁ বার্ত: ৭০, ৯২।

ল'ইউনিতা: ১৪৩।
লা তেম্পস মডের্নেস: ৯৯।
লা মথে লে ভেয়ার: ২৩৪, ২৩৫।
লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কে: ২৩০।
লুসিয়েন বোনাফি: ৯২।
লুডভিগ বিনসোয়ানজার: ৯০।
লেভিয়াথান: ১৮১।
লেভেলারস: ১২।

শাসনপ্রণালী: ১৪৩, ১৪৪, ২২৮-২৩০, ২৭৫, ২৮০।
শাসনপ্রণালীর কলা: ২২৮, ২৩১-২৫২।
শাহ (ইরানের): ৪৪, ৪৫।
শিশু-যৌনতা: ১১৮।
শীতল যুদ্ধ: ৮০।
শৃঙ্খলা ও শাস্তিদান (Discipline and Punish, ফুকোর বই): ৬৭, ৭১, ৭২, ৭৪, ১৩৮, ১৩৯।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন: ৫২।
সম্মতি-আদায়: ২৭৪।
সলিডারিটি আন্দোলন (পোল্যান্ড): ৪৬-৪৯।
সর্বাত্মকতাবাদ: ২৬, ৩৪, ১৩৮-১৪১, ১৬০।
সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন: ৩৩, ৩৪, ৫১, ২২০-২২২।
সাধারণিকরণ/বিশেষিকরণ: ১২৮-১৩১, ১৩৭, ১৩৮।
সামাজিক চুক্তি (রুশো): ২৫০, ২৫১।
সিনিক (cynic): ৩৬।
সিমোঁ রোলাঁ: ১৪।
সিলভি লে বন: ৯৫।
সুইডেন: ৯২, ১২০।
সোভিয়েত রাশিয়া: ২৬, ৩৪, ৯৪, ১০১, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১৩৯, ১৪০।
স্টোইক পুনরুত্থান: ২২৯।
স্তালিন/ স্তালিনি শাসন: ২৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৯৭, ১১০, ২৫৮।
স্বমেহন: ১১৮, ২০৮, ২০৯।
স্বাধীনতা: ২৭৬।
স্বাভাবিকীকরণ: ২৩, ৮৭, ৯৩।
স্যাভয়র (savoir): ৫৮, ৮৮, ১০৩, ১০৫, ১১৮, ১৩৬, ১৯১, ২৪৫, ২৪৯, ২৫২।

হল্যান্ড: ২৩৯।
হবস: ২৪৬।
হাবিব বুরগুইবা: ৪২।
হানা আরন্ট: ৩৪।
হামবুর্গ: ৯১।
হারবার্ট মারকুস: ১১১, ১২০।
হাসপাতাল: ১৭, ২৩।
হিংসা: ১১, ৩৪, ২২১, ২৩২, ২৭৪।
হিটলার: ২৮, ২১৯।
হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব: ৫০, ৫১।
হুবার্ট দ্রেইফুস ও পল রেনবো: ৩৮।
হেগেলবাদ: ৬০, ৬৮, ৭৫, ৭৭-৭৯, ২৬৮।
হেরমেনিউটিকস: ৬০।
হেরেটিক: ১৪।